THE

History & Gradual Development

OF

BENGALI LITERATURE

In the Victorian Era.

BY

HARAN CHANDRA RAKSHIT,

(Rai Sahib.)

"If there is any thing in this world which, next after the flag of his country or its spotless honour, should be holy in the eyes of a young man, it is the language of his country. He should spend at least the third part of his life in cultivating its resources".

Thomas De Quincey.

ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

মজিলপুর—২৪ পরগণা—'কর্ণধার কুটীর' হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আশ্বিন, ১৩১৮।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।
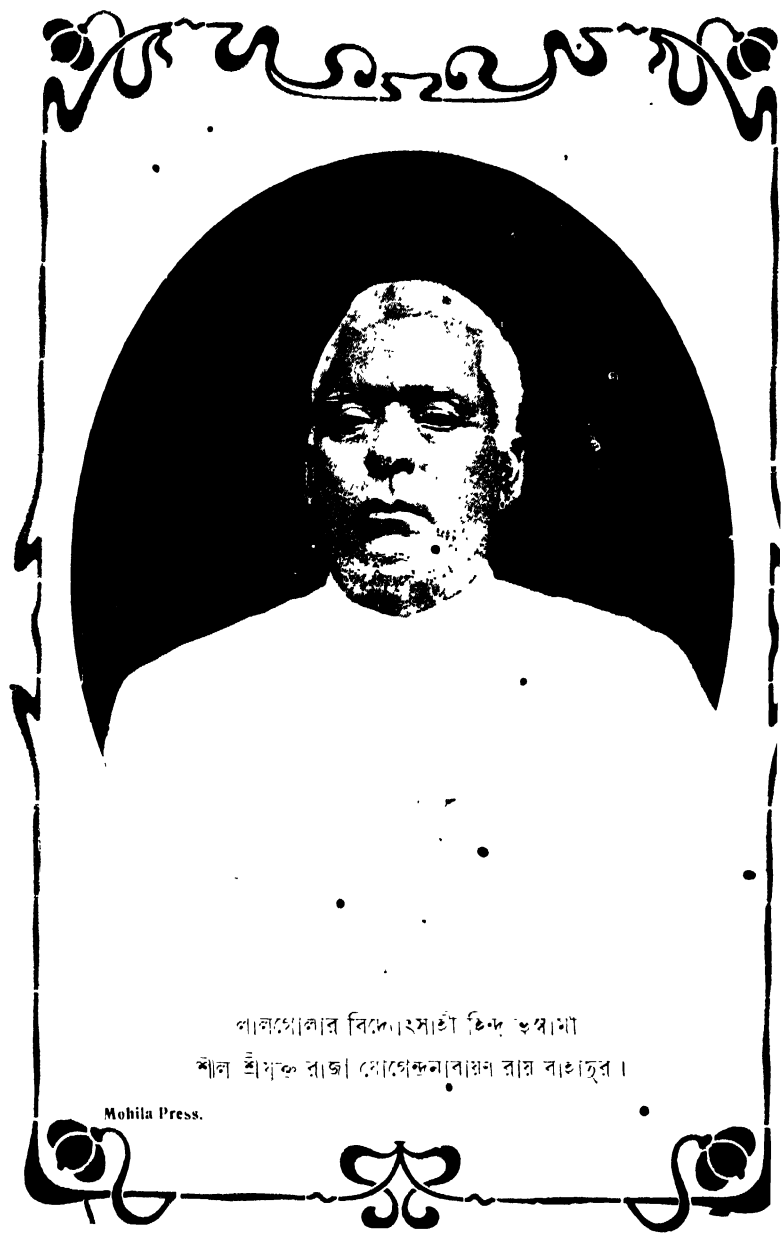
লালগোলার বিদ্যোৎসাহী হিন্দু ভূস্বামী
শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

Mohila Press.

উৎসর্গ।

•••••••••••

অন্তর্য্যামী ইষ্টদেবতার পর

যাঁহার পুণ্যস্মৃতি আমি পূজা করি;—

আমার সেই দুর্দ্দিনের সহায়,

পিতৃতুল্য পূজনীয়,—

লালগোলার বিদ্যোৎসাহী হিন্দু-ভূম্যধিকারী,

উদারচরিত, ঈশ্বরজানিত মহাত্মা,

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়

বাহাদুর মহোদয়কে,

ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ,—

তাঁহারই জিনিস তাঁহাকে দিয়া,

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

করিলাম।

রাজরাজেশ্বরী, বৃটন-লক্ষ্মী, স্বর্গীয়া ভিক্টোরিয়া।

Mohila Press.

ভ্রম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। যদি আয়ুতে কুলায়, আর ঈশ্বরেচ্ছায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে সেই সময় যথাসাধ্য ইহার সংস্কার করিব,—এখন এই পর্য্যন্ত।

যে সকল গ্রন্থ হইতে আমি সাহায্য পাইয়াছি, সেই সকল গ্রন্থের নাম এবং গ্রন্থকারের পরিচয়, গ্রন্থমধ্যেই পাইবেন। তবে, বিশেষভাবে এক মহাত্মার নাম এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বর্গগত সুধী ও সুপণ্ডিত, বিচক্ষণ সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে আমি এখানে উদ্দেশ করিতেছি। কেন না, তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" এ শ্রেণীর আদি গ্রন্থ। সেই পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী লেখকমাত্রেই লেখনী চালনা করিয়াছেন। এ শ্রেণীর গ্রন্থরচনায়, কোন-না-কোন প্রকারে তাঁহার গ্রন্থের সাহায্য না লইয়াছেন, এমন একটি প্রাণীও ত দেখি না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহ কেহ তাহা আদৌ উল্লেখই করেন নাই। আমরা সরল মনে ও সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ আদর্শস্বরূপ না পাইলে আমাদেয় এ গ্রন্থ রচিত হইত কিনা সন্দেহ। তজ্জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে সেই স্বর্গগত মহাত্মার চরণে, বার বার প্রণাম করি।

মজিলপুর,
'কর্ণধার'-কুটীর।

সেবক
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সূচিপত্র।

—:○:—

উত্তর ভাগ।

আভাষ।

জীবন অনন্ত, পথও অনন্ত। অনন্ত জীবন লইয়া অনন্ত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি, পথ ত ফুরায় না? কবে—কোন্ জন্মে এ পথের অবসান হইবে, তা কে বলিতে পারে?

পথে চলিতে চলিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়ি। একটু বিশ্রাম লই,—আবার চলি। না চলিলে নয় বলিয়া চলি। কেন না, পথ-প্রদর্শক যে টানিয়া লইয়া যায়। কোথায় যে যায়, তা সেই জানে। যাইতে যাইতে কবির ভাষায় বলিতে থাকে,—

"আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
প'ড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে ম'রে কিবা ফল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!"

কাজেই চলিতে হয়।

তবে, এই চলা-ফেরার মধ্যে একটু আরামও আছে।—কত কি দেখা যায়, কত কি শেখা যায়। দেখিয়া শিখিয়া একটু পোক্ত হইলে খেলিবারও সাধ যায়। অনন্ত জীবন-যাত্রায় খেলার সামগ্রীও অনন্ত। তাই এই সাধের খেলানা লইয়া থাকি।—মনে হয়, মনুষ্য-জন্ম বৃথা নয়।

এই ধারণাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের মোহন বিকাশ।—শেষলক্ষ্য কিন্তু ভগবান্।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে, এই শেষ লক্ষ্যকেই, কোন কোন ভাগ্যবান্, পূর্ব্ব-লক্ষ্যে পরিণত করেন।

তা খেলাতেই যখন সুখ, তখন খেলার সখ্ ছাড়ি কেন? সংসার-রঙ্গালয়ে সকলেই ত আপন ওজন অনুযায়ী একটু আধটু খেলিতেছে।

ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ আত্মানন্দ লাভ করিয়া ভূমা পুরুষকে লইয়া আপন মনে খেলিতেছেন; আর ক্ষুদ্র সংসারী স্ত্রী-পুত্র পরিজনে পরিবৃত হইয়া, লূতাতন্তুর ন্যায় আপন জালে জড়াইয়া জড়াইয়া একাগ্র মনে খেলিতেছে।—মোহই হউক আর মায়াই হউক, অথবা স্বপ্নই হউক আর এমনি কিছু একটা হউক,—উপস্থিত ত মনের সাধে খেলার সখ মিটাইতেছে বটে? তারপর পরিণাম,—ও দু'য়েরই এক। তবে কিছু অগ্রপশ্চাৎ বটে, আর কিছু হাসি-কান্না ও সুখদুঃখের তারতম্যও বটে। তা হউক, খেলায় আমোদ আছে। নহিলে সংসারশুদ্ধ লোক ইহাতে মজিবে কেন?

'সাধনায় সিদ্ধি'—এ মহাজন বাক্য। যার যেমন সাধনা, তার সেই মত ফল। যেমন ভাগ্য লইয়া আসিয়াছি, সেই মত কার্য্য করিয়া যাইব—দুঃখ কি?

আশা মিটিল না? জন্মান্তর আছে। মনে অনেক আকাঙ্ক্ষা লইয়া মরিতে হইল? জীবের মৃত্যু নাই। পরমবস্তু চিনিলে না বলিয়া দুঃখিত হইতেছ? চল,—দুঃখ নাই,—পথ অনন্ত, জীবনও অনন্ত। অনন্তে তাঁহার সহিত একাকার হইয়া যাইবে।

ভক্তিমার্গ, কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ—ও সব বড় কঠিন কথা। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি,—আমার যে পথ, তাহা আমি চিনিয়া লইয়াছি। আশা, সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমি সেই মহাবর্ত্মে পঁহুছিব। মাতৃস্তনপানের সহিত যে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছি, জীবনে মরণে তাহাই আমার সম্বল হউক। আমার সাহিত্য-সাধনা আমার পথপ্রদর্শক হউক।—এ সাধ কি পূরিবে না?

জীবনের সুদীর্ঘকাল যে কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তুচ্ছ সুখ দুঃখ, পুরস্কার তিরস্কার উপভোগ করিলাম,—যদি একজনকেও জীবন দিয়া যাইতে পারি, তবে সে শ্রম সার্থক বোধ করিব। এইটুকু আমার স্পর্দ্ধা, অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য।

মঙ্গলাচরণ।

১

নাম কি মধুর! জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম কান্নার স্বরে, অতি অস্পষ্টভাবে প্রথম যে নাম উচ্চারণ করিয়াছি,—আর আজি এই সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে বিজড়িত জীবন-সায়াহ্নে যে নামের ভেলা অবলম্বন করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা পাইতেছি,—এবং ভবিষ্যতে কর্ম্মসূত্রে যে ভাবে, যেমন অবস্থায়, যে নাম-মালা জপ করিতে করিতে ইহজীবনের অবসান হইবে,—সে সকলের মূলেই আমার মহামাতৃভাব বিরাজিত। এ মা, আমার গর্ভধারিণী জননীও বটেন, আর এ মা আমার শব্দরূপিণী, ভাবময়ী ভাষাও বটে। মাকে ভালবাসা এবং ভক্তি করা যেমন স্বাভাবিক, মাতৃভাব-জড়িত মাতৃভাষাকেও ভালবাসা ও ভক্তি করা তেমনই স্বাভাবিক। যে স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে, সেই স্থানে

বুঝিতে হইবে যে, কোন-না-কোন বিষয়ে, কিছু-না-কিছু উলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

মাকে সেবা করিবার অধিকার সকলেরই আছে; সেবা করেনও সকলে।—কেহ প্রত্যক্ষভাবে মাতৃসেবা—মাতৃপূজা করেন; কেহ পরোক্ষে মাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। আর যিনি, এ দু'য়ের কোন দিকেই নন, তিনি সহস্র গুণে গুণবান্ বা সৌভাগ্যবান্ হইলেও, কৃপার পাত্র।

যে প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীর পুণ্যস্মৃতি অবলম্বনে এই প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে, তাঁহার সম-সময়ে, তাঁহার শান্তিময় রাজত্বকালে, আমার এই মাতৃস্থানীয়া মাতৃভাষার মোহন বিকাশ। মাতৃস্তনদুগ্ধ পানের সহিত আমরা যে নাম শুনিয়া আসিতেছি এবং আমাদের মধ্যে 'কাহারও কাহারও পিতা ও পিতামহও যে পবিত্র নাম শুনিয়া আসিয়াছেন,—সেই মূর্ত্তিমতী করুণা—দয়াময়ী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যপ্রভাব,—আমার ভাষার বর্ণে বর্ণে সুচিত্রিত হইয়াছে এবং চিরদিন হইবে। আমার ভাষাও যেমন করুণাময়ী, আমার ভাষার পালন-কর্ত্রী—জননী ভিক্টোরিয়াও তেমনি করুণাময়ী।—ভিক্টোরিয়া আমার ভাষার পালন-কর্ত্রী? হাঁ, সেই করুণাময়ী দেবীই আমার ভাষার পালন কর্ত্রী!—মনে পড়ে কি, সেই ১৮৫৭ সালের সেই ভারতব্যাপী সিপাহি-বিদ্রোহ? সেই বিদ্রোহ-বিপ্লবের অবসানেই না দয়াময়ী রাজ-রাজেশ্বরী মা আমার, প্রজার দুঃখে ব্যথিত-প্রাণ হইয়া, উদার উন্নত ভাবে, মুক্তকণ্ঠে এই অভয়বাণী ঘোষণা করেন,—"ভারত-প্রজার ধর্ম্মে বা ধর্ম্মবিশ্বাসে, কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না"—তাই না আজ হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত—সমগ্র ভারত তাঁহার আত্মার সদ্গতিলাভের জন্য প্রার্থনা-পরায়ণ? তাই না তিনি জীবনে মরণে, তুল্যরূপে ভারতবাসীর সভক্তি কৃতজ্ঞতার অশ্রু গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন? তাই না আরাধ্য ইষ্ট-দেবতার ন্যায় তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি, বুক চিরিয়া ভারতবাসীর বুকে বসিয়াছে? আর তাই না ভারতের সকল জাতির সকল ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে? হিন্দী, নাগরী বা উর্দ্দু—এ সকলের কথা বলি না,—জানিও না,—আমি বাঙ্গালী,—আমার প্রকৃতিদত্ত মাতৃভাষা,—আমার দীন হীন মলিন বাঙ্গালা,—আজ কাহার কৃপাকটাক্ষবলে, জগতের

সভ্যজাতির গৌরবস্পর্দ্ধী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে? কাহার অভয়বাণীর ফলে আমার মনুষ্যত্ব ও স্বাধীন ধর্ম্মভাব,—আজ আমার কাব্য-সাহিত্যে সমুদ্ভাসিত? কাহার শিক্ষা ও সমতা-বিস্তারগুণে আজ আমার জাতীয়তা, একতা ও সখ্য-সম্মিলনের শুভ সূচনা? কাহার মোহনমন্ত্রে আজ ভারতে কংগ্রেস, ধর্ম্মমহামণ্ডল, বিবিধ সভাসমিতি ও আবেদন-আন্দোলন? কাহার উদার উন্মুক্ত ধর্ম্ম-স্বাধীনতা-প্রচারে, বঙ্গ-কবির হৃদয়-বীণাঝঙ্কারে, 'ভারত-সঙ্গীত' 'যমুনালহরী' ও 'বন্দে মাতরং' গীতিতে দিক্‌সমূহ মুখরিত? মুক্তকণ্ঠে বলিব,—এ সকলই আমার স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীর সেই ৫৮ সালের অভয়বাণীর ঘোষণাফল!

ধীরচিত্তে একটু সূক্ষ্মভাবে ভাবিয়া দেখিলেই অনুমিত হইবে যে, ভিক্টোরিয়ার এই অভয়বাণীর মূলে ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির বীজ নিহিত আছে। তৎপূর্ব্বে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, ভারত-প্রজার ধর্ম্ম-স্বাধীনতার বিশেষ মূল্য ছিল না। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া হইয়া, পুনরায় যে, হৃদয়ের সাম্য-স্বাধীনতা ঘোষিত হইল,—তাহাই বিশেষ মূল্যবান্। উপরন্তু, যে ভারতে একদিন মুসলমান রাজা, এক হস্তে ইস্‌লামধর্ম্ম ও অন্য হস্তে তরবারি ধারণ করিয়াছিলেন,—রাজরাজেশ্বরী করুণাময়ী ভিক্টোরিয়া, সেই ভারতে, প্রজার ধর্ম্ম-বিশ্বাসে, সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার দিলেন!—এ কি কম উদারতা ও মহত্ত্ব? আমাদের অদৃষ্ট-দোষে তাহার ফল যাহাই হউক্, ভিক্টোরিয়ার রাজনীতির মূলমন্ত্র বড় গভীর ও পবিত্র। তাই, সকল কার্য্যের মধ্য দিয়াই জননীর সেই অভয়বাণীর ঘোষণার কথা মনে পড়ে। এই অভয়বাণী পাইয়াই, স্বভাবের নিয়মবশে, যেন আমার অৰ্দ্ধমৃতা ভাষা-জননী স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে সজীব হইয়া অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সেবা ও পূজার জন্য,—তাঁহার পালন ও পুষ্টির নিমিত্ত, তাঁহার ভক্তসন্তানগণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে! জননী হাসিলেন, হাঁফ ছাড়িলেন,—যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। সেই জন্যই স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যস্মৃতি,—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে চিরদিন সমুজ্জ্বল রহিবে। অন্যান্য বহু বিষয়ের সহিত সেই পবিত্র স্মৃতি চিরজড়িত আছে এবং চিরদিন থাকিবেও;—পরন্তু, বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত সেই স্মৃতি বিশেষ-

ভাবে জড়িত থাকিবার কারণ এই যে, বাঙ্গালী বড় কৃতজ্ঞ রাজভক্ত জাতি। তাই, স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী বৃটন-লক্ষ্মীর নিকট হিন্দুসন্তান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যে উপকার পাইয়াছে,—সে উপকার, সে আজীবন মনে রাখিবে, এবং তাহার আত্ম প্রতিবিম্ব তুল্য কাব্যে ও সাহিত্যে, তাহা চিরকাল দেদীপ্যমান্ থাকিবে।

ফলতঃ মাতা, মাতৃভাষা ও ভিক্টোরিয়া—এ তিনই আমাদের চোখে এক।

সূচনা।

২

ভিক্টোরিয়া-যুগের পূর্ব্বে, অর্থাৎ আজ একশত বৎসর আগেকার কথা আলোচনা করিলে, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিষয়, যেন আমাদের স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য পদ্য সাহিত্য বা কবিতারাজ্য, এদেশে চির উন্নত; স্বাভাবিক নিয়মবশেও বটে, আর ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদের ভগবদ্ মহিমা অনুশীলনের ফলেও বটে। সাহিত্যের সেই সূক্ষ্ম ইতিবৃত্তের অনুশীলন করিলে অবাক্ হইতে হয়। বক্ষ্যমান্ প্রস্তাবের গতি ও ক্রমোন্নতি আলোচনা ব্যপদেশে, আমাদিগকে সেই প্রাচীন যুগে প্রবেশ করিতে হইবে, এবং তাহারও বহুপ্রাচীন যুগে প্রবিষ্ট হইয়া বঙ্গসাহিত্যের মূলসূত্র টানিয়া বাহির করিতে হইবে। কখন্ কি ভাবে কোন্ মহাত্মা সারস্বত উপাসনায় নীরবে জীবন যাপন করিয়াছেন; কোন্ কবি বা সাধক ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা উদ্দেশ্যে মানস-পদ্ম উৎসর্গ করিয়া প্রকারান্তরে ভাষা-জননীর বন্দনা করিয়া গিয়াছেন; সে গুলি একে একে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সকল মহাত্মার সম্যক অনুসন্ধান একরূপ অসম্ভব; কেন না প্রচীন যুগের ইতিবৃত্ত আমাদের নাই। মহাজনেরা যে পথ অবলম্বন করিয়া শ্রেয়ঃ লাভ করিয়াছিলেন এবং এখনও যাঁহাদের হৃদয়-বীণা-ঝঙ্কারে বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালা দেশ মুখরিত,—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আমাকেও

সেই মহাজনগণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইবে। নচেৎ এ চিত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে এবং মূল না দেখিলে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের গতি প্রকৃতি, তাহার উন্নতি অবনতি, কেহ অবধারণ করিতেও পারিবেন না। তাই আজ হইতে প্রায় ৬।৭ শত বৎসর আমাদিগকে পিছাইয়া যাইতে হইবে এবং সেই পরম পুণ্যবান্ বৈষ্ণব-কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পুণ্যকথা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের যুগে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কেন না, সেই-ই সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যের আদিম স্তর। তাহারও পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্য বা বঙ্গভাষার যে আদিমস্তর ছিল, (অর্থাৎ ত্রিপুরার রাজাবলী প্রভৃতি) তাহার আলোচনা—প্রত্নতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং সেই অতীত যুগের আনুমানিক তাম্রফলক, তাম্রশাসন, কীটদষ্ট জীর্ণপুঁথির আবিষ্কার, হস্তাক্ষর, অক্ষরের নমুনা, শকাব্দ সংবৎ সন তারিখ মাস আদির খুটীনাটী উদ্ধৃত করিয়া আমরা পুঁথি বাড়াইলাম না। সাহিত্যের সমালোচনা হিসাবেও পাঠকের পক্ষে তাহা নীরস ও বিরক্তিকর হইবে। আমরা সর্ব্বজনমান্য বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের যুগ হইতে এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যুগ অর্থে আমরা কাল নির্দ্দেশ করিয়াছি; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগের নাম লইয়া আমাদের ভিক্টোরিয়া-যুগের যেন কেহ কদর্থ না করেন। কেননা এরূপ ভাষা-সমালোচকের অভাব এখন নাই। অপিচ আমাদের এই আলোচনা যে নির্ভুল হইবে না,—ইহাতে যে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি থাকিবে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। আমাদের ধারণা বা সিদ্ধান্তেও যে সকলে এক-মত হইবেন না, তাহাও বুঝিতেছি। সুতরাং অনেকের সহিত মতবিরোধ বা মতান্তর অনিবার্য্য। কিন্তু এই মতান্তর উপলক্ষে কাহারও সহিত মনান্তর না ঘটিলে, সৌভাগ্য বোধ করিব। বঙ্গ-সাহিত্যের এই প্রাচীন স্তর ভেদ করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমরা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের যুগে উপনীত হইলাম।

পূর্ব্বভাগ—বিদ্যাপতি।

—*০*—

থিল কবি বিদ্যাপতি গীতি-কবিতায় রাজ-রাজেশ্বর। বৈষ্ণব-কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী তাঁহার আদর্শ হইলেও, কবিতার বৈচিত্র্যে, রচনার বিশেষত্বে, তিনি গুরুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। একাধারে ভাবের গভীরতা ও অসাধারণ লিপিকুশলতা তাঁহার প্রায় সকল কবিতায় পরিদৃষ্ট হয়। পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা, ভূয়োদর্শন ও ভগবৎ-প্রেম তাঁহাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। উপমায় যেমন কালিদাস অবিসংবাদিরূপে শ্রেষ্ঠ, গীতি-কবিতার উপমাতে বিদ্যাপতিও সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ;—ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষ তাঁহার মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রেমের গাঢ়তা,—অসাধারণ লিপিকুশলতায় মিশিয়া তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আসন দান করিয়াছে। চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস বা নরোত্তম দাস—সকলেই উচ্চাঙ্গের সাধক-কবি হইলেও, গীতি-কবিতার গভীরতার হিসাবে বিদ্যাপতির স্থান সকলের উচ্চে। এক কালীর বরপুত্র জগদম্বার সন্তান শ্রীরামপ্রসাদের মা-নাম ব্যতীত ভাবের এমন পুণ্যপ্রভাব, আজ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয় নাই। শুধু বঙ্গসাহিত্য কেন, পৃথিবীর যে কোন সাহিত্য বিদ্যাপতির নিম্নের কয়টি বিশেষ চিহ্নিত অংশ লইয়া গৌরবান্বিত হইতে পারে।

(১) ***কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত
সাগর লহরী সমানা।

এই চারি ছত্রে ঈশ্বর-তত্ত্বের যে অপূর্ব্ব চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই চারিছত্রেই সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র—বেদান্ত গীতার সারাংশ প্রকটিত।

(২) জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

এই দুই ছত্রে রূপ বর্ণনার যে চারুচিত্র অঙ্কিত, মনে হয়, সৌন্দর্য্যসাগরে না ডুবিলে, এমন ভাবের ছবি কেহ আঁকিতে পারে না।

(৩) যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু মেলি পরিজনে খায়।
মরণ বেরি হেরি কহি না পুছই করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়।
তুয়াপদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি, পার হবো কোন্ উপায়॥

—অনুতাপের কি জ্বালাময়ী মর্ম্মভেদিনী উক্তি!

(৪) তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম, সুত-মিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু, অবমঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন-দয়াময়, অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম, নিন্দে গোঙায়নু, জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রস-রঙ্গে মাতনু, তোহে ভজব কোন্ বেলা॥

ত্রিতাপজ্বালা-জর্জ্জরিত মুমুক্ষুব্যক্তির কি গভীর অনুশোচনা! অন্তিমে, বৈতরিণী-তীরে দাঁড়াইয়া, জীবন-সন্ধ্যায়, বোধ হয় সকলকেই এই ভাবে খেদ করিতে হয়।

আর আদ্য রসে—প্রেমের কবিতায় কবির যে স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই—

(ক) অপরূপ পেখনু রামা
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা ॥
(খ) সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

——ইত্যাকার শৃঙ্গার রসাশ্রিত গীতি-কবিতায় আজ পর্য্যন্ত কেহ বিদ্যাপতিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবে, এ কথা অবশ্যই বলিব, জয়দেবের গীতগোবিন্দের ছাঁচ লইয়া বিদ্যাপতি তাঁহার মানস-প্রতিমা গঠন করিয়া গিয়াছেন। ভাব ও ভাষার ক্রমবিকাশ এইরূপেই হয়। জয়দেব সাধক ও পরম প্রেমিক বৈষ্ণব-কবি; স্বয়ং শ্রীভগবান্ প্রচ্ছন্নভাবে আসিয়া তাঁহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন;—আস্থাবান হিন্দু এ কথা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত নন। সেই—

"স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারং।"

——ইতিশীর্ষক অমরগাথা আবৃত্তি করিয়া ভক্তিনিবিষ্টচিত্তে যিনি গুরুর পদারবিন্দ ধ্যান করেন, গুরু-কৃপায় তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেই হইবে। সিদ্ধ ত হইবেই, কখন কখন বা গুরু, কৃপাপরবশ হইয়া, শিষ্যকে, আপনা অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতা দান করেন। গুরু-শিষ্যের এই গুহ্য-সম্বন্ধ বড়ই বিচিত্র ও রহস্যময়। 'গীত-গোবিন্দ' সংস্কৃত গীতিকাব্য হইলেও, শব্দবিন্যাস ও ভাষার সরলতায় প্রায় বাঙ্গালা। বোধ হয় আপামরসাধারণের বোধগম্য হইবার উদ্দেশ্যে, কবি তাঁহার অতুল্য প্রতিভাবলে এই অপূর্ব্ব সুন্দর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। অথবা, প্রকৃতির নিদেশানুসারে, ভগবানের অভিপ্রায়েই, সংস্কৃত ভাষা-জননী, যেন তাঁহার ভাবী প্রিয়কন্যা বঙ্গভাষার অস্তিত্ব, বহু পূর্ব্ব হইতে শ্রীজয়দেবের লেখনীমুখে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের আদিকবি শ্রীজয়দেব। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী; তাই আমরা তাঁহাকে মৈথিলকবি বলিয়া বর্ণন করিয়াছি। এখন, মিথিলা যে বঙ্গদেশেরই

একটি অংশ ও তাহার অন্তর্গত এবং কবি বিদ্যাপতিও যে সে হিসাবে মৈথিলী হইয়াও একরূপ বাঙ্গালী, তাহার প্রমাণ আর আমায় কষ্ট করিয়া দিতে হইবে না ;—ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়, ও প্রথিতনামা রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহাত্মারা তাহা অনেক রকমে দিয়া গিয়াছেন।

শুভক্ষণে সেই বিদ্যাপতি,—সাধক ও সিদ্ধ শ্রীজয়দেবকে গুরুপদে বরণ করিয়া, আধা বাঙ্গালা, আধা হিন্দি, আধা ব্রজবুলিতে পদ যোজনা করিয়া তাঁহার অদ্ভুত 'পদাবলী' লোকলোচনের সম্মুখে আনিয়াছেন। বাঙ্গালী চির-দিন গৌরব করিতে পারিবে, তাঁহাদের আদি কবি শ্রীজয়দেব ও বিদ্যাপতি।

অনুমান ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি—পুরুষানুক্রমে বিদ্বান্—এইরূপ কিংবদন্তী। সুতরাং সম্ভ্রান্ত বিদ্বানের বংশে ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির জন্ম। কালে তাঁহার ঠাকুর উপাধিও হইয়াছিল। 'বিদ্যাপতি ঠাকুর' বলিয়া লোকে তাঁহার সংবর্দ্ধন করিত।

বিদ্যাপতি—মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাপতি ছিলেন। কালবশে শিব সিংহের নাম এখন লুপ্ত ; কিন্তু কবি বিদ্যাপতি রাজ-রাজেশ্বর রূপে ভাবুক পাঠকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

পুরুষপরীক্ষা, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, গয়াপত্তন প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও ঠাকুর বিদ্যাপতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পদাবলীর তুলনায় সে গুলির নাম একরূপ লুপ্ত।

বিদ্যাপতির বংশধরগণ আজিও বর্ত্তমান। গুণের পুরস্কার স্বরূপ, রাজা শিব সিংহ বিদ্যাপতিকে উপাধি, সনন্দ ও একখানি গ্রাম দান করেন। বিস্পী নামে সেই গ্রাম—ত্রিহুত-সীতামারীর অধীন—কমলা নদী তীরে অবস্থিত। ই-আই-রেলওয়ের 'বাঢ়' ষ্টেশনের অতি নিকটে এই গ্রাম বর্ত্তমান। কবির ভক্তবৃন্দ ইচ্ছা করিলে কবির জন্মস্থান দেখিয়া আসিতে পারেন।

এক দিকে বীরভূমে, অজয় নদের তীরে, কেন্দুবিল্বগ্রামে, বাঙ্গালার আদি কবি মহাত্মা শ্রীজয়দেব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করিয়া, পুণ্যতীর্থরূপে সেই গ্রাম পবিত্র করিয়া গিয়াছেন,—আর একদিকে তাঁহার প্রধান শিষ্য—বিদ্বান্

বিদ্যাপতি—মিথিলার রাজ-সারস্বত-কুঞ্জ মুখরিত করিয়া, চারিদিকে ভাবের প্রবাহ বহাইয়া, আজ জগদ্-বরেণ্য। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, প্রৌঢ়ের সন্ধিক্ষণে, মহাকবি মহা প্রয়াণ করিয়াছেন।

কবির নশ্বর দেহ পাত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অবিনাশী কীর্ত্তি—অদ্ভুত পদাবলী—অমররূপে পূজা পাইতেছে, ও যাবচ্চন্দ্র দিবাকর পূজা পাইবে।—মহতী প্রতিভার মৃত্যু নাই।

বিদ্যাপতির সাধনা এবং ঐশীশক্তিও ভাবিবার বিষয়। প্রবাদ এইরূপ যে, "মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে মুমূর্ষু বিদ্যাপতি গঙ্গাযাত্রী হইয়া স্বগ্রাম হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করেন, তাবপর গঙ্গা যে স্থান হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত, সেই বাজিত গ্রামে থাকিয়া তিনি বলেন, 'আমি এতদূর আসিলাম, আর মা-গঙ্গা কি এতটুকুও পথ আসিবেন না? আমি এই গ্রামেই থাকিলাম, দেখি, অধম সন্তানের প্রতি জননীর দয়া কিরূপ?' বিদ্যাপতি সেই গ্রামে থাকিলেন, রাত্রির মধ্যে ভক্তবৎসলা ভগবতী ভাগীরথী, স্রোতোধারাপথে সেই গ্রামে আসিলেন; বিদ্যাপতি পরমানন্দে সেই স্রোতোধারারূপিণী ভাগীরথীর তীরে দেহত্যাগ করিলেন। পরে বিদ্যাপতির চিতা যেখানে ছিল, সেইখানে এক শিবলিঙ্গ উদ্ভূত হইল। এই শিব বিদ্যাপতিশ্বর নামে প্রসিদ্ধ।" *

কিন্তু দ্বিতীয় কিংবদন্তী অন্যরূপ,—কবির সহিত রাজমহিষীর অবৈধ গুপ্ত-প্রণয়। রাজা শিব সিংহের মহিষী লছিমা দেবীকে দেখিলেই বিদ্যাপতির "কবিত্বস্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত।" "বিদ্যাপতি লছিমা দেবীকে রাধা জ্ঞান করিতেন, লছিমা দেবীও তাঁহার নায়ককে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেন।" ক্রমে এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। সত্য মিথ্যা পরীক্ষার্থ, রাজা বিদ্যাপতিকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং সেই রুদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে কবিতা রচনা করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু স্বভাবকবি, কবিতায় সিদ্ধহস্ত হইয়াও বহু চেষ্টায় এক ছত্র রচনা করিতে পারিলেন না। এমন সময় রাজমহিষী লছিমা দেবী সেই কারাসংলগ্ন গবাক্ষ-পথে আসিয়া একবার—

* শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "বঙ্গভাষার লেখক।"

কেবল একবার মাত্র চকিতে তাঁহাকে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, লছিমা দেবীর সেই ক্ষণিক আবির্ভাবও প্রেমিক কবির সেইরূপ কবিত্ব-প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিল। সেই প্রস্রবণ-মুখে এত-ক্ষণ যেন একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর সংলগ্ন ছিল,—প্রফুল্লাননা সুহাসিনী রাণীর আবির্ভাব মাত্রেই, যেন মন্ত্রবলে সেই প্রস্তর তথা হইতে অপসৃত হইল,—আর তন্মুহূর্ত্তেই প্রকৃতির প্রিয়পুত্র প্রেমিক কবির মুখ হইতে অনর্গল কবিতার অমিয়ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার একটি চরণ এই,—

"গেলি কামিনী, গজবর গামিনী, বিহাস পালটি নেহারি।"

তখন রাজা চমকিত, সভাসদবর্গ স্তম্ভিত। ইহার ফলে, রাজরোষে-পতিত কবি—শূল-দণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন।

কোথায় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ, আর কোথায় রাজরোষোদ্দীপ্ত ভীষণ প্রাণ-দণ্ড!—কোন্‌টা ঠিক, কে নিরূপণ করিবে? তবে, রাজরাণীর সহিত কবির গুপ্ত প্রণয়ের কথা, উভয় পক্ষই স্বীকার করেন।

এখন, এই প্রেম-রহস্যের সূক্ষ্ম ইতিবৃত্ত বিবৃত করে কে? অনাবিল সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি—কিংবা সেই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যাধারের ধ্যান-ধারণা হইতে এ প্রেমের উদ্ভব,—অথবা মানবীয় রূপজ মোহের প্রভাব ইহাতে বিদ্যমান?

বড়ই কঠিন সমস্যা। প্রগাঢ় দার্শনিকও এ প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ। আমাদের এখানে মূক থাকাই বিধেয়।

কেন না, মানবচরিত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও কেহ ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না। কোন্ বস্তুর অবলম্বনে যে কি ফল হয়, কার্য্য-কারণ-পরম্পরার আদি 'নিমিত্ত' যে কোন্‌টা, সাহস করিয়া সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

বলিবে—'অবৈধ প্রেমের ফল কখন অত উচ্চ হইতে পারে না,—সুতরাং বিদ্যাপতির এই প্রেম কাম-গন্ধ-বর্জ্জিত, অপার্থিব ও স্বর্গীয়।' লছিমা দেবী সম্বন্ধেও তাই। নচেৎ কবির প্রতি দুরপনেয় কলঙ্ক পড়ে—'আশ্রয়-দাতা, প্রভু ও জনপালক রাজার সর্ব্বনাশ চেষ্টা যে করে, সে আবার দুর্লভ 'কবি-প্রতিভা' লাভ করিবে কিরূপে?'

কিন্তু ভগবানের বিচার বড়ই সূক্ষ্ম, মায়ার খেলা অতীব বিচিত্র। কো᠄
বীজ দিয়া যে তিনি কি ফল উৎপাদিত করেন, তাহা তিনিই জানেন।

আসল কথা, ভগবৎ কৃপা হইলে সকলই সম্ভবে। ভাগ্যবান্ বিদ্যাপতিঃ
এই ভগবৎ-কৃপা অসামান্য রূপে লাভ হইয়াছিল; তাহারই ফলে, হয় ত
তিনি পাপপুণ্যেরও অতীত হইয়াছিলেন।

যাই হোক্, কবির এ সূক্ষ্ম হৃদয়-কথা পরিব্যক্তির স্থান এখানে নয়।
চিন্তাশীল পাঠক, নিবিষ্ট মনে কবির অদ্ভুত পদাবলী পাঠ করিবেন,—পুলকে,
বিস্ময়ে, ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বার বার সেই স্বর্গীয় কবির মধুর স্মৃতি
ধ্যান করিতে হইবে। তুমি আমি তুচ্ছ কথা,—স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব
যাঁহার অমৃতময়ী রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়িণী বর্ণনা শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর
হইতেন এবং অবিরল প্রেমাশ্রুধারায় ধরাতল অভিসিক্ত করিতেন, সেই
পুণ্যবান্ মহাকবির মহতী প্রতিভা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দিহান হওয়া অপরাধ
মাত্র। 'বৈষ্ণবাপরাধ!'—সকল অপরাধের মার্জ্জনা আছে, বৈষ্ণবাপরাধের
মার্জ্জনা নাই।

চণ্ডিদাস।

বিদ্যাপতির পর চণ্ডিদাসের নাম উল্লেখ করিতে হয়। দুইজনেই প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্যকার হইলেও, রচনার পারিপাট্য ও ভাবের গাম্ভীর্য্য হিসাবে, বিদ্যাপতির পর চণ্ডিদাসের আসন নির্দ্দেশ করা, আমরা সঙ্গতবোধ করি। চণ্ডিদাস খাঁটী বাঙ্গালী কবি বটেন, এবং হয়ত তাঁহার আবির্ভাব-কাল বিদ্যাপতির পূর্ব্বেও হইয়া থাকিবে, তথাপি কবিত্বের মর্য্যাদা ও গৌরব হিসাবে, বিদ্যাপতিকেই আমরা প্রথম আসন দিতে বাধ্য।

কোন কোন সমালোচক বলেন, বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর, চণ্ডিদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক। একজন দার্শনিক, অন্যজন ভাবুক—ইত্যাদি।

কিন্তু, কথাটা কি ঠিক্? এইরূপ একটা কথা সাহিত্যে কিছুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনেকে না বুঝিয়া তাহাই অনুমোদন করিয়া যাইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের কথা এখানে উল্লেখ-যোগ্য। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে ভারতচন্দ্র সুখের কবি, মুকুন্দরাম দুঃখের কবি,—সুতরাং ভারত হইতে মুকুন্দ বড়। বোধ হয়, তাঁহাদের মনের ভাব, সুখ অজ্ঞ—দুঃখ জ্ঞানী যখন, তখন কবিতায়ও সেই ভাবের ছায়াপাত

পরিদৃষ্ট হইবে। ভাসা-ভাসা ভাবিলে এইরূপই বোধ হয় বটে, কিন্তু এরূ ধারণা সমীচীন ও উচ্চ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক নহে।

মনে কর, একজন পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে সুখের কোলে প্রতিপালি হইয়াছে, আর একজন আজন্ম দুঃখ সহিয়া সহিয়া অনেক পোড় খাইয়া মানু হইয়াছে,—এ উভয়ে কবি বা চিত্রকর হইলে, দ্বিতীয় জন যে সুনিশ্চিতরূে প্রথম আসন পাইবে, এমন কোন কথা নাই। দুঃখের প্রতি আমাদে নাকি স্বাভাবিক সহানুভূতি যায়, তাই আমরা স্বভাবত দুঃখের পক্ষপাতী হইয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের মধ্যেও যে একটা মহাসুখ আছে এবং সুখের মধ্যেও যে একটা মহাদুঃখ আছে, তাহা কয়জনে উপলব্ধি করেন? সে উপলব্ধি ঠিক্ ঠিক্ হইলে, 'কবি-প্রতিভার' সমালোচনায় এরূপ একদেশ-দর্শিতা স্থান পায় না।

কথা হইতেছে, দেশকালপাত্রানুযায়ী অভাব, ও সেই অভাব পূরণের প্রকৃষ্ট পন্থা। ক্ষেত্র যেরূপ, প্রয়োজনও সেইরূপ হইয়া থাকে। সুখের চিত্র আঁকিবার যদি প্রয়োজনই হইয়া থাকে, তবে কেন দুঃখের ছবি অঙ্কিত হইবে? দুঃখে যেমন, সুখেও ত তেমনি আত্মার আহার সঞ্চিত হয়? আঁধারে উপাসনা জমে ভাল বটে, কিন্তু সূর্য্যোপাসক যিনি, তাঁহার ত সবিতা সন্দর্শন না হইলে পূজাই হইবে না? অতএব 'সুখের কবি' হইলেই যে তাঁহার মর্য্যাদা কমিয়া গেল, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয়।

সুখের কোলে পালিত রাজপুত্র বুদ্ধও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন,—ভবানীর প্রিয়পুত্র রাজা রামকৃষ্ণও সর্ব্বত্যাগী হইয়া কঠোর শব-সাধন করিয়াছিলেন, ধনাঢ্য ভূস্বামী রূপ-সনাতন—সেই ধর্ম্মপ্রাণ ভ্রাতৃযুগলও সর্ব্ববিধ পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। অতএব 'সুখের কবি' হইলেও 'কবি প্রতিভা' খাটো হইল না।

তার পর কথাটা ঠিক্ কিনা, তাহাও বিচার্য্য। যে কবি অনুতাপের তুষানলে পুড়িতে পুড়িতে বলিতে পারেন,—

'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।

তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিণু,
অব মঝু হব কোন্ কাজে ॥
মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা।'

——তিনি কি 'সুখের কবি?' অধ্যাত্ম-জগতে ইহার পর মর্ম্মান্তিক দুঃখ আর কি আছে জানি না।

দ্বিতীয় কথা,—'বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর, চণ্ডিদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক ইত্যাদি।' এরূপ মন্তব্য প্রকাশের হেতু যে কি, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। কেন না, যে কবি গভীর বেদান্তের মায়াবাদ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব, আপন অতুল্য কবিত্ব-তুলিকায় অঙ্কিত করিলেন, এবং স্বল্পাক্ষরে যাহার মহান্ বিরাট্‌ভাব অতি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল ভাবে পাঠকের চক্ষুর উপর ধরিলেন,—তিনি হইলেন—মাত্র—বহির্জগতের চিত্রকর! কিন্তু সে চিত্রটি কেমন?—না,

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত,
সাগর-লহরী সমানা ॥"

—সাগর ত দেখে সকলেই; কিন্তু সেই সাগর-লহরী দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মের বিরাট্‌ভাব জাগে কয়জনের মনে? কে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া মনে মনে বলিতে পারে,—

'কত চতুরানন মরি মরি যায়ত, ন তুয়া আদি অবসানা।'

——ইহা কি বহির্জগতের চিত্র,—না অন্তর্জগতের অসামান্য আলেখ্য? এরূপ একটি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অত্যুন্নত কবিতা আর কোথাও কৈ, দেখাও দেখি?—হায়, 'সাধারণ-সম্পত্তি!'

বৈয়াকরণ ও ভাষাসংস্কারক কেবল ব্যাকরণের বাঁধন ও ভাষার খুটীনাটী লইয়াই কালাতিপাত করেন, আর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কেবল তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক, হস্তলিখিত পুঁথি ও সন তারিখ খুটীনাটী ধরিয়া নূতন আবিষ্কারেই ব্যস্ত থাকেন;—তাঁহারা যদি সেই শক্তি ও সময়ের কিয়দংশও এই অংশে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে প্রকৃত সমালোচনার অভাবে সাহিত্যের এরূপ

সর্ব্বনাশ ঘটিত না। সাহিত্য সাধারণ-সম্পত্তি বটে, সে সম্বন্ধে সকলের কথা কহিবার অধিকারও আছে স্বীকার করি, কিন্তু এরূপ অসঙ্গত মন্তব্যও যে, সুদীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতে পারে, ইহা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়।

এখন, কবিবর চণ্ডিদাসের কথাই আলোচনা করি।

বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডিদাসেরও পরকীয় প্রেমানুরক্তির কথা শুনা যায়। সে পরকীয়া রমণী আবার রজককন্যা! কিন্তু রজক-কন্যা হইলেও সে ষোড়শী সুন্দরী; শশিকলার ন্যায় তাহার রূপ দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল।

ধন্য বীরভূম! ধন্য নান্নুর গ্রাম! এই স্থান ভক্ত-চূড়ামণি সাধক-কবি চণ্ডিদাসের পাদস্পর্শে গৌরবান্বিত হইয়াছে। বীরভূমবাসী,—জয়দেব ও চণ্ডিদাসের নাম লইয়া চির-গৌরবান্বিত হইতে পারিবে। ১৩৩৯ বা ৪০ শকে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডিদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃপুরুষের সুনিশ্চিত পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। কবি প্রায় ষাইট বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এ অংশে বিদ্যাপতি অপেক্ষা তিনি দীর্ঘায়ু।

চণ্ডীদাস দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। শৈশবেই তাঁহার পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়। অনাথ শিশু অনাথনাথের কৃপায় মানুষ যয়। "গ্রামের লোক দয়া করিয়া তাঁহার উপনয়ন দেন এবং পরে তাঁহাকে গ্রাম্যদেবতা বিশালাক্ষী দেবীর সেবায় নিয়োজিত করেন। চণ্ডিদাসের পিতাও এই বাশুলী দেবীর পূজা করিতেন। * * * চণ্ডিদাস দেবীমঠের অদূরে পর্ণকুটীরে অবস্থিতি করিতেন। ভগবৎ কৃপায় এই সময় হইতেই তাঁহার মন ইষ্টচিন্তায় বিভোর হইয়া উঠে। যথা,—

"নান্নুরের মঠে, পত্রের কুটীর, নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথা, ভজন করয়ে নিতি ॥" *

দেবীর ছলনা!—এই সময়েই ভক্ত চণ্ডিদাসের ভক্তি-পরীক্ষা আরম্ভ হইল। অসহায়া রজককন্যা রামমণি বা রামী, যেন কোন অলক্ষ্য শক্তির অব্যর্থ আকর্ষণে তথায় আনীত হইল। গ্রামের লোকে রামীকে অসহায়া

* বঙ্গভাষার লেখক।

দুঃখিনী বোধে, দেবীর মন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল। ভক্তিমতী রজকীও শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ঐ কাজ করিত এবং নিয়মিতরূপে দেবীর প্রসাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। চণ্ডীদাস নিজেও রামমণির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"অল্প বয়সে, দুঃখিনী রামিনী, সেবাতে নিযুক্ত হ'ল।
চণ্ডিদাস কহে, শশিকলার ন্যায়, ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥"

চণ্ডিদাস শুধু কবি নন,—সুকণ্ঠ সুগায়কও বটেন। তাঁহার গান শুনিয়া পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইত। শৈশব হইতেই সঙ্গীতে তাঁহার অনুরাগ। যেখানে গান হইত, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেখানে তিনি সেই গান শুনিতেন। এখন পরিণত বয়সে সঙ্গীতপ্রাণ সাধক কবি দেবী সমক্ষে স্বরচিত গাথা গাহিয়া ভক্তির অনাবিল অশ্রুতে আর্দ্র হইতেন।

ভক্তিমতী রামমণিও সে গান শুনিত। অনিমেষ নয়নে গায়ককে দেখিতে দেখিতে, গায়কের ভক্তিনম্র শান্তসৌম্যমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, ভাবের কর্ণে সে গান শ্রবণ করিত। গানের বর্ণে বর্ণে যে আক্ষেপ, যে অনুরাগ, যে বিরহ, যে মর্ম্মব্যথা ফুটিয়া উঠিত, তাহা যেন সজীব হইয়া তাহার সম্মুখে বিরাজ করিত,—আর সেও তখন জলভরা চোখে, কণ্টকিত দেহে, আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া, মনে মনে অনেক ভাঙ্গা-গড়ার কল্পনা করিতে করিতে, পিপাসিত প্রাণে সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিত। গায়কেরও অপাঁঙ্গে অশ্রু, গান যে শুনিতেছে, তাহারও সুন্দর মুখে মুক্তার ধারা। মুগ্ধনেত্রে উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিত। নির্জ্জন স্থান, নির্জ্জন দেবালয়;—অধিকাংশ সময় সেখানে আর কেহ থাকিত না। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মিল, প্রণয় গাঢ় প্রেমে পরিণত হইল।

এ প্রেম যে প্রথমাবস্থা হইতেই সুনিশ্চিত 'কাম-গন্ধ-বর্জ্জিত' ও 'নিকষিত হেম,'—মানবপ্রকৃতি আলোচনা করিতে বসিয়া এমন কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিব না, স্বভাবের যে নিয়ম, তাহার কিছু না কিছু ত ফলিবে? ভক্তের ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়,—

"কাজলকী ঘরমে যেত্তা সেয়ান হোঁয়ে থোড়া বুঁদ লাগে পর লাগে।
যুবতীকী সাতমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে থোড়া কাম জাগে পর জাগে॥"

কিন্তু চির প্রচলিত লোক-মতের বিরুদ্ধে কথা কওয়া, আর ভীমরু
চাকে খোঁচা দেওয়া সমান কথা। বুঝিতেছি, আমাদের এরূপ মন্তব্য প্রক
অনেক বাক্য-বাণ সহিতে হইবে।

হউক, মনে যাহা সত্য বুঝিতেছি, অপ্রিয় হইলেও মুখেও তাহা প্রক
করিব। নচেৎ এ কাজে হাত দিতাম না। সত্যের অপলাপ কর্
গড্ডালিকা প্রবাহের মত বিচরণ করায় অপরাধ হয়। বিদ্যাপতি
লছিমা দেবী সম্বন্ধে এ অবৈধ প্রণয়ের কথায় নিঃসন্দেহে কোন মতা
দিতে পারি নাই বটে, কিন্তু চণ্ডিদাস সম্বন্ধে, কি জানি কেন মনে হইতে
ইহার মূলে খানিকটা সত্য আছে।

তবে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব, প্রেমের গাঢ়তা হইলে, এতটুকু পরিণ
বয়সে, নায়ক নায়িকার এই প্রেম—সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয় ঈশ্বর-প্রেমে পরিণ
হইয়াছিল। আগে ভোগ, তারপরে যোগ। যাঁহার ইচ্ছায় উভয়ের
যোগাযোগ হইয়াছিল, মানুষের সাধ্য কি যে, তাহার ফল 'নয়' করে?

আর সে ফলও কি মন্দ হইয়াছিল? বিদ্যাপতির চরিতালোচন
বলিয়াছি,—ভগবান্ কোন্ বীজ দ্বারা কি ফল উৎপাদন করিবেন এ
তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা তিনিই জানেন। সর্পবিষও ত অব
বিশেষে সুধার কাজ করে?

আমাদের মনে হয়, চণ্ডীদাস ও রামমণির এই অবৈধ মিলন হইয়াছি
বলিয়াই, ভক্ত ও ভাবুক-সমাজ আজ তাঁহাদের বিরচিত স্বর্গীয় পদাবলী
সুধা পান করিতে পাইতেছেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গীত ও কবিত্বের প্রভা
বড় সামান্য নয়,—ভক্তিমতী প্রেমিকা রামমণির হৃদয়ে তাহা গভীর রেখাপা
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চণ্ডিদাসের অনুকরণে রামমণিও কতকগুলি
পদাবলী রচনা করিয়াছিল। না, রচনা কথাটা বলা ঠিক নয়,—ভগবানে
বন্দনাস্বরূপ আত্মনিবেদনে উভয়ে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন; তখন
সাহিত্য বা কাব্যক্ষেত্র ছিল না,—আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কোন গতিকে
এখন তাহা বঙ্গসাহিত্যে স্থান লাভ করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত
করিতেছে।

সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন্ অজ্ঞাত নির্জ্জন পল্লীর এক প্রান্তে,—পর্ণকুটীরে

বসিয়া তালপত্রে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ কতকাল হইল, হয়ত তাহা কীটদষ্ট—পরে অপর কর্ত্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া, কাহার কৃপায় কোন্ উপায়ে তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখন কি আর চণ্ডিদাসের সে চরিত্রাপবাদের কথা কাহারও মনে জাগে,—না, সেই রজক-কন্যা রামমণির অবৈধ প্রণয়ের কথা লইয়া লোকে কাণাকাণি করে? বিস্মৃতি—কালবশে সকলই বিস্মৃতিগর্ভে লীন হয়, থাকে কেবল সত্য ও সুমধুর স্মৃতি।

আজ প্রাচীন সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে আমরা সেই অতীত পুণ্যস্মৃতির উদ্বোধন করিয়া ধন্য হইলাম।

সুতরাং সুরুচি বা সুনীতির খাতিরে আমরা সত্যের অপলাপ করিব না, মনে যাহা বুঝিয়াছি, যথাসত্য তাহা প্রকাশ করিব। যে কবি বা ভগবৎ-প্রেমিক সাধক—সাধনার আনুকূল্য হেতু—আপন জাতি-কুল-মান সকলই ভুলিতে পারে এবং প্রাণের আবেগে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে,—

'তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদ মাতা গায়ত্রি॥'

অন্যত্র—

'শুন রজকিনী রামি!
ও দুটি চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি॥'

অথবা—

ওরূপ মাধুরী, পাসরিতে নারি,
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র,
তুমি উপাসনা-রস॥'

—তাহার পক্ষে নৈতিক বা সামাজিক শাসন কতটুকু? সে এ গণ্ডীর পার,—বুঝি পাপপুণ্যেরও পার। কেন না, যাহা লইয়া পাপপুণ্য,—যে

জিনিস সকলের আধার,—সেই সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাধার শ্রীহরিই যে তাহার একমাত্র লক্ষ্য। সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিতে, রজকী ছাড়িয়া চণ্ডালীতেও যদি তাহার প্রসক্তি হইত, ত তার ক্ষমা ছিল—কেন না, সে যে সেই ক্ষমাময়-কেই সার ভাবিয়া জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছে? তাহাকে টলাইবে কে?

একটা কথাও আছে,—শূকর-মাংস খাইয়াও যদি কাহারও হরি চরণার-বিন্দে মতি থাকে, তবে সে মাংসভোক্তাও ধন্য; আর হবিষ্যান্ন আহার করিয়াও যদি কাহারও শ্রীভগবান্ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিতে হয়, তবে সে হবিষ্যান্ন আহারকারীও নগণ্য।' সুতরাং ভক্ত-চরিতই স্বতন্ত্র; ভক্তের ধাত না ধরিয়া তাহার সু কু বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

আসল কথা হইতেছে,—ভগবানের কৃপা, আর সেই কৃপা চণ্ডিদাস কত দূর পাইয়াছিলেন,—তাহাই আমাদের আলোচ্য।

কৃপা যে কতদূর পাইয়াছিলেন,—সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ, সমগ্র বঙ্গসাহিত্য, সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই তাহার সাক্ষী। এখনো বাশুলী দেবীর মন্দিরে, দেবীর নিত্য পূজার সহিত, চণ্ডীদাসের সেই কীটদষ্ট পুঁথি—সেই অদ্ভুত পদাবলীর পূজা হইয়া থাকে। আধুনিক কালের মর্ম্মরনির্ম্মিত বহু কারুকার্য্যখচিত স্মৃতিচিহ্ন অপেক্ষা,—এ ভাবের প্রতিভাপূজা আমরা সমধিক গৌরবজনক বোধ করি।

কবির জীবনসঙ্গিনী রামমণির কবিতাগুলিও উপেক্ষার জিনিস নয়। কবির সাহচর্য্যেই তাহার এ অমূল্য বস্তু লাভ। কবির উচ্চ মনোবৃত্তির প্রভাব যে তাঁহার মনোরমা নায়িকায়ও স্পর্শিবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি? ফলতঃ নিরক্ষরা রজককন্যাও কি সুন্দর পদ রচনা করিয়া গিয়াছে, বঙ্গভাষার আজি এ উন্নতির দিনে, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

(১)

আমি অতি হীন, পিরীতি অধীন, পিরীতি আমার গুরু।
এতিন আখর, হৃদয়ে যাহার, সে জনা কল্পতরু॥
পিরীতি ভজিল, পিরীতি সাধিল, পিরীতি একান্ত মনে।
চণ্ডীদাস সাথে, ধোবিনী সহিতে, মিশ্রিত একই প্রাণে॥

(২)

কোথা যাও ওহে, প্রাণবঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হ'তে, এ দেহ সঁপিনু, মনে আন্ নাহি মানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি॥

* * *

তুমি দিবাভাগে, লীলা-অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটিসম কাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখমণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এদুই নয়নে, নিমেষ দিয়েছে কেবা॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, তব দরশন, নিবারণ সেই করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা জগৎ দেখি আঁধার॥

পাঠক দেখিবেন, একটি স্বচ্ছ, সরল, আড়ম্বরহীন বর্ণনায় কেমন সুন্দর-ভাবে উপরের উদ্ধৃত পদ দুইটি গ্রথিত হইয়াছে। স্ত্রী-কবি কেন, আজিকার দিনে অনেক পুরুষ-কবিরও ইহা অনুকরণীয়।

যে সহজ সরল মর্ম্মস্পর্শিনী কথায় কবি-চণ্ডীদাস আপামর সাধারণকে মোহিত করেন, পাঠক দেখিবেন, উদ্ধৃত ঐ দুটি কবিতায়, রামমণিও তাহা কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মুগ্ধা, বিহ্বলা নায়িকা—চণ্ডীদাসকেই তার প্রেমের ঈশ্বর ভাবিয়া পূজা করিয়াছে,—তাহার স্বতন্ত্র ঈশ্বর আর ছিল না। কেননা, সে অনিমেষ নয়নে তার প্রাণপতিকে দেখিত,—চণ্ডীদাস ছাড়া তার দর্শনীয় বিষয় যেন আর কিছু ছিল না। তাই সে নায়কের মুখ-পঙ্কজ মনশ্চক্ষে দেখিতে দেখিতে ভাববিভোর হইয়া বলিতেছে,—

—'হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়েছে কেবা।'

স্বল্পাক্ষরে, স্বল্প বর্ণনায় কি সুন্দর ভাব-অভিব্যক্তি! প্রাণবল্লভের অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, চোখের পলক ফেলিতেও ইচ্ছা হয় না বটে তাই প্রেমবিহ্বলা রমণীর এ আক্ষেপোক্তি,—'চোখের পলক' পড়ে কেঃ বলিয়া দুঃখ।

সমজদার পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, নিরক্ষরা পল্লী রমণী, কার ভাগ্যে এরূপ ভাগ্যবতী? এরূপ সরস, সরল, মনোজ্ঞ রচনা—কার শক্তিতে সে লাভ করিয়াছে?

মূল, ঈশ্বরের কৃপা, সন্দেহ নাই;—পরন্তু চণ্ডীদাসের উচ্চমনোবৃত্তির প্রভাব,—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বরিক কবিত্বশক্তি যে তাঁর আরাধ্যা প্রেমিকার উপরও পড়িয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। গুপ্তভাবে অনেক দিন ধরিয়া উভয়ের মধ্যে প্রেমের এইরূপ জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল, একদিন কি ক্ষণে তাহা প্রকাশ পাইল। কবির ভাষাতেই তাহার প্রকাশ,—

'পিরীতি করিল, জগতে ভাসিল,
ধোপানী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল, কলঙ্ক ভাসিল,
কাণাকাণি লোক-জনে॥'

চণ্ডীদাস দেবী-মন্দির হইতে বিতাড়িত হইলেন। তখন সেই রজকীর কুটীরেই তাঁর বাস, আহারাদি সকলই চলিতে লাগিল। চণ্ডিদাস একরূপ জাতিচ্যুত হইয়া রহিলেন। তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, কেননা, তদবস্থায় তিনি অধিক মনঃসংযোগের সহিত তাঁর ইষ্টচিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভজন সাধন গীতি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। কিন্তু চণ্ডীদাসের আত্মীয় স্বজনের মন তাহাতে প্রসন্ন হইল না। তাঁহারা চণ্ডীকে অনেক বুঝাইয়া,অনুনয় বিনয় করিয়া আপন বাটীতে আনাইলেন এবং তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া পল্লীর ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যথা সময়ে ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মকর্ত্তার বাটীতে আসিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, চণ্ডীদাস নিজেই অন্নের থালা লইয়া পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়

প্রমাভিমানিনী রামমণি—রক্তাম্বরা এলায়িতকুন্তলা নায়িকা—তথায় আসিয়া ৎসনাচ্ছলে নায়ককে বলিল,—"কেমন রে চ'ণ্ডে! তুই নাকি জা'তে ঠে্ছিস? আমি বড়, না—তোর জাত বড়?"

আর 'জাতি কুল সরম'!—নায়িকাকে দেখিবামাত্র চণ্ডীদাসের দেহ অবশ হইয়া আসিল, হাতের থালা হাত হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল, তাঁহার কটির বসন শিথিল হইয়া পড়িল,—তদবস্থায় নায়িকাকে প্রেমালিঙ্গন করিবার উদ্দাম বাসনা তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইল,—তিনি ঈষৎ কাঁপিতে লাগিলেন।

অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত ব্রাহ্মণগণ চকিত, স্তম্ভিত,—তাঁহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

নায়কের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, আর মুহূর্ত্তমাত্র কালব্যাজ না করিয়া, রামমণি একটু ত্বরিতপদে তথায় আসিলেন, দুই হস্তে নায়কের হস্তস্থিত অন্নের থালা ধরিলেন, আর চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে অন্য দুইহস্তে নায়কের কটির শিথিল বসন আঁটিয়া পরাইলেন।

"একি! চতুর্ভুজা? মা তুমি? তুমি এই মূর্ত্তিতে?"—চমকিত, ভীত, সন্ত্রস্ত, ভক্ত চণ্ডীদাস অমনি নতজানু হইয়া করজোড়ে স্তব আরম্ভ করিয়া-দিলেন,—'জয় মা চণ্ডিকে!'

সেই অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত শত শত ব্রাহ্মণও অমনি সেই কণ্ঠে স্বর মিলা-ইলেন,—'জয় মা চণ্ডিকে!'

তন্মুহূর্ত্তেই কিন্তু সেই বরাভয় হস্ত অপসারিত, রামমণি সাধারণ রমণীর ন্যায় স্বাভাবিক বেশে তথায় সেই অন্নের থালা হস্তে দণ্ডায়মানা। তখনো কিন্তু সেই রক্তাম্বরা, এলায়িত কুন্তলা;—ভয়-ভক্তিপূর্ণা তেজস্বিনী মূর্ত্তি!

চণ্ডীদাসের ভাবের নেশা কাটিয়া গেল, কিন্তু তখনও যেন তিনি দেখিতে লাগিলেন,—অন্নপূর্ণারূপিণী রামমণি অন্নের থালা হস্তে তথায় বিরাজ করি-তেছেন!

'একি প্রহেলিকা? মায়া? না দৃষ্টিভ্রম?'—মনে মনে সকলেই এ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজে নিজেই উত্তর দিলেন,—"না, তাই বা কিরূপে? শত শত চক্ষু কি এককালে প্রতারিত হইল? উঁহু, ইহাতে

কিছু আছে—নিশ্চয়ই চণ্ডীদাস মহাপুরুষ, তাই স্বয়ং মা-কালী রামম
রূপ ধরিয়া ভক্তের মান বাঁচাইতে আসিয়াছেন। মা-অন্নপূর্ণারূপিণী! কা
অবোধ সন্তানগণের অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

সুন্দরী রামীর হাতে তখনও সেই অন্নের থালা, সে তখন কিছু ঘামিয়া
তাহার এলায়িত কুন্তলরাশি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ঈ
ক্রোধোদ্দীপ্ত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল কিছু লজ্জাবনত হইয়াছে, কিন্তু তাহার
বিশাল চক্ষুর স্নিগ্ধদৃষ্টি প্রশান্ত, স্থির, অচঞ্চল। তাহা যেন সকলকে অ
দান করিতেছে। 'নধযৌ ন তস্তৌ' ভাবে সুন্দরী মুহূর্ত্তকাল তথায় দাঁড়া
রহিলেন।

'জয় মা জগদম্বে!'—শত শত কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইল, 'জয় জগদ
প্রসীদ জননি!'—চণ্ডিদাস—ভাগ্যবান্ কবি দেখিলেন, গ্রাম ভাঙ্গি
অগণিত লোক তাঁহার কুটীর-প্রাঙ্গণে আসিয়াছে, সকলেরই মুখে মা মা র
সকলেই সুন্দরী-পূজায় তৎপর।

কবির সেই নিভৃত পর্ণকুটীর—সেই ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপ—আজ সজীব চণ্
আবির্ভাবে উৎফুল্ল। রাশি রাশি রক্ত-জবা ও বিল্বদল রামীর পাদতলে পড়ি
লাগিল, মধ্যে মধ্যে গগনভেদী রব উত্থিত হইতে লাগিল,—'জয় মা জগদ

রামীর হস্তস্থিত সেই অন্ন, মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণগণ লইয়া যাই
লাগিলেন। অন্যান্য জাতির ত কথাই নাই। দেশ দেশান্তরে এ সংব
রাষ্ট্র হইল।

'আর এখানে থাকা নিরাপদ নহে' ভাবিয়া, চণ্ডীদাসও নায়িকাকে স
লইয়া অবিলম্বে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। দেবীর প্রত্যাদেশ বশেই হউ
আর এই জন্যই হউক, শেষদশায় কবি তাঁহার আরাধ্যা নায়িকাকে লই
সেই নিত্যধামে বাস করিয়াছিলেন। উভয়ে উভয়ের নিকট বৈষ্ণবম
দীক্ষিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া মানবজন্ম সফল করি
ছিলেন। তাহার ফলে, তাঁহার উত্তরজীবনেও রাধাকৃষ্ণ-লীলা-মাহাত্ম্য-বিষ
শত শত অমূল্য পদ বিরচিত হইয়াছিল।

চণ্ডীদাসের সেই বিশ্ববিশ্রুত পদাবলীর দুই চারিটি এখানে উদ্
করিলাম।

(১) সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম-নাম!
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মন প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব—কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥

এক পক্ষে রাধাকৃষ্ণের এ প্রেমের ছবি—নায়ক নায়িকার হৃদয়-ছবিতেও অঙ্কিত হইয়াছে,—ভাবিতে পারা যায়। তাই বলিয়াছি, রূপের প্রভাবও বড় সহজ জিনিস নয়,—রূপ-সম্ভোগের সহিত সেই অনন্ত রূপময় রাসরসেশ্বর রসিক-শেখরের ধ্যান করিতেও পারা যায়। সকলের পক্ষে ইহা সম্ভবপর না হইলেও, যাহারা স্বভাবসরল কবি, প্রেমিক, ভাবুক, সহৃদয় ও অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন, তাহাদের পক্ষে ইহা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। ইন্দ্রিয়ের যে লালসা ও ভোগের যে উদ্দাম বাসনা, তাহাও ত সেই পরমপুরুষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত? সুতরাং ইহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার কিছুই নাই। 'নপুংসকের ধর্ম্ম বা ঈশ্বরলাভ হয় না,'—এও একটা কথা আছে। বিশেষ রূপের পূর্ণ প্রকাশ যেখানে, সেখানে জগদম্বার বিশেষ আবির্ভাব আছে বুঝিতে হইবে। চণ্ডীতেও ইহার উল্লেখ আছে। তাই সাধকের ষোড়শী সুন্দরী পূজার ব্যবস্থা। সাধক মাতৃভাবে সুন্দরীকে দেখিয়া থাকেন। নায়িকাসিদ্ধ সাধকগণ এই পথের পথিক। তবে পথ বড় কঠিন. পদস্খলন

পদে পদে। সাধক চণ্ডীদাস, প্রথম অবস্থায় যা হউন, উত্তরজীবনে যে রজকীকে লইয়া নায়িকাসিদ্ধ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধনায় সিদ্ধ না হইলে জগদম্বাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হইতেন না, আর সুন্দরী রামীর পরিণামও অত উজ্জ্বল হইত না। বলা বাহুল্য, মুহূর্ত্তের জন্য রামমণির চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে আবির্ভাব, আমি বিশ্বাস করি। ভক্তবৎসলা ভবানীর এটি একটি কৌশল। যে তাঁহাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, তাহার মান মা এইরূপেই রক্ষা করেন। সুতরাং চণ্ডীদাস ও রামী সংক্রান্ত এই বিবরণ অমূলক কিংবদন্তী বলিয়া আমরা মনে করি না,—ভক্তি-রাজ্যের ইহা একটি ধ্রুব সত্য ঘটনা। তাই আমরা কবির চরিতালোচনায় বিশেষ ভাবে ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিতে কুণ্ঠিত হইলাম না যে, প্রথম জীবনে নায়কনায়িকার প্রেম 'কামগন্ধ বর্জ্জিত' ছিল না, বা 'নিকষিত হেম'ও হয় নাই। রূপ ও গুণের স্বাভাবিক আকর্ষণ উভয়কেই আকর্ষিত করিয়াছিল এবং রক্তমাংসের শরীরে স্বভাবতঃ যতটুকু ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে পারে, খুব সম্ভবতঃ, তাহারও কিছু-না-কিছু হইয়াছিল; —কিন্তু মা সহায় ছিলেন বলিয়া ভক্তের পতন হয় নাই। পরন্তু ইহা অবলম্বনেই ভক্তের উত্থান। ভক্ত কবি—সৌভাগ্যবান্ সাধক রজকী-প্রেমেই মহামায়ার প্রতিচ্ছবি হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন,—তাই মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—

'তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা-যাজন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদ-মাতা গায়ত্রি॥'

ধ্যানের এ ছবি,—সাধনার এ চারু-চিত্র ভক্তই উপলব্ধি করিতে পারিবেন,—উপলব্ধি করিয়াও থাকেন।

কবির কাব্য বুঝিতে হইলে কবিকেও বুঝা উচিত, কি গুণে—কোন্ শক্তিতে তিনি সে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছেন। তাই একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমরা চণ্ডীদাসের কবিত্ব-তত্ত্বের মূল প্রস্রবণের সন্ধান লইলাম, দেখিলাম, জগন্মাতার প্রসন্নতায়, কিরূপে অঘটন ঘটনার সংঘটন

হয়। নহিলে, সেই একরূপ নিরক্ষরপ্রায় বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য পূজারি ব্রাহ্মণ-সন্তান কিরূপে ঐশীশক্তিতুল্য দুর্লভ কবিত্বশক্তি লাভ করিলেন? এবং কেবলমাত্র সেই মহামায়ারই প্রভাবে, ততোধিক জ্ঞানহীনা সামান্যা রজককন্যাও অমন সুন্দর কবিতা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর সর্ব্বজন সমক্ষে রামমণির সেই মাতৃবিভূতি প্রকাশ—সেই চতুর্ভুজা মূর্ত্তিধারণ—তাহাও মহাশক্তির মহীয়সী কৃপার ফল, তাহার আর কথা আছে? এ সকল ভাবিবার বিষয় নহে কি? চণ্ডীদাসের কবিতার 'আহা-মরি'- প্রশংসা ত অনেক হইয়াছে, অনেক হইতেছে,—কিন্তু এই কবিতার মূল আকরে যে মহাশক্তির প্রচ্ছন্ন ক্রীড়া বিদ্যমান,—রুচি ও অবিশ্বাসের খাতিরে, জানিয়া শুনিয়া তাহা উপেক্ষা করিব কিরূপে? তাই একটু বিশেষ ভাবে আমরা এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিলাম।

বিদ্যাপতি রাজ-সভাসদ, সুপণ্ডিত, সভ্য, বিদ্বদ্‌বংশসম্ভূত—স্বয়ং বিদ্বান্; দুর্লভ কবিত্বধনে ধনী হইবার তাঁহার অনেক সুবিধা ও সুযোগ ছিল; কিন্তু চণ্ডীদাস যে সর্ব্ববিধ সাংসারিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যেও সে অপার্থিব দৈব-শক্তি লাভ করিয়া মহাযশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাহাই ভাবিবার বিষয়। দেবীকৃপা উভয়েরই প্রতি হইয়াছিল সন্দেহ নাই; পরন্তু চণ্ডীদাসের ভক্তির গাঢ়তা, যেন বিদ্যাপতি হইতেও কিছু অধিক। অমলা, নির্ম্মলা, অহেতুকী যে ভক্তি, তাহাই চণ্ডীদাস লাভ করিয়াছিলেন। দারিদ্র্য-দুঃখেই তাঁহার এই ভগবদ্ভক্তির বিকাশ; সেই দুঃখের সহিত আবার রমণী-প্রেম জুটিয়াছিল, সুতরাং এ অংশে তাঁহার প্রেম—'নিকষিত হেম' সন্দেহ নাই। তবে সত্যের অনুরোধে এ কথা অবশ্যই বলিব যে, গভীর ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবার ক্ষমতায় ও অসাধারণ লিপি-কুশলতায়,—বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস এক সোপান নিম্নে অবস্থিত। বলিয়াছি ত, ভাষা মার্জ্জিত ও ভাব সুবিন্যস্ত করিবার বিদ্যাপতির অনেক সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছিল, দরিদ্র চণ্ডীদাস সে সৌভাগ্যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। দেবীকৃপাই তাঁহার একমাত্র সহায়,—সমাজ বা সংসারের বিন্দুমাত্র সহায়তা তিনি পান নাই। বিদ্যাপতির, একাধারে এই দুই শুভযোগ সংঘটিত হইয়াছিল—যোগ ও ভোগ তাঁহার দুই-ই সমানে ছিল। তাই তিনি চিন্তার সংযম করিয়া স্বল্পাক্ষরে মনের ভাব প্রকাশ

করিতে পারিতেন,—চণ্ডীদাসের বর্ণনা কিছু বাড়িয়া যাইত। তাহার কারণ, বিদ্যাপতিতে প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দুই-ই ছিল,—চণ্ডীদাসে শুধু প্রতিভা ছিল, পাণ্ডিত্য ছিল না।

চণ্ডীদাসের কবিতা অবশ্য 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে'—এ কথা অতি সত্য; পরন্তু বিদ্যাপতির কবিতা সেই 'মরমের ভিতর পশিয়াও' একটি মনোময়ী মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে জাগাইয়া রাখে—অন্তরে বাহিরে সেই স্মৃতি বিরাজ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইজনের দুইটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

(১) চণ্ডীদাস—

'নিতই নূতন, পিরীতি দু'জন,
তিলে তিলে বাড়ি যায়;
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি থায়॥
সখি হে অদ্‌ভুত দুঁহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইথে কি কষিল হেম॥
উপমারগণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
তাহারে করিল অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুঁহুঁ সম নহে,
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে, হেন কোন জনে,
শুনি না দরবে চিত॥'

(২) বিদ্যাপতি—

'সখি রে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি, অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুনমু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছল কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুগমন
অনুভব কহে না পেখে।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে।'

রচনা-পারিপাট্য ও রস-উদ্দীপনা দুই কবিতাতেই আছে; কিন্তু কত প্রভেদ। একটি কেবল বর্ত্তমানের ছবি আঁকিয়াই পরিতৃপ্ত; অন্যটি বর্ত্তমান অতীত ভবিষ্যৎ—যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। একটি শুভ্র, সুগন্ধ, ফুটন্ত মল্লিকা; আর একটি যেন সুপরিস্ফুট শ্বেত-শতদল :—পাপ্‌ড়ি-পত্র-রূপ-রস-গন্ধ—কত কি। আকারেও বড়, প্রকারেও বৃহৎ। একটি যেন স্রোতস্বতী ভাগীরথী; অন্যটি যেন অকূল সমুদ্র। একটি তপ পাহাড়; আর একটি যেন বিরাট্ হিমালয়—কি দেখি, আর কত ভাবি!

অবশ্য, চণ্ডিদাসের নিম্নলিখিত কয়েকটি কবিতা চিরস্মরণীয় এবং ভাব-রাজ্যে তাহা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কবিতাগুলির চুম্বক মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

(১) * * * বঁধু, কি আর বলিব আমি,
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হ'ও তুমি॥* * *

(২) পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর, ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু, তিতায় তিতিল দে॥
সই এ কথা কহন নহে।

হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া, কখন কি জানি কহে।
পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি, তাহার নাহিক শেষ ॥* * *

(৩) কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি, ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে, দহন দ্বিগুণ হয় ॥* * *

(৪) পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিতে উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুখের বায় ॥"

(৫) শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে? সব রস সার শৃঙ্গার এ।
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে। মরম বুঝিয়া ধরম যজে ॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা। সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥* * *

(৬) রসিক রসিক, সবাই কহে, কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে, কোটিতে গোটিক হয় ।* * *

(৭) রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি, গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে, মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে, বসি থাকি তার তীরে ॥* * *

(৮) বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান ॥"

(৯) বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম, সকলি জান হে তুমি ॥"

(১০) সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু, শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুখ হবে ব'লে, কোন্ অভাগিনী জানে ॥* * *

(১১) পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি, হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে, পিরীতি গঢ়ল কে ॥* * *

(১২) এমন পিরীতি কভু, দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি ॥

(১৩) কাল জল ঢালিতে সই, কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।

কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি ॥* * *

(১৪) সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া, আন্ বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া ।।

(১৫) সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিয়ান করিতে, সকলি গরল ভেল ॥

(১৬) কি বুকে দারুণ ব্যথা!
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি, পাপ পিরীতির কথা ॥"***

পাঠক দেখিবেন, উদ্ধৃতাংশের সকল কবিতাতেই কবি-হৃদয়ের গভীর প্রেমোচ্ছ্বাস কেমন সরল ও স্বাভাবিক ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে! ভাষার কোনরূপ আড়ম্বর নাই, শব্দের কোনরূপ কঠোরতা নাই, কোথাও কোনরূপ কষ্ট-কল্পনা নাই,—কেমন আন্তরিক অবিচলিতা নিষ্ঠার সহিত সহজ সরল গ্রাম্য-উপমার সহিত পদগুলি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এরূপ প্রসাদগুণসম্পন্ন গীতি-কবিতা, এরূপ আড়ম্বরহীন শব্দ-যোজনা—প্রাচীন পদাবলীতে একান্ত দুর্লভ। একান্ত দুর্লভ কি,—এরূপ সহজ ভাবের কবিতাতে চণ্ডিদাস অদ্বিতীয়, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। বিশেষতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবেরও বহু পূর্ব্বে যে, একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবি এরূপ সহজ অথচ মধুরভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়িণী কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইতে হয়। মনে হয়, ইহা ভগবানের দান,—চণ্ডিদাস উপলক্ষ মাত্র।

এ হিসাবে যতদূর প্রশংসা—ভাষায় প্রকাশ হইতে পারে, আমরা করিতে প্রস্তত; তথাপি সত্যের অনুরোধে আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে, সবটা জড়াইয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, ওজনে—চণ্ডিদাসের কবিতা বিদ্যাপতির কবিতা হইতে নামিয়া পড়ে।

"বঙ্গদেশের গীতি-সাহিত্যে চণ্ডিদাসের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব" হইতে পারে; কিন্তু মৈথিল-কবি বিদ্যাপতিকে ইহার সহিত ধরিলে 'অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব' হয় না। কেন হয় না, উপরে সংক্ষেপে তাহা আমরা বিরত করিয়াছি।

যাই হোক, ভাষা-জননীর প্রিয়পুত্র স্বরূপ উক্ত দুই মহাত্মা আপনাদের সাধনা-লব্ধ যে অমূল্য ভাব-সম্পদ বঙ্গবাসীকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী চিরদিন তাঁহাদের চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে এবং আপনাদের জাতীয় সাহিত্যে সেই অমৃতময়ী স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়া বিদেশী মনস্বিগণেরও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিবে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস সম-সাময়িক। উভয়েই বাণীর প্রিয়পুত্র। ফুল ফুটিলে যেমন তাহার সৌরভ আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়, কবিদ্বয়ের মানস-পারিজাতের সৌঁরভও তেমনি আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে কেহ কাহাকে দেখেন নাই,—উভয়ে উভয়ের নাম মাত্র শ্রুত ছিলেন; —একদিন কি যোগে, উভয়েই উভয়ের দর্শনার্থী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। একজন মিথিলা হইতে বীরভূম যাত্রা করিয়াছেন, আর একজন বীরভূম হইতে মিথিলা (আধুনিক দ্বারভাঙ্গা) গমন করিতেছেন,—পথিমধ্যে উভয়ের মিলন। এ অদ্ভুত মিলন ঐশ্বরিক-যোগ বলিয়াই মনে হয়। মনে হয়, উভয়েই এক মনে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত যে ইষ্ট-দেবতার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই দেবীই প্রসন্ন হইয়া উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য প্রীতি-বন্ধনের জন্য, এ মধুর মিলন সংঘটন করিয়া দিলেন। দুর্গম তীর্থপথে, ভক্ত সহযাত্রী জুটিলে যেমন অব্যক্ত আনন্দ হয়, কবিদ্বয়ের এ পুণ্য-মিলনেও সেইরূপ অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। পরস্পরের দর্শনে ও আলাপ-আলিঙ্গনে যে প্রগাঢ় সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া, আজিকার এই 'উন্নতির যুঁগের' 'সাহিত্যিক বন্ধুত্বের' স্মৃতিটা একবার মনে মনে আন্দোলন করুন,—শিহরিয়া উঠিতে হইবে।

'পদকল্পতরুর' গ্রন্থকর্ত্তা কবিদ্বয়ের সেই মধুর মিলনের কথা বড় মধুময়ী ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। আমরাও এখানে সেই অমৃতময়ী কবিতাটির উল্লেখ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করি ;—

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব, চণ্ডিদাস গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
দুঁহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল। সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল, বিদ্যাপতি চলি গেল।
চণ্ডীদাস তব রহই ন পারই, চললহি দরশন লাগি।

পন্থাই দুঁহুঁ জন দুঁহুঁ গুণ গাওত দুঁহুঁ হিয়ে দুঁহুঁ রহু জাগি ॥
পন্থাই দুঁহুঁ দোঁহা দরশন পাওল, লখইন পারই কোই।
দুঁহুঁ দোঁহ নাম শ্রবণে তাই জানল রূপনারায়ণ গোই ॥
তথা—ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি, রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন, ভাসল প্রেম-তরঙ্গে ॥"

প্রথিতনামা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "Literature of Bengal" গ্রন্থে, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়াছেন,—"Sweet Bidyapati! sweet Chandidas! The earliest stars in the firmament of Bengali literature. Long, long will your strains be remembered and sung in Bengal."

শুধু বঙ্গদেশ কেন,—একদিন পৃথিবী ব্যাপিয়া বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মধুর পদাবলী গীত হইবে।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি।

যে দুই মহাত্মার অপূর্ব্ব পদাবলীর কথা আমরা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম, প্রধানতঃ এই দুই জনকেই আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ লেখনী চালনা করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নামগুণ কীর্ত্তন করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং শ্রোতা বা পাঠক কাহারও ভাল লাগিবে—কি না লাগিবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। যেরূপে হোক, মিষ্ট কোমল করুণ সুরে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া, তাঁহারা ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিতেন। অধিকাংশ কবিই যুগলমন্ত্রের উপাসনায়—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। হয় ত তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে কেহ শাক্ত বা শক্তির উপাসক ছিলেন; কেহ বা রামমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; কিন্তু উত্তরজীবনে প্রায় সকলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম-গান কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। এ শ্রেণীর কবিদিগের প্রায় সকলেই, অল্লাধিক পরিমাণে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নিকট ঋণী। ঐ দুই মহাত্মার পুণ্য-প্রভাব,—ভাবের অমৃতলহরী, তাঁহাদের প্রায় সকলের কবিতাতেই পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, যদুনন্দনদাস, প্রেমদাস, প্রেমানন্দদাস, উদ্ধব দাস, রায় শেখর, পরমানন্দ সেন প্রভৃতি বহু পদকর্ত্তা—বিবিধ প্রকারে—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অমৃতময়ী কথার

প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে আমরা তাঁহাদের দুই একটি কবিতার আলোচনা করিয়া, বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ দেখাইব।

গানই তখন সাধকের সম্বল ছিল। ভক্ত, ভাবুক ও কবি—প্রধানতঃ এই সঙ্গীত দ্বারাই আত্মার পুষ্টিসাধন করিতেন। কালে সেই গীতাবলীই সাহিত্যের আকার ধারণ করিয়াছে।

সঙ্গীতের অসামান্য প্রভাব সকল সময়েই পরিদৃষ্ট হয়। মনে যে দুঃখ ও শোক, হর্ষ বা বিষাদ উদিত হয়, অল্পের মধ্যে, গানে যেমন তাহার প্রতিবিম্ব বিম্বিত হইয়া উঠে, আর কিছুতেই তেমন প্রকাশ পায় না। এইজন্য প্রায় সকল দেশের সকল ভাষার আদিম অবস্থায় সঙ্গীতের বহুল প্রচলন ছিল। সে গীতি যত অস্পষ্ট, ম্লান বা নিস্তেজ হউক না কেন, তাহাতে আন্তরিকতার অভাব থাকিত না। তারপর সেই গান হইতে কবিতার উদ্ভব হয়। পরে সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে, ভাষার ক্রম-বিকাশ ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গদ্য-সাহিত্য তখন মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান হয়।

এক হিসাবে, বৈষ্ণব-সাহিত্যই বাঙ্গালার আদিম সাহিত্য ছিল। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তারাই বঙ্গ-সাহিত্যের স্রষ্টা, পুষ্টিকর্ত্তা ও আচার্য্য ছিলেন। এই বৈষ্ণব-সাহিত্য—সংখ্যায় ও শাখায় এত অধিক যে, তাহার সম্যক্ আলোচনা দূরের কথা,—এক জীবনে তাহা পড়িয়া উঠাই অসম্ভব। মুখে যিনি যত লম্বা লম্বা কথা কউন, সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, অন্ততঃ দশ পনর জন অধ্যবসায়শীল, পরিশ্রমী ও শক্তিশালী সাহিত্য-সেবীকে, অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। একাদ্বারা তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। সেই জন্য বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই;—হইবে, সে আশাও নাই।

শুনিয়াছি, সভ্যতা ও শিক্ষার আকর-ভূমি ইউরোপে এই ভাবে জাতীয়-ভাষার ইতিহাস সঙ্কলিত হয়। তথায় দশ পনেরো জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি মিলিয়া এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ প্রাচীন কবিতা ও গান সংগ্রহ করিতে রহিলেন; কেহ প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ

করিলেন ; কেহ বিভিন্ন পাঠ মিলাইতে লাগিলেন ; কেহ কেবলমাত্র এক একটি করিয়া যথাক্রমে ও যথানিয়মে তাহা সাজাইলেন ; কেহ সেই সংগৃহীত ও সজ্জিত অংশগুলি ঠিক হইল কি না দেখিয়া দিলেন ; শেষ একজন বিশেষ দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত তাহা সম্পাদন করিলেন,—তাহার ভূমিকা, সমালোচনা ও মন্তব্য লিখিলেন। ইহা ব্যতীত অধিকারীভেদে টীকা, টিপ্পনী, ব্যাখ্যা,—ভাব ও ভাষার সঙ্গতিরক্ষা করিয়া প্রকৃষ্ট প্রণালীতে তাহা লিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্যও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন। তবেই দেখুন, একটা কাজ সুসম্পন্ন করিবার জন্য দশে মিলিয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপী কি কঠিন, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করেন ! যেন একটি ব্রতবিশেষ—ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তবে সকলে নিরস্ত হন। তারপর, অজস্র অর্থব্যয়—সে ত আছেই।

আর এখন একবার এদিকে—আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে দৃষ্টিপাত করুন্। সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টির জন্য পাশ্চাত্যের ঐ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদিগকে অন্ধকার দেখিতে হয়। এখানে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত যিনি সঙ্কলন করিবেন, তাঁহাকে একাকীই এই সমুদয় ভারই বহন করিতে হইবে। ইগুক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার, দেশ বিদেশ ভ্রমণ, লিখন পঠন সমালোচন হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রাযন্ত্র-কবলপেষিত প্রুফ্ দর্শন কাজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সমান অধ্যবসায়ের সহিত করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হউক, জীবন অকর্ম্মণ্য হউক বা তাঁহার পুত্র-পরিবার অন্যের গলগ্রহ হউক,—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলে চলিবে না,—আরব্ধ কার্য্য তাঁহাকে সম্পন্ন করিতেই হইবে। তার পর সেই গ্রন্থ ছাপাইবার জন্য তাঁহাকে ধনীর উপাসনা করিতে হয় ;— হয় ত কত স্থানে বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয় ; দুষ্টের অহিতাচার ও শত্রুতাচরণ নীরবে সহিতে হয় ;—শেষ 'সবজান্তা' 'হাম্‌বড়া' পত্র-সম্পাদকের অম্ল-মধুর গালাগালি বিনা বাক্যব্যয়ে পরিপাক করিতে হয়। ব্যবসাদার কাগজওয়ালা,—অধিকারী, লেখক, সম্পাদক—তিনে মিলিয়া, সমালোচনার ছল ধরিয়া, কখন বা কেবলমাত্র ব্যাকরণের অছিলা ধরিয়া, অভদ্র ভাষায় ক্রমাগত তাঁহাকে আক্রমণ করেন ;—আর দেশের তথাকথিত

'বড়লোকগণ' ও সাহিত্যসংক্রান্ত সভা-সমিতি—তাহা আমোদভরে দেখিতে থাকেন। আবার কোন কোন রঙ্গপ্রিয় ধনী বা পদস্থ লোক কোনরূপে সেই সমধর্ম্মা উন্নতমনা কাগজওয়ালাকে হস্তগত করিয়া উৎসাহ দেন, যেন শ্রাদ্ধ আরো গড়াইয়া যায়,—অনেক দিন ধরিয়া সে বিশুদ্ধ আমোদ তিনি বা তাঁহারা—তাঁহার দলস্থ সকলেই—উপভোগ করিতে পারিবেন!

অবশ্য, সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-লেখকেরও যে কোনরূপ দোষ বা ত্রুটি থাকে না, এমন কথা বলি না। দোষ ও ত্রুটি বেশীর ভাগই থাকে, থাকিবারও কথা। কেন না, বলিয়াছি ত, সে বেচারী একক;—ইস্তক পুঁথিসংগ্রহ হইতে প্রুফ দেখার কাজ তাঁহাকে করিতে হয়; তার উপর বেদ হইতে পুরাণ-উপপুরাণ,—তাম্রলিপি-বিচার হইতে নষ্ট-পুঁথির উদ্ধার,—সর্ব্ববিধ সাহিত্য—ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, গণিত, বিজ্ঞান, রসায়ন, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা-গ্রন্থ, জীবনবৃত্ত, কবিতা, গীতি, নাটক, উপকথা, উপন্যাস প্রভৃতি যত কিছু প্রাচীন বঙ্গে ছিল বা থাকিতে পারে, তাহার একটি ছক্ আঁকিয়া যাইতে হয়;—ইহা ব্যতীত সমাজ, ধর্ম্ম, লোকচরিত্র, ও রাজ-শাসন প্রভৃতির কথাও অনুশীলন করিতে হয়;—একটা লোকের সাধ্য কি যে, এক জীবনে তাহা নিজেই আয়ত্ত করিতে পারে,—লেখা বা সমালোচনা করাত দূরের কথা!—কাজেই অনধিকারী হইয়া কথা কহিবার যে দোষ, তাহা ভূরি ভূরি রহিয়া যায়;—কোন কোন গ্রন্থে তাহা রহিয়া গিয়াছেও। যে, বেদ কখন চোখে দেখে নাই, সে বেদের কথা লিখিল,—বেদের কালনির্ণয় করিল; যে মনু-পরাশর-যাজ্ঞবল্কের একছত্রও পাঠ করে নাই,—সে ঐ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের কথার সমালোচন করিল; যে অশোকের তাম্রলিপি বা বিক্রমাদিত্যের বিপুল বিভব—কল্পনায়ও ধ্যান করে নাই, সে কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে উহার বিকৃত-বর্ণনা পত্রস্থ করিল;—ত্রুটি, দোষ ও অসম্পূর্ণতা ত পদে পদে থাকিবেই, থাকিবারও ত কথা;—পত্র-সম্পাদক ও সমালোচক তুমি,—সেই দোষ সংশোধন করিয়া প্রকৃত সত্য সকলকে দেখাইয়া দাও;—ধীরতার সহিত সংযত ভাষায় সে সত্য বিবৃত কর;—লেখক পাঠক উভয়েরই উপকার হউক;—তবে ত তুমি লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিবে? নহিলে হাতে একখানা কাগজ আছে বলিয়া, খেয়ালমত যদৃচ্ছাক্রমে যা তা লিখিয়া,

লোককে কুৎসিত গালি দিয়া, দ্বিতীয় 'মেছোহাটার' সৃষ্টি করাটা কি ঠিক ?

বলা বাহুল্য, প্রাচীন সাহিত্যের সম্যক আলোচনা আমরা এ গ্রন্থে করিব না, করিবার শক্তিও আমাদের নাই ;—আমাদের লক্ষ্য—'ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্যের' অবস্থা পর্য্যালোচনা করা। তবে যে ভিত্তির উপর ভর করিয়া বর্ত্তমান কালের এই সুদৃশ্য সৌধ দণ্ডায়মান হইয়াছে,—যে ইট কাঠ মাল মসলা—চূণ-সুরকি বালি মাটি প্রভৃতির সংযোগে ইহা নির্ম্মিত হইয়া সভ্য সমাজের গৌরবস্পর্দ্ধী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে,—সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে যতটুকু বলার প্রয়োজন বোধ করিব,—মাত্র তাহাই বিবৃত করিয়া আমাদের আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিব।

বলিয়াছি যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ বৈষ্ণব-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আত্মার উদ্বোধন স্বরূপ যে করুণ-কোমল মঙ্গল গীতিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া ভগবানের নাম গান করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন এবং যাহার ফলে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্র আজ উর্ব্বরা ও শস্যশ্যামলা হইয়া বিদেশীরও স্পৃহনীয় হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এখন দুই এক কথা বলিব।

প্রথমতঃ জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাসের রচিত 'মাথুর' ও 'মুরলী শিক্ষা' বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি সকল ভাবেরই পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই ভাব-ভক্তিময় পদমালা এক একটি মণি বিশেষ। প্রেমিক জ্ঞানদাসের একটি মাত্র পদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

'কেন গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার তটে, সেখানে ভুলিনু বাটে.
তিমিরে গরাসিল মোরে॥
রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর,
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনী বামে, ময়ূর-চন্দ্রিকা ঠামে,
ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥

ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরচনা ভাতি,
তার মাঝে পূর্ণমিক চাঁন্দ।
অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ,
কামিনী জনের মন ফাঁদ ॥
লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়,
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা,
ভুবন মোহন রূপ ভাতি ॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল,
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে ॥
শ্রীজ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়,
সে কি সতি বোলইতে পারে ॥'

জ্ঞানদাসের পর গোবিন্দদাস। এই গোবিন্দদাস যে কত জন আছেন, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু আমরা এখানে একজন মাত্র গোবিন্দদাসের একটি মাত্র গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব-কবির প্রভাব কিরূপ ছিল। ইনি যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়ের সমসাময়িক সাধক বৈষ্ণব-কবি। ইঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ সাধনসঙ্গীতটি এই,—

"ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দরে।
মনুষ্যদুর্লভদেহ, সৎসঙ্গে সেবহ, হরিপদ নিতরে ॥
শীত আতপ, বাত বরিখন, এ দিন যামিনী জাগিরে।
বৃথায় সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব লাগিরে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, শরণ বন্দন, পাদসেবন দাসী রে।
পূজন সখীগণ, আত্মনিবেদন, গোবিন্দাস অভিলাষী রে ॥"

"সাহিত্য-রত্নাবলী" সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন,— "এই সকল পদাবলী পাঠে প্রতীতি হয়, বঙ্গদেশে প্রথমতঃ এক প্রকার হিন্দিভাষা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত ও হিন্দিতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ হিন্দি ভাষাও মাগধীর অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে

অনুমান করেন। কারণ ফাহিয়ান নামক জনৈক চীনদেশীয় পরিব্রাজক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ষোড়শ শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে সংস্কৃত ও মাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল।

"প্রাচীনকালে বঙ্গভাষার রচনাপ্রণালী কোন প্রকার নিয়ম নিবদ্ধ ছিল না। কি পয়ার, কি ত্রিপদী, কিছুতেই মাত্রা, অক্ষর এবং মিত্রাক্ষরের সমতা দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন পদাবলী-লেখকেরা সে সকলের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতেন। ইহার অনেক কাল পরে ব্যাকরণের-নিয়ম ও পদ্য রচনার রীতি প্রচলিত হয়। সকল ভাষার আদিরচনা সম্বন্ধেই এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

তৃতীয়, বলরামদাস। ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একজন পরম ভক্ত। ভগবানের অবতারত্বে ইনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাঁহার সেই গভীর বিশ্বাস কি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে, নিম্নলিখিত মনোহারিণী বর্ণনায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে ;—

'বিহরে আজু রসিকরাজ, গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঞ্জ কেশর সুগ্ন উজার কনক-রুচির-কাঁতিয়া।
কোটি কামরূপ ধাম, ভুবনমোহন লাবণী ঠাম,
হেরত জগত যুবতী উমতি ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥
অসীম পূর্ণিমা-শরদ চন্দ, কিরণ মদন বদন-ছন্দ,
কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম, মঞ্জু বসন-পাঁতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাসি, বমই কতহু অমিয়া রাশি,
সুধই সীধুনিকরে নিঝরে, বচন ঐছন ভাতিয়া॥
মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ, মধুর পিরীতি আরতিপুঞ্জ,
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ, মুগধ দিবস রাতিয়া।
আবেশে অবশ অলস ধন্দ, চলত চলত খলত মন্দ,
পতিত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥
অরুণ নয়ানে করুণ চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই,
নটত উমত লুঠত ভ্রমত, ফুটত মরম ছাতিয়া।

উত্তম মধ্যম অধম জীব, সবহু প্রেম-অমিয়া পিব,
তহি বলরাম বঞ্চিত একলে, সাধু ঠামে অপরাধিয়া ॥'

চতুর্থ,—যদুনন্দনদাস। ইহাঁর প্রণীত কয়েকখান পদ্যানুবাদ গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। সে অনুবাদের কয়েক ছত্র নমুনা দেখুন;—

"ওহে কৃষ্ণ! তোমা না দেখিয়া।
এ রাত্রি দিবস মাঝে, যতক্ষণ বৃন্দ আছে,
কৈছে আমি গোঁয়াব কাটিয়া।
কোটি কল্প তুল্য মনে, হৈল মোর এতক্ষণে,
তোমা বিনু নাবোঁ গোঙাইতে।
হা হা তোমা দশরন, বিনা আমি ক্ষণগণ,
তুমি বল গোঙাই কেমতে॥"

পঞ্চম,—জগদানন্দ। ভাগ্যবান্ জগদানন্দ স্বপ্নযোগে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন,—'দেব-স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, সত্য।' কথিত আছে, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবও, ৬ গয়াধামে যাইবার পথে, স্বপ্নযোগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। ফলতঃ, স্বপ্নে এরূপ দেবদেবী দর্শন বহু পুণ্যফলে হয়। পুণ্যবান্ জগদানন্দ ভক্তগণের প্রণম্য, সন্দেহ নাই। সেই পুণ্যবান্ কবি ভক্তবৎসল ভগবানের যে সকল চারু-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে একখানি ছবি আমরা পাঠকগণকে উপহার দিলাম;—

"সজনি গো! কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ.
ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে॥
দিয়া হাস্য সুধাধার, অঙ্গ ছটা আটা তার,
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মনোমৃগী সেই কালে, পড়িল রূপের জালে,
শুধু দেহ-পিঞ্জর রহিল॥
গর্ব্বকালে মত্ত-হাতী, বাঁধা ছিল দিবা রাতি,
ক্ষিপ্ত হইল কটাক্ষ অঙ্কুশে।

দম্ভের শিকল কাটি, চারিদিগে যায় ছুটি,
পলাইয়ে গেল কোন দেশে॥
লজ্জাশীল হেমহার, গুরু গৌরব সিংহদ্বার,
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীধর বজ্রাঘাতে, পড়ি গেল অকস্মাতে,
সমভূমি করিল আমায়॥
ফালিয় ত্রিভঙ্গবাণে, কুলমান হৈল খানে,
ঘুচিল উঠিল ব্রজবাস।
প্রাণ শেষে আছে বাকি, তাহা বুঝি যায় দেখি,
ভণয়ে জগদানন্দ দাস॥”

ষষ্ঠ—দ্বিতীয় গোবিন্দ দাস। ইনি জাতিতে কর্ম্মকার। কিন্তু ভক্তি-বলে ও ভগবানের কৃপায় আজ ইনি ভক্ত ব্রাহ্মণেরও নমস্য। ‘গোবিন্দদাসের কড়চা’ বৈষ্ণবসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ। এই মহাত্মা, ছায়ার ন্যায় মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, প্রেমাশ্রুজলে নিজে দ্রব হইয়া মহা-প্রভুর লীলা-কাহিনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহারই অমৃতময় ফল—কড়চা। কড়চার বর্ণনা অতি মধুর, মনোজ্ঞ ও ভাবময়,—অতিরঞ্জন-দোষ ইহাতে আদৌ নাই। বৈষ্ণব-সমাজ ও বঙ্গসাহিত্য কড়চাকারের নিকট চিরঋণী।

এক হিসাবে, এই সময় হইতে বঙ্গভাষা-প্রতিমার আকার ও গঠন আরম্ভ হইল। পরবর্ত্তী কবি ও লেখকগণ ক্রমে সেই প্রতিমার অঙ্গরাগ করিতে ও সাজ-সজ্জা নির্ম্মাণ করিয়া পরাইতে ব্রতী হইলেন। ক্রমে সে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এ সকলেরই মূলে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদকর্ত্তা-দের মধুর পদাবলী। বঙ্গের সেই আদি কবি—শ্রীজয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পুণ্যপ্রভাব সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। যেন তিনটি স্রোতস্বতীর পুণ্য-ধারা—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-রূপে একস্থানে সম্মিলিতা। শেষ এই যুক্ত-ত্রিবেণী মুক্ত-ত্রিবেণীতে পরিণত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মবশে, কুলুকুলুতানে সাগরে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা এক মহাযোগ।

এই যোগের মূলে যোগীশ্বর শঙ্কর ‘সচ্চিদানন্দরূপ শিবোহং’ রবে ভারত

মাতাইয়াছিলেন ; তাহারই ফলে হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-গ্রন্থ সকল রক্ষা পাইল ; ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইল ; ব্রাহ্মণগণ আবার বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেদমাতা গায়ত্রীকে পূজা করিতে লাগিলেন।

কালবশে আবার তন্ত্রশাস্ত্রের দুর্গতি ঘটিল। কুক্রিয়াসক্ত ভণ্ডদল, মার নামের দোহাই দিয়া নানারূপ বীভৎস আচারে প্রবৃত্ত হইল। অমনি করুণার অবতার শ্রীভগবানের আসন টলিল। ভক্তবৎসল নররূপ ধারণ করিয়া হরিবোল হরিবোল রবে আচণ্ডালে প্রেম বিলাইতে বিলাইতে এই সোণার বাঙ্গালার একটি পল্লীতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ সেই পুণ্যতীর্থ। সেই পুণ্যতীর্থে পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যদেব স্বগণ অন্তরঙ্গবৃন্দকে লইয়া—ভাব-ভক্তি-প্রেমের বন্যা ছুটাইলেন। সে বন্যা ক্রমে সমগ্র ভারত প্লাবিত করিল। ঠাকুরের বিভূতি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইল। কেবল জগাই মাধাই রূপ শত শত পতিত পাষণ্ড উদ্ধারেই সেই ঐশ্বরিক বিভূতির পর্য্যাবসান হয় নাই,—বাঙ্গালীর ভাষা-জননী এই শুভক্ষণ হইতেই যেন প্রাণ পাইল। ফলতঃ এই সময় হইতেই মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গগণ দ্বারা বঙ্গভাষার বিশেষ বিকাশ হয়। তাঁহারা প্রধানতঃ আপনাদের ইষ্টদেবতার লীলা-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে করিতে এই সকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। এক হিসাবে ইহাই বাঙ্গালা ভাষার আদ্যকাল। বাঙ্গালা সাহিত্যে ভক্তির প্রবাহ তাই আজও এত অধিক। ভক্তিধর্ম্মের সেই সুমধুর ফল—বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য।

যুগ-অবতার অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গভাষার এই প্রতিপত্তি ও প্রসার। কেন এমন হয়, প্রসঙ্গক্রমে স্থানান্তরে ইহা বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এক্ষণে এইটুকু বলিয়া রাখি, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে যেমন ভক্তের প্রাণ-চকোর উল্লসিত ও উৎফুল্ল হইল,—বঙ্গভাষা-জননীও তেমনি শচী-মাতার ন্যায় শ্রীভগবান্‌কে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিতা ও সর্ব্বজন-সমাদৃতা হইয়া রহিলেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য যে আজ সভ্যজাতিরও গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহার মূলে কি ?—নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি,—ভক্ত-ভগবান্-ভাগবত-সম্মিলিত—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভক্তি। এই ভক্তি কখন হরিনামে, কখন নাম-গানে, কখন বা মা-নামে এত মাতিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বঙ্গসাহিত্যের এই

ক্রমবিকাশ-চিত্রে, যথাস্থানে, আমরা এই ঐশ্বরিক ভক্তিতত্ত্বের কিছু কিছু আলোচনা করিব। ফলতঃ, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল হইতে বঙ্গসাহিত্যে যে কত্‌শত ভক্তিগ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ভক্ত গোবিন্দের কড়চা, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, পদকল্পলতা, ঠাকুর নরোত্তমদাসের অতুলনীয় প্রার্থনা ও পদাবলী—সকল গ্রন্থের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়; অতি সংক্ষেপে এই সকল গ্রন্থসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও এখানে বলিব। যুগ-অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি ক্ষণজন্মা মহাত্মাও বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও দার্শনিক রঘুনাথ ও স্মার্ত্তকুল-চূড়ামণি স্বনামধন্য রঘুনন্দন ঐ দুই মহাত্মা। ধর্ম্মের সংস্কার, ভাষার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ত সমাজবন্ধনেরও প্রয়োজন চাই? তাই শ্রীচৈতন্য-যুগের এই অদ্ভুত সম্মিলন—জীবের কোন অভাবই আর রহিল না। এমনই হয়,—ভগবানের কৃপায় এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

এখন যাহা বলিতেছিলাম ঃ 'কড়চার' ভাগ্যবান্ কবি গোবিন্দদাস প্রণীত শ্রীচৈতন্যদেবের লীলামৃত বর্ণনা—প্রকৃতই একটি উপভোগের জিনিস। নির্জ্জনে ভাবের কাণ লইয়া এই মধুর গীতি শুনিতে সাধ যায়। আজি চারিশত বর্ষেরও কিঞ্চিদধিককাল হইল, ভাগ্যবান্ চিত্রকর তাঁহার উপাস্যদেব শ্রীগৌরাঙ্গের সাধন-মূর্ত্তিটি কি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন;—

"কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু ইতি-উতি চায়॥
কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥
উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন।
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ॥

একদিন গুহামধ্যে পঞ্চবটী বনে।
ভিক্ষা হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥
নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন।
মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন॥
ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
অঙ্গ হৈতে বাহির হয়েছে তেজ-রাশি।
ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী॥"

সপ্তম,—প্রেমদাস। ইহাঁর আসল নাম—পুরুষোত্তম মিশ্র। গুরুদত্ত নাম—প্রেমদাস। এই প্রেমিক কবিও স্বপ্নযোগে শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করেন। 'বংশী শিক্ষা', 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' গ্রন্থের পদ্যানুবাদ গ্রন্থ ইহাঁর রচিত। ইহাঁর একটী পদ এই ঃ—

"কত কোটি চন্দ্র জিনি, উজোর বদনখানি, মল্ল ছাঁদে পরে নীলধটী।
করপদ সুরা তুল, জিনি কোকনদ ফুল, বিনোদরূপের পরিপাটী॥" * * *

অষ্টম,—নরহরি। ইহাঁর রচিত 'ভক্তি-রত্নাকর' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তদ্ব্যতীত 'গৌরচরিত-চিন্তামণি' নরোত্তম-বিলাস, শ্রীনিবাস-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থও ইহাঁর আছে। ইহাঁর একটী পদ এই ;—

"নাচত নটবর গৌরকিশোর। অভিনব ভঙ্গি ভুবন করু ভোর॥
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ অনুপাম। হেরইতে মুরছত কত কত কাম॥" * * *

অষ্টম,—নৃসিংহদেব। ইহাঁর রাজা উপাধি ছিল। লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্রও এ সময় বাগ্‌দেবীর বন্দনা করিতেন। নৃসিংহদেব রচিত একটি পদ এই ;—

"নবনীরদ নীল সুঠাম তনু। শ্রীমুখাকৃত ঝলমল চাঁদ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তলবদ্ধ ঝুটা। ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোঁটা॥"* * *

নবম,—আউলিয়া মনোহরদাস। প্রবাদ, মনোহর দাস সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ইনি সখীভাবে ভজনা করিতেন। ইহাঁর একটি পদ এই ;—

"শ্যামের মুরলী, হৃদয় যুবলী, করিলি সকল নাশ।
মোহর মিনতি, না শুনি আরতি, বাজিতে করই আশ॥" * * *

দশম,—লালদাস বাবাজী। সুপ্রসিদ্ধ "ভক্তমাল" গ্রন্থ ইহাঁর রচিত। বৈষ্ণব-সমাজে 'ভক্তমাল' গ্রন্থ কিরূপ আদৃত, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বহুসংখ্যক ভক্তের চরিত-কথা অবলম্বনে এই মালা গ্রথিত। ইহাঁর একটি পদ এই ;—

"রাধাকুণ্ড তীরে কুঞ্জ, কল্পলতিকা পুঞ্জ, পুষ্প শ্রেণী পরম সুন্দর।
সৌরভে আমোদ অতি, নানা বর্ণে নানা জ্যোতি, ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জরে ভ্রমর॥"

এইরূপ শত শত বৈষ্ণব-কবির পদাবলী প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অলঙ্কৃত। সেগুলি সমস্ত একত্র করিলে যে কত বড় গ্রন্থ হয়, বলা যায় না। এইসব কবির প্রায় সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য ও তাঁহার শিষ্যের শিষ্য। সকলেরই হৃদয়-উদ্যানে ভক্তির পারিজাত প্রস্ফুটিত। সে পারিজাতের স্বর্গীয় সৌরভে মনপ্রাণ পুলকিত হয়।

মাধবীদেবী প্রভৃতি কয়েকটি ভক্তিমতী স্ত্রী-কবিও এই সময়ে পদ রচনা করিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি করেন। কিন্তু ইহারও বহু পূর্ব্বে—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবেরও বহুকাল অগ্রে, চণ্ডিদাসের সেই সাধিকা নায়িকা রজকী রামমণির পদও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠক দেখিবেন, প্রাচীন বঙ্গেও স্ত্রী-কবির অভাব ছিল না। রামমণির পূর্ব্বেও যে, কোন পুণ্যবতী রমণী লেখনী ধারণ করেন নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। স্ত্রী-কবিদিগের এই ভক্তিভাব ও রচনাভঙ্গি আজিকার দিনে অনেক পুরুষ কবিও আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইতে পারেন।

গৌরদর্শনবঞ্চিতা, অনুতপ্তা, ভক্তিমতী মাধবী দেবী একটী গানে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"যে দেখয়ে গোরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥"

এই দুই ছত্রে কবি-হৃদয়ে কি গভীর মর্ম্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে! মাধবী দেবীর রচিত একটি পদও এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"কলহ করিয়া ছলা, আগে পিছু চলি গেলা,
ভেটীবারে নীলাচল রায়।

যতেক ভকতগণ, হৈয়া সকরুণ মন,
পদচিহ্ন অনুসারে ধায় ॥”

এইরূপ রায়শেখর, প্রেমানন্দদাস, উদ্ধবদাস, পরমেশ্বরদাস, আত্মারাম দাস, নরহরি দাস, দেবকীনন্দন দাস, ভক্তশ্রেষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ নরোত্তম দাস প্রভৃতি মহাজনেরা প্রাচীন কাব্যক্ষেত্রে যে সুধাবৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। সেই সকল বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যথাস্থানে তাহা বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। ভক্তচূড়ামণি—ঠাকুর নরোত্তম দাসের দুইটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইব, তাঁহার হৃদয়খানি কি অপার্থিব প্রেমে গঠিত। পরশমণি স্পর্শে, যেন তিনি খাঁটী সোনা হইয়াছেন।

প্রথম, গৌরাঙ্গ-প্রেমে-মাতোয়ারা ভক্ত কবির হৃদয়-অভিব্যক্তি ;—

“শ্রীগৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার পদ সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত পাশ।
শ্রীগৌর-মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌর-প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেই ডুবে,
সেবা রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥”

দ্বিতীয়, কবির অতুলনীয় প্রার্থনা,—কি অপূর্ব্বভাবে ঝঙ্কৃত হইতেছে দেখুন ;—

"হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা-জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দ হইয়া।
বাহুপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান, যুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি,
কাঁহা নাথ বলিয়া কান্দিব॥
মাধবী কুঞ্জের পরি, তাহে বসে শুক সারী,
গায় সদা রাধাকৃষ্ণের রস।
তরুতলে বসি তাহা, শুনি পাসরিব দোঁহা,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন সাথ,
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করে এই অভিলাষ,
এমতি হইবে কত দিনে॥"

ঠাকুর নরোত্তম দাস প্রকৃতই ভক্ত চূড়ামণি সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁহার রচিত প্রার্থনার খেদোক্তিগুলি বঙ্গভাষার পরশমণি। প্রকৃতই শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে, আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত এ মণি যিনি স্পর্শ করিবেন, তিনি খাঁটী সোণা হইবেন। শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা বলিলাম এই জন্য যে, লোহায় মলার মাটী থাকিলে চুম্বক সহসা তাহাকে ধারণ করে না। ভক্তিপথের যিনি পথিক,—ভক্তি রসাস্বাদনে যিনি উদ্‌গ্রীব, অথচ সৎসাহিত্য পাঠের আকাঙ্ক্ষা

যাঁর আছে, তিনি যেন নরোত্তম দাসের প্রার্থনা পাঠ করেন,—মনের ময়লা কাটাইবার এমন সহজ ঔষধ প্রাচীন পদাবলীতে আর অতি অল্পই আছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক, 'অমৃতবাজার পত্রিকার' স্বনামধন্য সম্পাদক, স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় তাঁহার রচিত 'নরোত্তম-চরিতের' এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"সংসারে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া যে কঠোর ভজন সাধন করা যায়, ইহার উদাহরণ স্থলে ঠাকুর মহাশয় হইলেন। ইনি রাজার ছেলে, পিতা রাজা, মাতা রাণী, উভয়ে বর্ত্তমান। রাজধানী তাঁহার বাসস্থান। এরূপ স্থলে থাকিয়া বিষয় হইতে অন্তর থাকা অতি কঠিন,—ঠাকুর মহাশয় তাহাই করিলেন।

"ঠাকুর মহাশয়ের নূতন যৌবন। দার-পরিগ্রহ করিলেন না। যাঁহারা এরূপ ব্রহ্মচর্য্য লয়েন, তাঁহারা সমাজের প্রলোভনের মধ্যে না থাকিয়া, বনে বাস করেন। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় গৃহে রহিলেন, তবু তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারিল না।"

ব্যাপার বুঝুন! সৌভাগ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত রাজপুত্র নরোত্তমের কি গভীর বৈরাগ্য! সংসারে থাকিয়াও তাঁহার কি কঠোর সন্ন্যাস! বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাসের সমালোচনায় এক স্থানে বলিয়াছি, সুখ-সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেই 'সুখের কবি' বা দারিদ্র্য-দুঃখের সংস্পর্শে থাকিলেই 'দুঃখের কবি' হয় না,—প্রকৃতি ও সংস্কারভেদে এটি হইয়া থাকে। এই নরোত্তম প্রভুর পরিচয়ে তাহা দেখুন না? এই মহাপুরুষের অন্তিম জীবন-কাহিনী আরও চমৎকার, আরও শিক্ষাপ্রদ। ভক্ত ও ভাবুক পাঠককে আমরা এই মহাত্মার জীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত শিশিরকুমারই সে পুণ্যচরিত অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

লোচন, বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাস।

—০—

চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ।

এইবার প্রকৃতই ভাবের বন্যা বহিল। এতদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী ও প্রার্থনায় যাহা সীমাবদ্ধ ছিল, এইবার তাহা বিরাট্ গ্রন্থাকারে গ্রথিত হইতে লাগিল। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের ভক্ত কবিবৃন্দ তাঁহাদের প্রভু ও প্রাণের ঠাকুরের সুমধুর লীলা-কাহিনী—ছন্দে-বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া গান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ ও জীবগোস্বামীর 'কড়চা' প্রভৃতির ভাব লইয়া চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত পদসমুদ্র, পদকল্পলতা, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, লীলামৃত প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য খণ্ড-কবিতায় বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডার ভরিয়া গেল। নদীতে কূলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিল। সে তরঙ্গের বেগ নদীর দুই কূল প্লাবিত করিল। বেগবতী নদী সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইল। সাগরের সেই তিনটি রত্ন—চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত।

এই তিনখানি গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-সমাজের কৌস্তভ-মণি। এ মণির উজ্জ্বল আলোকে উত্তাপ নাই, পরন্তু তাহার স্পর্শে তাপিত প্রাণ শীতল হয়। লোচন দাস, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ,—এই তিন জন ভাগ্যবান্ কবি উক্ত মণির অধিকারী।

মহাত্মা লোচনদাসের একটি পদ এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

"শুন শুন সই, আর কিছু কই, গৌরাঙ্গ মানুষ নয়।
ভুবন মাঝারে, শচীর কুমারে, উপমা কিসে বা হয়॥
ছাড়িতে না পারি, যে অবধি হেরি, গৌরাঙ্গ বদন চান্দ॥
সে রূপ সাগরে, নয়ন ডুবিল, লাগিল পিরীতি ফান্দ॥
ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই, কনককেশর গোরা।
কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি করিল ছাড়া॥
থাকি গুরু মাঝেঁ, হেরি গো নয়নে, বয়ান পড়িছে মনে।
নিবারিতে যাই, নহে নিবারণ, বিকল করিল প্রাণে॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের, নিছনি লইয়া, সকলি ছাড়িয়া দিব।
লোচনের মনে, হয় রাতি দিনে, হিয়ার মাঝারে থোব॥"

কবির মনোবাঞ্ছা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নিশ্চয়ই পূর্ণ করিয়াছেন।

চৈতন্যভাগবতকার মহাত্মা বৃন্দাবন দাসেরও একটি মধুর পদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। পদটি মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত,—

"দুন্দুভি ডিণ্ডিম, বহুরি জয়ধ্বনি, গাওরে মধুর বিশালরে।
বেদ অগোচর, ভেরিয়া গৌরবর, বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥
হরষে ইন্দ্রপুর, আনন্দে কোলাহল, সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহুপুণ্যে শ্রীচৈতন্য, প্রকাশিল আওল, নবদ্বীপ মাঝে রে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনে ঘন, লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়াপুরবাসী, জনমে উল্লাসি, আপন পর নাহি জানে রে॥
ঐছন কৌতুক, দেবতা নবদ্বীপে, আওল শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গোররসে, বিভোর পরবসে, চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
দেখিলা শচীগৃহে, গৌরাঙ্গ পরকাশে, একত্রে বৈসে কত চাঁদ রে।
মানুষরূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি, বোলয়ে উচ্চ হরি নাম রে॥"

ভক্তবৎসল গৌরাঙ্গ-চরণে সাধক কবির এ ভক্তিগাথা পঁহুছিয়াছে সন্দেহ নাই। নহিলে এ ভাগবত-গ্রন্থ বৈষ্ণবসাহিত্যে এত উচ্চস্থান অধিকার করিবে কেন?

যাবচ্চন্দ্র দিবাকর ঘোষিত থাকিবে। গৌরচন্দ্রের প্রতি কৃষ্ণদাসের কি অবিচলিত ভক্তি, তাহা নিম্নের উদ্ধৃত এই পদটিতে দেখুন।

"সোণর নব, গোউর সুন্দর, নাগর বনওয়ারি।
নদীয়া ইন্দু, করুণাসিন্ধু, ভকতবৎসল কারী॥
বদন চন্দ্র, অধর কন্দ, নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ,
চন্দ্র কোটি, ভানু মুখ, শোভা নিছুয়ারি॥
কুসুম শোভিত চাঁচর চিকুর, ললাট তিলক নাসিকা উপর,
দশন মতিম, অমিয়া হাস, দামিনী ঘনয়ারি॥
মকর কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড, মণি কৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ,
অরুণ বসন, করুণ বচন, শোভা অতি ভারী॥
মাল্য চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
চন্দন বলয়া, রতন নূপুর, যজ্ঞসূত্রধারী॥
সঘনে গাওয়ত, ভকতবৃন্দ, কমলা সেবিত পাদদ্বন্দ্ব,
ঠমকে চলত, মন্দ মন্দ, যাহু বলিহারি॥
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর-চরণে করত আশ,
পতিতপাবন, নিতাই চাঁদ, প্রেমদানকারী॥"

ধন্য ভক্ত চূড়ামণি, ধন্য তোমার রচনা-কৌশল! বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী জাতির ঋণ, তোমাদের নিকট অপরিশোধনীয়। সাগরোত্থিত তোমাদের তিনটি রত্নের আদর চিরকাল থাকিবে। যাহারা রত্ন চিনে, তাহাদের নিকটেই থাকিবে। এক হিসাবে তোমরাই মাতৃভাষার আদি সেবক। তোমাদের সেই ভাব-ভক্তির দৃঢ়-ভিত্তিতে বঙ্গভাষা প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ং শ্রীভগবান্ যে ভিত্তিতে রহিয়াছেন, তাহার প্রভাব ত চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে? বাঙ্গালীর সব গেলেও, এই ভক্তিরসাশ্রিতা ভাষা যাইবে না। স্বয়ং দেবভাষা যাহার জননী, শত প্রকারে অপভ্রংশ বা প্রাকৃত দোষদুষ্ট হইলেও তাহার অস্তিত্ব লয় হইবে না।

পাঠক এখন একবার সেই অজয়নদ তীরস্থ কেন্দুবিম্বের সেই অমর কবি শ্রীজয়দেবকে স্মরণ করুন;—সেই আদি বৈষ্ণবকবির ভাবতরঙ্গিণীই

এতদিন অন্তঃশীলা ফল্গুর মত প্রবাহিত থাকিয়া, শ্রীচৈতন্য-যুগে, পরিপূর্ণ আবেগে কূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইয়াছে ;—শেষ সেই অপ্রতিহত গতি সাগরে সম্মিলিত হইয়া, বিরাট্ কলেবর ধারণ করিয়া, আপন গৌরবে আপনি গৌরবময়ী হইয়া রহিয়াছে। ভাগ্যে থাকেত, নিবিষ্ট মনে ভাবের কাণ লইয়া হৃদয়-বৃন্দাবনে রুণু ঝুনু নূপুরধ্বনি শুনিতে পাইবে ; তার পর আরও অগ্রসর হও ত দেখিতে পাইবে—কবির সেই আরাধ্য দেবতার সেই অতুলনীয় রূপ—সেই পীতধড়াপরা—শিরে শিখিচূড়া—ঈষৎ বঙ্কিম, বিনোদ ঠাম—মোহন করে মোহন মুরলী লইয়া হাসি হাসিমুখে গাহিতেছেন,—
"স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লব মুদারম্।"
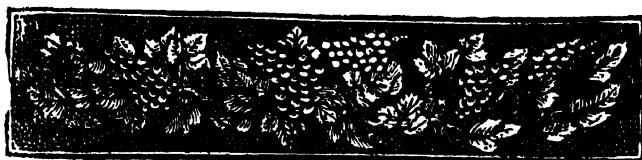
কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ

তন্য যুগের পূর্ণ পরিণতি—কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণে। যে ভক্তিস্রোত এত দিন কেবলমাত্র ভক্তগণের আপন আপন ইষ্টদেবতায় নিবদ্ধ ছিল,—এইবার তাহা মহাকাব্যের বিষয়ীভূত হইল। রামচরিতের করুণার চিত্রে ও লহনা-ফুল্লরার দেবীস্তুতিতে, সে ভক্তির প্রবাহ গাঢ়তর হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কৃত্তিবাসের প্রকৃত পাঠ লইয়া ভাষাবিদ্‌দিগের মধ্যে ঘোর তর্ক ও বাদ প্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছু স্থিরসিদ্ধান্ত হয় নাই। কোন্ খানি যে আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ঠিক তাহা কেহ বলিতে পারেন না। বটতলায় যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হয়, তাহা নাকি সে মহাকবির রচিত নহে, অনেকের ইহাই মত। তাঁহারা বলেন, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের হস্তে পড়িয়া, কৃত্তিবাসের এই দুর্গতি ঘটিয়াছে,—আসল কৃত্তিবাস ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। এই বাদ প্রতিবাদের ফলে অনেকরূপ পাঠান্তর সহ নানা আকারের কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। অনেক স্থান হইতে অনেক পুঁথিও সংগৃহীত হইতেছে; কিন্তু তবুও ইহার কোন স্থিরমীমাংসা হয় নাই যে কোন্ খানি আসল কৃত্তিবাস রচিত। কেননা, সংগৃহীত পুঁথি গুলির অধিকাংশই আধুনিক,—কৃত্তিবাসের নামে তাহা বিকাইতেছে মাত্র।

মহাকবি বাল্মীকি-রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণ যেমন তেমনি আছে, তাহার বিকৃতি বড় কেহ করিতে পারে নাই, কিন্তু এই ভাষা-গ্রন্থ—বঙ্গানুবাদ রামায়ণ নানা ভাবে রূপান্তরিত ও পাঠবিকৃতিদুষ্ট হইয়াছে। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশজন বঙ্গীয় কবি এই বাঙ্গালা রামায়ণ প্রণয়ন ও অনূদিত করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা ও পাঠ অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই বাইশজন রামায়ণকারের মধ্যে কৃত্তিবাসই অগ্রণী এবং তাঁহার নামও সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃত্তিবাসই প্রাচীন বঙ্গের আদি মহাকবি। কৃত্তিবাসের পরে যদি কাহারও নাম গ্রহণ করিতে হয় ত আমরা নিঃসন্দেহে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের নাম উল্লেখ করিতে পারি। ফলতঃ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুল্য বিশদ রচনা,—প্রাচীন সাহিত্যযুগে আর কাহাতেও পরিদৃষ্ট হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মবশে পরবর্ত্তী কবিগণ অবশ্যই এ অংশে অনেক শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছেন; কিন্তু মূলে এই দুই মহাকবির মহতী প্রতিভা বিদ্যমান। পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে ইহাঁদেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াও থাকে।

"কৃত্তিবাস ভরদ্বাজ গোত্রিয় মুখটি বংশীয় ছিলেন। কিন্তু তখন 'মুখোপাধ্যায়' 'বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রভৃতি উপাধির সৃষ্টি হয় নাই। তিনি কৃত্তিবাস উপাধ্যায় বা ওঝা। তাঁহার পিতা বনমালী উপাধ্যায়, পিতামহের নাম মুরারি ওঝা, মুরারি ওঝার পিতামহ নৃসিংহ ওঝা—রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য স্বীয় আবাসস্থান ত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলায় রাণাঘাটের এক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফুলিয়াতে আসিয়া বাস করেন। কৃত্তিবাসের সময়ে ভাগীরথী ফুলিয়া গ্রামের নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। কবির স্বরচিত আত্মচরিত হইতে এই বিষয় জানা যায়।"*

এই পর্য্যন্তই ভাল; ইহার অধিক পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করিতে গেলে, নানারূপ বাদ বিসংবাদের মধ্যে পড়িয়া, কবির কাব্যপ্রতিভা আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল,—১৪৩০ শক—রবিবার—বাসন্তী পঞ্চমী তিথি—বাণীপূজার শুভমুহূর্ত্ত।

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।"

কৃত্তিবাস পণ্ডিত, কৃত্তিবাস যশস্বী কবি; কেবলমাত্র কথকতা শুনিয়া তিনি রামায়ণ রচনা করেন নাই। কবির বিরুদ্ধে এ অভিযোগ এখন টিকিতে পারে না। অনেক অনুসন্ধান ও প্রমাণে এখন ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, সংস্কৃতেও কৃত্তিবাসের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। গৌড়েশ্বর রাজা কংসনারায়ণ তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া রামায়ণ রচনা করিবার ভার দেন। কবিও হৃষ্টচিত্তে রাজাদেশ পালন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হন।

তবে মূল সংস্কৃত রামায়ণ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,—কবির মৌলিক কল্পনা-শক্তি ও স্বাধীন রচনাস্পৃহা। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ আপনাদের রচনা মধ্যে কোন নূতন বিষয় বা ভাব সন্নিবিষ্ট করিলেই যেন অধিক সুখী হন। আত্ম মনোভাব প্রকাশের এ আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক; তজ্জন্য কবিকে অপরাধী করিতে পারা যায় না। আসল কথা, সেই নূতন বিষয় বা ভাব, আলোচ্য ঘটনার সহিত কিরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহাই বিচার্য্য।

স্বভাবকবি কৃত্তিবাস পাঁচফুল হইতে মধুসঞ্চয় করিয়া অপরূপ মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মূল বাল্মীকি রামায়ণ ব্যতীত অদ্ভুত রামায়ণ, পদ্মপুরাণীয় রামায়ণ, চলিত কাহিনী ও কথকতা হইতে তিনি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; পরে সেই উপাদান সাজাইয়া গুছাইয়া—আপন অতুল্য কল্পনায় মিলাইয়া—সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় একখানি বিরাট্ পট অঙ্কিত করেন।

কৃত্তিবাসের তুলনা—কৃত্তিবাস। সেই স্বভাবকবির কবিত্বভাণ্ডারে যে অমূল্য মণিমাণিক্য ছিল, উত্তরকালে তাহাই কবিপরম্পরায় ভোগ-দখল করেন এবং আজিও তাহা ইংরেজি পালিসে একটু আধটু রূপান্তরিত হইয়া 'মৌলিক' আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে। অবশ্য কীর্ত্তিবাসের রচনা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ,—ছন্দঃ অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও ভাষাগত ভুল যে উহাতে আদৌ নাই, এমন কথা বলিতেছি না। তবে প্রাচীন বাঙ্গালার আদি মহাকবি বলিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদর্শন করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। বিশ পঞ্চাশ বৎসরের কথা নয়,—কয়টা শতাব্দী চলিয়া গেল,—সেই ফুলিয়ার কবি,—সেই

বঙ্গের আদিকবি—আজিও যেন চোখের সম্মুখে রহিয়াছেন। কি পুণ্যে, কোন্ গুণে, ভবিবার কথা নহে কি ?

বিশেষতঃ, কৃত্তিবাসের এই রামায়ণ—বাঙ্গালীর আপামর সাধারণের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব, যে উচ্চনীতি, যে সুশিক্ষা ও যে মহান্ আদর্শ আনয়ন করিয়াছে,—এক কাশীরাম দাসের মহাভারত ব্যতীত, তেমন শুভফল আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী লেখকদ্বারা সাধিত হয় নাই,—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বড় গলা করিয়া বলিতে পারি। রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর, পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী হইতে নিরক্ষর মুদীর দোকান, পুরমহিলার পুণ্যাশ্রম হইতে পতিতার পাপপূর্ণ পঙ্কিলস্থান—কোথায় না রামায়ণ মহাভারতের কথা পঠিত, শ্রুত, অথবা গীত না হয় ? যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালী, হাফ্-আকড়াই, কথকতা—রামায়ণ-মহাভারতের অমৃতময়ী কথার যেমন ফল ফলিয়া আসিতেছে, কোন্ কবি বা সাহিত্যকার সমাজে তেমন শুভফল ও উচ্চ আদর্শ প্রদানে সমর্থ ?

কৃত্তিবাসের রচনার আদর্শ যদৃচ্ছাক্রমে এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম ; রসজ্ঞ পাঠক দেখিবেন, স্বভাবকবির কবিত্ব কত মধুর, বর্ণনা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী, ভাব ও ভাষা কিরূপ সরল ও সুন্দর !

সতীলক্ষ্মী জনকনন্দিনীর রূপবর্ণনে কবি বলিতেছেন,—

"অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি। এ সামান্য কন্যা নহে,—কমলা আপনি ॥
কন্যা-রূপ জনক দেখেন দিনে দিনে। উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে ॥
হরিণীনয়নে কিবা শোভিত কজ্জল। তিল ফুল জিনি তাঁর নাসিকা উজ্জ্বল ॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর। সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি। হিঙ্গুলে মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি ॥
অরুণ বরণ তাঁর চরণকমল। তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন। অমৃত জিনিয়া তাঁর মধুর বচন ॥
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে। লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে ॥"

আর একস্থানে দেখুন,—সরস বর্ণনার সহিত কবির সহৃদয়তা কেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে ;—

"হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে। পথে অমঙ্গল রাম দেখেন সত্বরে ॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। তোলা পাড়া শ্রীরাম করেন কত মনে ॥

বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর। লক্ষণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষণ ভুলিবে। সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে॥
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা। যে ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা॥
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা। আজিকার দিন মম রক্ষা কর সীতা॥
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন। আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী। শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী। জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী॥"

এ হেন কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর চিরপূজ্য। সুখের বিষয়, তাঁহার চরিতকথা ও তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের বিষয় মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। কিন্তু দরিদ্র কবিকঙ্কণ যেন ক্রমেই বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইতেছেন। তাঁহার কথাও যেমন কেহ আলোচনা করে না, তাঁহার চণ্ডী কাব্যও তেমনি কেহ বড় একটা পড়ে না। অথচ এই দুই জনেই বঙ্গের আদি মহাকবি। এক হিসাবে কবিকঙ্কণ—কৃত্তিবাস হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, তাঁহার রচনা ও কাব্যের উপাখ্যান-ভাগ সম্পূর্ণ মৌলিক। ইহা সত্ত্বে, দরিদ্রকবি ক্রমেই বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইতেছেন,—ক্ষোভের কথা নয় কি?

কেন এমন হয়,—ভাষাতত্ত্ববিদ্ মহাশয়েরা ত সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা ভারতচন্দ্র বড় কি কবিকঙ্কণ বড়,—অমুক শকে ও ঠিক্ অমুক তারিখে কে জন্মিয়াছে বা জন্মে নাই;—এই বিচার লইয়াই লেখনীযুদ্ধে ব্যস্ত;—কিন্তু এ চিন্তা তাঁহাদের মনে কস্মিন্‌কালে জাগিয়াছে কি না সন্দেহ।

আমরাও যে এ বিষয়ে ঠিক কিছু একটা বলিতে পারিব, এ দুরাশা করি না। তবে কথাটা মনে উঠিয়াছে, তাই চিন্তাশীল পাঠককে একটু ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম।

কবিকঙ্কণের চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে একজন বঙ্গীয় লেখক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—"মুসলমানগণের অত্যাচার সময়ে হিন্দুমাত্রেই দেবানুগ্রহের প্রার্থী ছিলেন; সেই দেবানুগ্রহপ্রার্থী সমাজের ফল—মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। * * * সকলের মন চণ্ডীর দিকে আকৃষ্ট হইল; সকলেরই হৃদয়

চণ্ডীমাহাত্ম্যে নাচিয়া উঠিল। সমাজে বলাধান হইবার সূত্রপাত হইল। * * * কবিকঙ্কণ প্রথম দলের নেতা; কৃত্তিবাস দ্বিতীয় দলের চূড়া। দুই জনই এক দুঃখের সমাজে বর্ত্তমান ছিলেন; একজন ভবিষ্যৎ কামনায় মুগ্ধ; অপর জন অতীত সুখ স্মরণেই পরিতৃপ্ত। একজন যে চণ্ডী মাহাত্ম্য-বীজ বপন করিলেন, তাহার বলে চণ্ডীর প্রসাদে ভবিষ্যতে কালকেতুর ন্যায় কোন লোক জন্মগ্রহণ করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন করিতে পারে—লোকে শ্রীমন্তের ন্যায় নানা দুঃখে পতিত হইয়াও পরিশেষে ভগবতীর কৃপায় সকল প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার সাধন করিতে পারে—এই মনন করিয়া প্রশান্ত-চিত্ত ও অন্যজন যে অতীত রামলীলা গানরূপ বীজ বপন করিলেন তাহার বলে লোকে সকল প্রকার দুঃখেই রামচন্দ্রের ন্যায় প্রশান্ত থাকিতে পারে,—সকল বিপদকেই উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় অটল থাকিতে পারে এই ভাবিয়াই হৃষ্টচিত্ত।" *

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ত ঠিক্ হইল না? প্রথম-কবির কল্পনা—কল্পনাতেই আবদ্ধ রহিল; দ্বিতীয়ের প্রাণারাম রামচরিত সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিল, করিতেছে, এবং চিরদিন করিবে। এখনকার কালে হইলে না হয় লেখক মহোদয়ের এই তর্কের খাতিরে বলিতাম যে, কবিকঙ্কণ 'জাতীয় ভাবের' কবি,—তাই কালকেতু ও শ্রীমন্ত-রূপ দুইটি Hero খাড়া করিয়া শক্তিপূজার সার্থকতা দেখাইলেন; কিন্তু তাত নয়,—সে আজ কোন্ শতাব্দীর কথা,—দরিদ্র কবি প্রকৃতির এক অজানা নির্জ্জন নিলয়ে বসিয়া আপনার ইষ্ট-দেবতার সাধন ব্যপদেশে, এমন আধুনিক patriotism এর ছবি অঙ্কিত করিতে যাইবেন কেন? দেশহিতৈষিতা, স্বদেশপ্রিয়তা—এ সব খাঁটী ইউরোপীয় ভাব;—কৃত্তিবাস-কবিকঙ্কণের যুগে, এমন ভাব, কোন ভক্ত-কবির হৃদয়ে উদ্ভূত হওয়া একরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। ভক্তের ভাল-বাসার কেন্দ্র,—সমগ্র মানবমণ্ডলী, সমগ্র জীব-জগৎ;—ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ প্রাণীকেই প্রীতির চোখে দেখাই তাঁহার ধর্ম্ম। তাঁহার নিকট স্বদেশ বিদেশ, স্বজাতি বিজাতীর কোন ভেদনীতি নাই।

কথাটি এই, শক্তিপূজক—শক্তির উপাসক কবি আপন ভাবপ্রবণ বিশাল

---

* শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

হৃদয়ে মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া দেখাইলেন,—দেবীকৃপায়, তাঁহার ভক্ত-সন্তান—কিরূপ দুঃখদারিদ্র্যক্লেশ সহিয়া,—শত বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ-নির্য্যাতনের মধ্যে পড়িয়াও ভক্তিবলে কিরূপ অজেয় ও অপরাজিত হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে! কবির কালকেতু ও ফুল্লরা এবং শ্রীমন্ত ও খুল্লনা—ভক্তির কষ্টি-পাথরে পরীক্ষিত হইয়া জীবকে শিক্ষা দিলেন, ভগবৎ-চরণে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা বল আর কিছুতে নাই;—অকপট বিশ্বাস ও নির্ভরতায়, জীব দেবীমায়ায় উত্তীর্ণ হইয়া পরিণামে শ্রেয়ঃলাভ করিয়া থাকে। নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, কালকেতুর উপাখ্যানে বা শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল-যাত্রা বর্ণনে, কবির কোনরূপ রাজনৈতিক অভিসন্ধি (Political motive) ছিল না।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম;—

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর কেন আর এখন তেমন আদর নাই? কেন আর এখন প্রাচীন বা প্রৌঢ়ের মুখে সে অমৃতময়ী কথা শুনিতে পাই না? হায়! কোন্ পাপে, কার অভিশাপে, দিদী-মা ঠাকুর-মার মুখের সে মধুর মনোহর গল্প-গাথা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে? বেশ মনে আছে, এই কালকেতু-শ্রীমন্ত সওদাগরের পালা—কেমন ভাবপূর্ণ সরল ব্যাখ্যার সহিত—স্বর্গগতা দিদী-মার মুখে শুনিয়াছি! শুনিতে শুনেতে মোহিত হইয়াছি। আর কোথায় বা আজ সেই সিদ্ধ গায়ক—চণ্ডীর গনের সেই অদ্বিতীয় অভিনেতা—ভক্ত রাজনারায়ণ? জাতিতে স্বর্ণকার হইলেও তিনি আমার নমস্য;—তাঁহার মুখের সেই অমৃতময় 'মা'-নাম—এখনো যেন কাণে বাজিয়া আছে! সেই চামর হস্তে সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি,—দুই পার্শ্বে দুই বালক পুত্রকে লইয়া, বাম হস্তে গলা ধরিয়া, গম্ভীর নাদে—সপ্তমে সুর চড়াইয়া—যখন 'মা—মা—ওমা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া 'আখর' দিতেন, তখন যে অতিবড় পাষণ্ডের চোখেও জল আসিত;—শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণও যে তখন সেই গালভরা মা-নাম শুনিয়া, আপন জাত্যভিমান ভুলিয়া গিয়া, আশীর্ব্বাদ করিবার ছলে, মনে মনে সেই গায়ককে প্রণাম করিতেন! প্রকৃত ভক্তের আবার জাতি কি? ভক্ত রাজনারায়ণ মাতৃনাম-সাধনবলে নিশ্চয়ই কোন উচ্চ লোকে গমন করিয়াছেন;—আজ তাঁহার মুক্ত আত্মার পারিজাত-সৌরভে দিক আমোদিত! হায় তুমি

শৈশবস্মৃতি! ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল হইল, ভক্ত গায়কের মুখে সেই চণ্ডীর গান শুনিয়াছি;—মনে হইতেছে, যেন কালিকার কথা! আর এখন?—প্রৌঢ়ের এই জীবন-সন্ধ্যার মাঝামাঝি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি,—কবে ডাক্ পড়িবে স্থিরতা নাই,—কৈ, এখন ত আর চেষ্টা করিয়াও তেমন ভাবের মা-নাম শুনিতে পাই না? গায়ক আছেন অনেক, গানও হইতেছে অনেক; কিন্তু সাধকের সিদ্ধকণ্ঠের গান—কবিকঙ্কণের এই চণ্ডীর গান ত আর তেমন পল্লী-সমাজ মুখরিত করে না? এ কি দেবীর কৃপার অভাব, না আমাদের অদৃষ্টের বিড়ম্বনা? হায় সোণার শৈশব! আবার কি সে দিন ফিরিয়া আসে না?

বনবিহঙ্গ যেমন আপন ইচ্ছায় মনের উল্লাসে গান করে, তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক, কেহ শুনুক আর নাই শুনুক, তাহার মনে জাগে না,—কবি মুকুন্দরামও তেমনি প্রকৃতির মুক্ত-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, মনের কপাট খুলিয়া মা-নাম গাহিয়াছিলেন। তাহার ফলে চণ্ডীকাব্যে ভাবের যে সরলতা ও আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী মহাকবিগণের কাব্যেও অল্প মাত্রায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য ভাবের কাণ লইয়া, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া কবিকঙ্কণের এই মাতৃগীতি শুনিতে হইবে।

নহিলে, সত্যের অনুরোধে বলিব, এই কাব্য পড়িতে পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। মূল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অনেক অবান্তর বিষয়ের বর্ণনহেতু এবং ভাষার অপরিস্ফুটতা নিবন্ধন—এ ত্রুটি হইয়া পড়িয়াছে। ভাষা সর্ব্বত্র মার্জ্জিত নয়, লিপিকুশলতা ও রচনানৈপুণ্যও তেমন উচ্চাঙ্গের নয়—সেও এক কারণ।

একটা বড় কঠিন কথা এখানে বলিয়া ফেলিব। কথাটা স্বাভাবিকতা (Natural) লইয়া। একদল লোক আছে, তাহারা তলাইয়া না বুঝিয়া যখন তখন এই কথাটা বড় বেশী মাত্রায় ব্যবহার করে, আর সাধারণ লোকসমাজে খুব বাহবা পায়। 'অমুক চরিত্রটি বড় স্বাভাবিক'; 'অমুক অভিনেতা বড় স্বাভাবিক অভিনয় করে'; 'অমুকের কণ্ঠস্বর স্বভাব হইতে গৃহীত'; 'অমুকের চিত্রবিদ্যা—স্বভাবের নিখুঁৎ ছবি'—ইত্যাদি। এখন জিজ্ঞাস্য,—এই 'স্বাভাবিকতাটিতে' তাঁহারা কি বুঝেন,—কি দেখিতে পান? সংসার বা সমাজ অথবা চতুষ্পার্শ্বের লোকমণ্ডলী যেমন আছে, ঠিক তেমনটি দেখিতে পাইলেই

াক ঐ 'প্রশংসাসূচক' স্বাভাবক আখ্যা দেওয়া যায়?—অথবা তাহার সহিত একটু রং ফলাইয়া একটু কলা কৌশল (Art) দিয়া তাহা দেখাইলে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়? নিশ্চয়ই শেষের কথাটা সত্য—স্বভাবের সহিত একটু কলা-কৌশল থাকিলেই লোকের মনোরম্য হয়। সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র-বিদ্যা, অভিনয়, চরিত্রের উন্মেষণ—সকলই এই পর্য্যায়ভুক্ত। Nature এর সহিত একটু Art এর সম্বন্ধ রাখা চাই। সমজদার শ্রোতা, পাঠক, দর্শক,—সকলেই ইহা বুঝেন। বুঝে না—অথবা বুঝিয়াও মানিতে চহে না—কেবল কতকগুলা চিন্তাহীন প্রাণী। ইহারা আপন চোখে দেখে না,—পরের চোখে দেখে; আপন কাণে শুনে না,—পরের কাণে শুনে; আপন মনের ভাবে পড়ে না,—পরের মনের ভাব লইয়া পড়ে;—নিজস্ব ইহাদের কিছু নাই,—অন্যের প্রতিধ্বনি করিতেই যেন তাহারা জন্মিয়া থাকে। কোন বিষয় দেখিয়া, শুনিয়া বা পড়িয়া তাহার ভাল লাগিয়াছে অথবা ভাল লাগে নাই, তবু মুখ ফুটিয়া কিছুতেই সে বলিবে না যে, 'আমার ভাল লাগিয়াছে কিংবা ভাল লাগে নাই।' কেন না তাহা হইলে হয়ত তথাকথিত 'বিজ্ঞ ও শিক্ষিতদল' তাহাকে অনভিজ্ঞ মনে করিবে। প্রকৃতই এই হীন অনুকরণপ্রিয়তা ও ঝুটা সভ্যতায় এমন একটা জিনিস এ দেশে আমদানী হইয়াছে,—যাহার ফলে কপটতায় ও মিথ্যা কথায় সমাজশরীর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে।

স্বাভাবিক বা Natural কথাটা মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু উহা সত্বে আর একটি শব্দ প্রচ্ছন্নভাবে যোগ থাকে,—সেটি কলা বা Art. সুতরাং Nature + Art এর সমবায়ে চিত্র বা কাব্য, সঙ্গীত বা অভিনয় উৎকর্ষলাভ করে, এবং তাহাই ঐ প্রশংসাসূচক 'স্বাভাবিক' আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের এরূপ এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা 'স্বাভাবিক' 'স্বাভাবিক' করিয়া মুকুন্দরামকে এত উচ্চে তুলেন যে, তাঁহার পরবর্ত্তী ভারতপ্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্রকে তাঁহারা দূর্ দূর্ করিয়া তাড়াইয়া দেন; 'ভদ্র-সাহিত্য' হইতে তাঁহাকে 'নির্ব্বাসিত' করিতে চেষ্টা পান। কেন যে তাঁহারা কবিকে অতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, কারণ ত ভাবিয়া পাই না। অথচ ভারতের তুলনায় কবিকঙ্কণের যে দোষ ও ত্রুটি, কৌশলপূর্ব্বক তাহার

সমর্থন করিয়া, প্রকারান্তরে ভারতকেই অপদস্থ করিতে প্রয়াস পান। অনেক দিন হইতে 'সাহিত্যিক দলের' এই একদেশদর্শিতা দেখিয়া আসিতেছি। দেখিয়া কষ্ট অনুভব করিয়াছি। ভারতচন্দ্রের সমালোচন কালে কথাটা খুলিয়া বলিব।

কবিকঙ্কণ বঙ্গের একজন আদি মহাকবি, কৃত্তিবাস অপেক্ষাও উচ্চ আসনে বসাইতে প্রস্তুতও আছি;—তিনি ভক্ত, ভাবুক, পুণ্যবান্ এবং সাধক বা মায়ের ছেলে;—জগদম্বা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদান করেন, সেই বরপ্রভাবেই তিনি চণ্ডীকাব্য লিখিয়া অতুল যশস্বী হইয়াছেন—এ সবও বিশ্বাস করি;—কিন্তু তাঁহার সেই যশ মলিন হইতেছে কেন? একটা না একটা ত্রুটি নাই কি? নিশ্চিতই আছে। সেই ত্রুটি—ভাষার অপরিস্ফুটতা।

বনবিহঙ্গের কাকুলি মধুর বটে, কিন্তু একঘেয়ে;—সব সময়ই তাহা ভাল লাগে না। গৃহপালিত, সুশিক্ষিত, মানবকণ্ঠের অনুকরণকারী পক্ষীর গানও কখন কখন কাণ পাতিয়া শুনিতে সাধ যায়। কেননা, তাহার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ও স্বরসঙ্গীত ত আছেই, তার উপর শিক্ষাগুণে সে যে মানবকণ্ঠেরও অনুকরণ করিয়া গান গাহিতে শিখিয়াছে, তাহাও কি শ্রোতব্য নয়? এমন না হইলে শিক্ষার মাহাত্ম্য থাকে কিরূপে? সকলেই যদি বুনো জঙ্গ্‌লী হইয়া বেড়ায়,—সমাজে তাহা হইলে শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় কিরূপে?

মনে করুন, রাফেলের একখানি চিত্র—সমুদ্র ও আকাশের মধ্যবর্ত্তী পথে একখানি অর্ণবপোতের ছবি;—চিত্রখানি দেখিবামাত্র নয়ন মন মুগ্ধ হইল। —কোন্ গুণে? চিত্রের একমাত্র স্বাভাবিকতা গুণে,—না, তাহার সহিত চিত্রকরের অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তি গুণে? চিত্রের সেই রং, রেখা, লেখা, তুলিটানা—চিত্রকরের সেই মনঃসংযোগ, অনুরাগ বা একনিষ্ঠা,—সর্ব্বোপরি স্বভাবের ধ্যান—এই সবটা জড়াইয়াই না চিত্রের মনোহারিত্ব? কেবল 'স্বাভাবিক' বলিলে অর্থ হয় না—শুধু স্বভাব যদি, তবে সে সত্যিকার জল বায়ু ঢেউ—এ সব কোথায়?

সঙ্গীত বা অভিনয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অভিনয়ে অভিনীত অংশের হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি ও সাজ পরিচ্ছদের সহিত কণ্ঠস্বরের একান্ত প্রয়োজন হয়।

এক হিসাবে কণ্ঠস্বরই অভিনয়ের প্রাণ। কিন্তু সেই স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে,—হয়ত ছন্দে, কবিতায়, অথবা সঙ্গীতের ন্যায় ক্রমিক ঝঙ্কৃত উচ্চকণ্ঠে। শোক দুঃখ হর্ষ ক্রোধ—সকল ভাবই হয়ত ছন্দে উচ্চাচিত হইতে লাগিল।—এমন অবস্থায় ঐ অভিনয়কে শুধু 'স্বাভাবিক' বলিলে, স্বভাবের অঙ্গহানি হয়—কেননা, শোকের সময় কেহ বিনাইয়া বিনাইয়া শব্দ সংযোজন করে না।—কলা-বিদ্যার যাহা মুখ্যলক্ষ্য, অভিনয়ে তাহাই প্রস্ফুর্ত্তিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ Nature+Art দুয়ে মিশিয়া যাহা হইবার তাহাই হয়। সে-অবস্থায় যে 'স্বাভাবিক' বলিয়া প্রশংসা ধ্বনিত হয়, তাহাই ঠিক;—শুধু স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রকৃতির উলঙ্গ—বন্য ভাবটা কলাবিদ্যার অঙ্গীভূত নহে।

সাহিত্য ও কবিতা সম্বন্ধেও এই কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য—শিক্ষা ও সংস্কার-গুণে ভাব ও ভাষা মার্জ্জিত হইয়া অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে;—নচেৎ কেবলমাত্র প্রাকৃত ভাষায় ও চলিত কথাবার্ত্তায় তাহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়, চিত্রের সজীবতা থাকে না, অল্পদিনমধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। শিল্প ও কারুকার্য্যও যে ঐশ্বরিকশক্তির একটা বিকাশ,—সহসা এ ভাব কেহ ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। যদি তা না হইত, তবে পুরীতে সমুদ্র দর্শন করিয়া লোকে কেন আবার কষ্টস্বীকার করিয়া ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিতে যায়? দার্জ্জিলিংএ হিমালয় দর্শন করিবার পরও আগ্রার 'তাজ' দেখিতেই বা লোকে ছুটে কেন? তবেই হইল, স্বভাবের শোভার সহিত আবার একটা "মানবীয় ঐশীশক্তির" বিকাশ আছে, যাহার দর্শনে—শ্রবণে—মননে—পঠনে—হৃদয়ে অপূর্ব্বভাবের উদয় হয়। "মানবীয় ঐশীশক্তি" বলিলাম, ভাষা-অর্থবিদ্ বৈয়াকরণ ক্ষমা করিবেন। কেননা, এটি একটি ভাবের কথা; তিনি হয়ত ইচ্ছা করিয়াই এ ভাবের ভিতর প্রবেশ করিবেন না,—ভাষার মার-পেঁচ ধরিয়া 'সোণার পাথর-বাটী' বলিয়া লেখককে গালি পাড়িবেন। বলা বাহুল্য, সকল গুণবান্ ব্যক্তির হৃদয়েই প্রচ্ছন্নভাবে ঐশ্বরিকশক্তির ক্রীড়া হইয়া থাকে। তাহারই ফলে সকল প্রকার কলাবিদ্যার মহিমা প্রকাশ পায়,—মানুষ উপলক্ষ মাত্র।

এই সকল কথা স্মরণ করিয়া কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হই? তাঁহার কবিতা চিত্তাকর্ষক বটে এবং চণ্ডীকাব্যে তাঁহার যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছেও বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ নূতনত্ব নাই,—উহা যেন কতকটা একঘেয়ে। স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনদোষও আছে। বর্ণনা সরস ও স্বাভাবিক হইলেও বড় সাদামাটা—সাধারণ রকমের। প্রত্যক্ষ-বাদী স্থূলদর্শী লোকের এ শ্রেণীর Realistic কাব্য ভাল লাগিলেও ধ্যানের বিষয় ইহাতে অল্পই আছে। আবার সে ধ্যানও খুব উচ্চাঙ্গের নহে। যাহা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যইতে হয়, বাহ্যজগৎ ভুল হইয়া যায়. এমন ভাবের কোন আদর্শ চিত্র (Idealistic sketch) ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। খুল্লনার 'বারমাস্যার দুঃখবর্ণনা' চলিতেছে ত চলিতেছেই,—তাহা খুব দারিদ্র্যব্যঞ্জক হইলেও গভীর নয়—কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ও একঘেয়ে রকমের।—'দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান, আমানি খাওয়ার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান!'—ইত্যাকার বর্ণনা খুব প্রত্যক্ষ ও পরিস্ফুট হইলেও ভাবের গভীরতা ইহাতে কিছুই নাই,—ধ্যানের ছবিও ইহাতে কিছু পাওয়া যায় না, —কোন উচ্চ আদর্শ বা শিক্ষাও ইহাতে লাভ হয় না। কথাটা সত্য হইলেও, সত্যের সৌন্দর্য্য বা কবিত্বের কমনীয়তা কিছুই ইহাতে নাই। তবে আর হইল কি? যাহা পাঠে হৃদয়ে কোন ভাবের ছবি উঠিল না, তাহা উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিব কিরূপে? বলিবে "যে—নিজের দুঃখ জানাইতেছে, সে বেশী কথা বলিবে কেন?—সংক্ষেপে জানাইল, 'আমাদের দুঃখ যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাও, ত ঐ আমানি খাওয়ার গর্ত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে দেখ।' অর্থাৎ পেট-ভরা ভাত আমাদের জুটে না, খাই আমানি, তারও একখানা পাত্র নাই, গর্ত্তে ঢালিয়া খাইতে হয়—ইত্যাদি"।—এটা কি বড়ই দুঃখের চিত্র? তাহা হইলে, 'আমানি'ও যার জুটে না,—'আমানি খাবার গর্ত্ত'-পরিমাণ ভূমিও যার নাই, এমন সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র নিরাশ্রয়—অন্নসত্রের কাঙ্গালী—তাহাদের কথা ভাবিলে ত আরও দারিদ্র্যের ছবি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে?—কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ বর্ণনা কি কবিত্বের উচ্চ উপাদান, না—পাঠকের একটা উপভোগের জিনিস? 'বারমাস্যার দুঃখবর্ণনা' পাঠে হৃদয়ে করুণার ছবি জাগিয়া উঠে কৈ? হৃদয়ে গভীর সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়

কোথায়? তাহা ত হয় না. উপরন্তু অন্তরে কোন স্থায়ী উচ্চভাবও ক্রিয়া করে না। বরং কবি যেখানে ভক্তিভাবে ভবানীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ভক্তের প্রতি তাঁর কৃপার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সেই স্থল ভক্তির অরুণরাগে অতি উজ্জ্বলভাবে রঞ্জিত হইয়াছে, ভক্ত ও ভাবুক সেই সব বর্ণনা পাঠ করিয়া অন্তরের অন্তরে দ্রব হন সন্দেহ নাই। বিশেষ, কবির 'কালীয়-দহে কমলে কামিনীর' চিত্রটি এ বিষয়ে অতুল্য। কেননা, এখানে স্বভাবের শৈাভার সহিত একটু কলাবিদ্যার (Art) মিশ্রণ হইয়াছে।

স্থূল স্বভাব-চিত্রে যে, মন মোহিত হয় না,—তাহা ঐ 'বারমাস্যা', কাল-কেতুর ভোজন ব্যাপার, ভাঁড়ু দত্তের ধূর্ত্ততা প্রভৃতিতে পরিলক্ষিত হইবে। এই জন্যই উচ্চশ্রেণীর কবিকে উচ্চাঙ্গের আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি করিতে হয়। সে চিত্রে ত স্বাভাবিকতা থাকিবেই, তার উপর আবার এমন একটা জিনিস থাকিবে,—যাহা চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়;—সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও আনন্দ তাহাতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিয়া থাকে।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে যে একটি বিশেষ গুণ আছে, তাহা কেহ বড় খুলিয়া বলেন নাই,—সেটি তাঁহার মানবচরিত্র জ্ঞানের সহিত ঘটনাপূর্ণ নাট্য-কৌশল। চণ্ডীকাব্য ভাঙ্গিয়া লইলে বেশ দুখানি ভাল নাটক হয়।

মুকুন্দরামকে উপলক্ষ করিয়া, 'কাব্যের আদর্শ' বিষয়ে আমরা কিছু বলিলাম। এরূপ বলিবার বিশেষ একটু কারণ হইয়াছে বলিয়া বলিলাম। কারণ কবিকঙ্কণের মাহাত্ম্য বাড়াইতে গিয়া অধিকাংশ সাহিত্য-সমালোচকই, পরবর্ত্তী কবি ভারতচন্দ্রকে বড় নিম্নে ফেলিয়াছেন। শুধু নিম্নে ফেলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার প্রতি অনেক কটূক্তিও বর্ষণ করিয়াছেন; কেহ কেহ বা বঙ্গভাষার সেই গুরুস্থানীয় কবির পুণ্যস্মৃতির অত্যন্ত অমর্য্যাদা করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। যথা স্থানে আমরা সে সকল কথার উল্লেখ করিব।

ভারতচন্দ্রের পক্ষে দু কথা কহিব বলিয়া, কেহ যেন এরূপ না মনে করেন যে, আমরা কবিকঙ্কণের পক্ষপাতী নহি। গুণের পক্ষপাতী আমরা সকলেরই; বিশেষতঃ বঙ্গভাষার আদি কবি ও পদকর্ত্তা মাত্রেই আমাদের প্রণম্য ও পূজনীয়। তাঁহাদের যে কিছু সাহিত্যসম্পত্তি,—পূর্ব্বপুরুষের দান বলিয়া অবনত মস্তকে আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। তবে সমালোচনা

উপলক্ষে, সত্যের অনুসরণ করিতে, আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। যাঁহার যে পরিমাণ প্রাপ্য, তাঁহাকে সেই পরিমাণ সম্মান দিতেই হইবে। অবশ্য, আমাদের ধারণা অভ্রান্ত না হইতে পারে। পরন্তু মনে জ্ঞানে যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইরূপই ত বলিব ?

বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত দামুন্যাগ্রমে, অনুমান ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী। মিশ্র ইঁহাদের নবাবদত্ত উপাধি।

আজ সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে, দামুন্যার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে, যে পবিত্র মাতৃনাম ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই নাম কালে 'চণ্ডীর গানে' পরিণত হইয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু হায়! এখন আর তেমন ভাবে—রাজনারায়ণের সেই মন-মাতানো ভাবে—সে গাল-ভরা মাতৃনাম শুনিতে পাই না। আমাদের দুর্ভাগ্য।

চণ্ডীকাব্যের দুইটি উপাখ্যানের দুইটি চিত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম। প্রথম চিত্রে, ছদ্মবেশিনী দেবীর প্রতি কালকেতুর উক্তি :—

"আমি ব্যাধ নীচ জাতি, তুমি বামাকুলবতী, পরিচয় মাগে কালকেতু।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা, কিবা দেব-দ্বিজ কন্যা, ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু ॥
ব্যাধ গো হিংসক বড়, চৌদিকে পশুর হাড়, মশান সমান এই ভূমি।
বলি গো উচিত বাণী, ঘরে চল ঠাকুরাণী, দেবের সমান মূর্ত্তি তুমি ॥
কিবা পথ পরিশ্রমে, আইলে দিগের ভ্রমে, আওয়াস ছাড়িয়া এই ঘর।
চল বন্ধুগণ পথে, ফুল্লরা চলুক সাথে, পাছু লয়্যা যাব ধনুশর ॥
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ, থাকিতে থাকিতে দিননাথে।
যদি হবে কাল নিশা, লোকে গাবে দুর্ভাষা রজনী বঞ্চিবে কার সাথে ॥
সীতা যে পরম সতী, তার শুন দুর্গতি, দৈবে ছিল রাবণ-ভবনে।
সতী জানকীরে জানি, লোকে বাদে রঘুমণি, পুনর্ব্বার পাঠাল্য কাননে ॥
পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনার জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যথা তথা অবস্থিতি, দোঁহাকার এক গতি, হিত বিচারিয়া দেখ মনে ॥
যেমত তিলক পাণী, তেমত অসত্য বাণী, সত্যবাণী তিলক চন্দন।"

দ্বিতীয় চিত্র,—কালীদহে শ্রীমন্তের 'কমলে কামিনী' দর্শন;—কবিত্বে এই স্থান অতুলনীয়। চণ্ডীকাব্যের এ অংশের তুলনা নাই;—

"অপরূপ দেখ আর, ওরে ভাই কর্ণধার! কমলে কামিনী অবতার।
ধরি রামা বাম করে, উগারিয়ে করিবরে পুনরপি করয়ে সংহার॥
কমল কনক রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী, মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা উমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা, সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
উরুযুগ সুন্দর, নাভি গভীর সর, বাহুযুগ মৃণাল সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা, নাসা অলঙ্কার শোভা, অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
হেমময় হার দুলে, কিবা শোভা তার গলে, স্থির হয়্যা সৌদামিনী বৈসে।
নিরুপম পরকাশ, মন্দ মধুর ভাষ, আইসে ভঙ্গী শিখিবার আশে॥
কলাপি-কলাপ কেশ, ভুবনমোহন বেশ, পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা, রবির কিরণ করে দূর॥
রাজহংস বর জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি, দশনখে দশ চান্দ ভাসে।
কোকনদ দর্প-হর, বেষ্টিত যাবক-কর, অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥
অধর বিম্বক বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু, কুরঙ্গ খঞ্জন বিলোচন।
অতসী কুসুম তনু, ভুরুযুগ কামধেনু, সুগন্ধি চন্দন বিলেপন॥
শ্রবণ উপর দেশে, হেমের কলিকা ভাসে, কিঞ্চিৎ কম্পিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিদ্যুৎ রাজে, পরিহরি চপলতা দোষে॥
বালা অতি কৃশোদরী, ভার দুই কুচগিরি, নিবিড় নিতম্বে অতি ভার।
বদন ঈষৎ মেলে, কুঞ্জর উগারি গেলে, জাগরণে স্বপন প্রকার॥
বামার ঈষৎ হাসে, গগন মণ্ডল ভাসে, দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলী।
বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে, কত কত শত ধায় অলি॥
দুই করে শোভে শঙ্খ, ভুবনে উপমা রঙ্ক, গলায় দুলিছে হেমহার॥
সুবর্ণ কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলী খেলে, তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার॥"

'চণ্ডীকাব্য' ও অনেক গুলি খণ্ডকবিতা ছাড়া মুকুন্দরামের জগন্নাথমঙ্গল নামেও একখানি কাব্য আছে। কিন্তু আমরা অতিশৈশবে, গুরুমহাশয়ের পাঠশালে, 'শিশুবোধকে' যে অমৃতময়ী 'গঙ্গাবন্দনা' ঈষৎ সুরসংযোগে পাঠ

করিতে শুনিয়াছি, বাল্যের সেই মধুময়ী স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য, কবি-কঙ্কণের সেই সরল, মধুর, ভক্তিভাবপূর্ণ রচনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম ঃ—

"বন্দ মাতা সুরধনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উপাদান, দ্রবময়ী তব নাম, সুরাসুর নরের জননী॥
ব্রহ্মকমণ্ডুলে বাস, আছিলা ব্রহ্মার পাশ, পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী।
জীবে দেখি দুরাশয়, নাশিবারে ভবভয়, অবনী আইলা সুরেশ্বরী॥
সূর্য্যবংশে ভগীরথ, আগে দেখাইয়া পথ, তোমারে আনিল মহীতলে।
মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি, সকায় বৈকুণ্ঠপুরী চলে॥
সগররাজার বংশ, ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস, অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশিয়া তব জলে, সকায় বৈকুণ্ঠে চলে, সবে হয়ে চতুর্ভুজ বেশ॥
নির্ম্মল তোমার জল, ভক্ষণে অশেষ ফল, বিধিবিষ্ণু চিনিতে না পারে।
শিরে ধরি শূলপাণি, আপনারে ধন্য মানি, এ মহিমা কে বর্ণিতে পারে॥"

কবির এ অপূর্ব্ব গঙ্গাবন্দনা—ভক্তির 'পরশমণি'। এ পরশমণির পুণ্য-স্পর্শে, লোহাও সোনা হয়। বাঙ্গালী হিন্দুর এ বড় গৌরবের জিনিস। ভক্ত কবি কবিকঙ্কণ, বঙ্গসাহিত্যের আদি মহাকবি,—আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।

কাশীদাস।

ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত—বাঙ্গালী তথা বঙ্গ-পরিবারের যত উপকার করিয়াছে, তত উপকার এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী কবিদ্বারা হয় নাই, ইহা অবিসংবাদী সত্য। কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্র হয়ত কোন অংশে ইহাঁদের অপেক্ষা বড় কবি হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের কাব্যের প্রভাব এমন গভীরভাবে বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনে আধিপত্য করিতে পারে নাই। বাল্মীকি ও ব্যাস যেমন প্রাচীন ভারতের আচার্য্যরূপে সম্পূজিত;—আধুনিক বঙ্গদেশে—বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে—কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাস সেইরূপ সর্ব্বজন-বরেণ্য। ইস্তক পণ্ডিত ও পুরনারী হইতে, নাগাইত পল্লীগ্রামের মুদী ও দোকানদার পর্য্যন্ত,—সমান আগ্রহে—সমান উৎসাহে এই দুই মহাকাব্য পাঠ করিয়া থাকে। এখন বরং সে পাঠচর্চ্চার বিরতি দেখা যায়, কিন্তু বেশ মনে আছে, বাল্যকালে আমরা শুনিয়াছি, বেলা দ্বিপ্রহরের আহারান্তে. পাড়ার বর্ষীয়সী পিসী বা ঠান্‌দিদি সুর করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত পড়িতেছেন, আর ছেলে মেয়ে বৌ ঝি প্রবীণা বৃদ্ধা—একযোগে—সমান আগ্রহে সেই অমৃতময়ী 'কথা' শুনিয়া যাইতেছে। আবার ওদিকে, পূজার মণ্ডপে বা কোন আড়তদারের আড়তে—কোন কথক ঠাকুর বা মাতব্বর প্রতিবাসী ঐ ভাবে সুর করিয়া ঐ দুই মহাগ্রন্থের

আবৃত্তি করিতেছেন, আর বহুলোক একত্র হইয়া নিবিষ্টমনে তাহা শুনিতেছে। কথকতার প্রচলনেও, ঐ দুই বিরাট্ গ্রন্থের ভাব, লোকের হৃদয়ের উপর কম আধিপত্য বিস্তার করে নাই। কথক মহাশয় রামায়ণ মহাভারতের এক একটি বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া এক একটি পালা প্রস্তুত করেন, আর তাহা সুরতানলয় সংযোগে গান করিয়া অতি অল্পেই শ্রোতাকে মোহিত করিয়া থাকেন। এক সময়ে পল্লীগ্রামের জনসাধারণের শিক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিল—এই কথকতা। পুরাণব্যাখ্যার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইতেও কথকের প্রতিপত্তি-প্রসার অধিক। এ সম্বন্ধে, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির গ্রন্থ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও এখানে তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের পোষকতা করিতেছি ঃ—

"কথকতা অল্প পরিমাণে বাঙ্গালাভাষার পুষ্টিসাধন করে নাই। সাবিত্রী-উপাখ্যান নামক সুকাব্যের রচয়িতা প্রিয়বন্ধু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত "সেই একদিন আর এই একাদন" প্রস্তাবে বলেন,—"কথকতা বাঙ্গালী জাতির বিনোদকর উপায় সমূহের মধ্যে প্রধান উপায়। কথক বেদীতে বসিয়া স্বরসংযোগে কান্ত কোমল পদাবলীতে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের বিনোদসুখ ও ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি, এক কালে উভয়ই সম্পাদন করেন। কথকতার প্রথম স্রষ্টা ও উন্নতিকারকেরা সুকবি ছিলেন। প্রভাত বর্ণন, মধ্যাহ্ন-বর্ণন, সন্ধ্যাবর্ণন, নিশীথবর্ণন, যুদ্ধ-বর্ণন প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণনার যে সকল বাক্যাবলী গ্রথিত আছে, তাহা অতি মনোহর ও বিস্ময়কর। বর্ণনাকালে বর্ণনীয় বিষয় শ্রোতৃবর্গের নেত্র-সম্মুখে যেন মূর্ত্তিমান্ করিয়া দেওয়া হয়। কথকতা শ্রবণে অনুপম আনন্দ ও পুত্রশোক নিবারণ হয়। কথকতায় অতি পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় দ্রবীভূত ও অশ্রুবিগলিত হয়। উহা এত উৎকৃষ্ট যে, ইতিপূর্ব্বে লর্ড বিশপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কথকতার প্রণালীতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে। শুনিয়াছি, কোন কোন মিশনরী নাকি কথকতার রীতিতে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছে।

"এস্থলে কথকতার কিরূপে প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একদা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী নিবাসী

গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় এক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। প্রাতে যথারীতি পাঠ হইত; বৈকালে শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখা করিতেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্য অন্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিকটে একস্থানে রামায়ণ গান হইতেছে; সেইখানেই সকল লোক যাইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, 'আচ্ছা সকলকে বলিবে, কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত-গান শুনিতে পাইবে।' তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি গায়ক ও কবি ছিলেন। রাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যার অংশকে তাঁহার স্বকপোল উদ্ভাবিত কথকতার রীতিতে পরিণত করিয়া রাখিলেন, পরদিন বৈকালে নূতন রীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন। চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বরসংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত পদাবলী শুনিয়া, লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন ধ্রুবচরিত, প্রহ্লাদচরিত, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশসকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি। ক্রমে রামায়ণ মহাভারতেরও কথাগ্রন্থ বিরচিত হয়। গঙ্গাধর শিরোমণির পর কৃষ্ণহরি শিরোমণি কথকতাকে অনেক পল্লবিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন। গোবরডাঙ্গানিবাসী রামধন শিরোমণিও তাহাতে অনেক অঙ্গরাগ দিয়াছেন।"*

ফলতঃ এই কথকতার সাহায্যে এক সময়ে রামায়ণ মহাভারতের অনেক বিষয় অতি সহজে শ্রোতার হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে এখনও মুদ্রাঙ্কিত হয়। যাই হউক, সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই দুই ভাষাগ্রন্থ—বঙ্গবাসীর যে উপকার সাধন করিয়াছে,—যে সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, ত্যাগ, দয়া, ধর্ম্মশিক্ষা ও ঈশ্বরবিশ্বাস আনিয়া দিয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। সে হিসাবে, এই দুই গ্রন্থ—কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত—বাঙ্গালীর 'জাতীয় গ্রন্থ।' কেননা, মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা।

মহাভারত ত সকলের বোধগম্য নয়?—কালে ভদ্রে, পোষাকী হিসাবে দু দশ জন পণ্ডিত মহলেই তাহা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এই যে সাত কোটি বাঙ্গালী,—এ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এত লোকের আত্মার আহার যোগাইয়া আসিতেছে—কে?—মুক্তকণ্ঠে বলিব, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস। এই দুই মহাত্মাই বাঙ্গালীর মান, বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর নীতি এতকাল ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য, এখন রামায়ণ মহাভারতের নানা শাখা—নানা অনুবাদ চারিদিক হইতে প্রচারিত হইতেছে। পূর্ব্বে কিন্তু ঐ দুইখানি মাত্র গ্রন্থ বাঙ্গালীর সম্বল ছিল। এ হিসাবে, বাল্মীকি ও ব্যাসের ন্যায় এই দুই মহাত্মা বাঙ্গালীর চির-পূজ্য। অথবা কথাটা ঘুরাইয়া এ ভাবেও বলা চলে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস—বঙ্গের বাল্মীকি ও ব্যাস। ইহাঁদের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা—বঙ্গসন্তানের জন্ম জন্ম থাকিবে,—থাকাই স্বাভাবিক। মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় কবিও একদিন এই দুই মহাত্মার পদতলে বসিয়া কাব্যশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের আচার্য্যস্থানীয়, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেরই ঐ দুই গ্রন্থের অনেক স্থল কণ্ঠস্থও আছে।

কৃত্তিবাস অপেক্ষাও কাশীরামের গুণপনা এক হিসাবে অধিক; কেন না, তিনি অষ্টাদশ পর্ব্বের বিরাট্ গ্রন্থ খানা একাই সমাধা করিয়াছেন। রামায়ণ সাত কাণ্ড মাত্র। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, অত বড় একখানি গ্রন্থ যিনি একাকী ছন্দোবন্ধে রচনা করিতে পারেন, তাঁহার ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, গবেষণা, জ্ঞান, ভক্তি, সর্ব্বোপরি ভগবদ্-কৃপা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রকৃতই ঈশ্বরের কৃপা না হইলে, এমন শক্তি কেহ লাভ করিতে পারে না। এ শ্রেণীর মহাত্মা, সাহিত্যকে যেন বিশেষ ব্রতস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাহার পালন ও উদ্‌যাপনে জীবনসঙ্কল্প করেন।—চিত্তের এরূপ দৃঢ়তা ও একাগ্রতা দেখিয়া ভক্তের ভগবান্ তাঁহার সহায় হন,—সাধারণ্যে সে অলক্ষ্যশক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না,—স্থূলবুদ্ধি মূর্খের ন্যায় ভগবদ্বিশ্বাসে অবিশ্বাসী হইয়া, কর্ম্মীর নানারূপ ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকে, এবং সমধর্ম্মাদের সহিত একযোগে সেই মহাত্মার মানের খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পায়। 'যাদৃশী ভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য যদি তাহারা আত্মজীবনে

উপলব্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে বুঝিত, সাধনাবলে মানুষ কতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বৰ্দ্ধমান-রাজ—কত পণ্ডিতের সাহায্যে, কত অর্থব্যয়ে, কত কাল ধরিয়া যে কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন,—কাশীরাম দাসের মত একজন নিঃস্ব ও সামান্য ব্যক্তি একাকী তাহা কিরূপে সম্পন্ন করিলেন,—ভাবিবার বিষয় নহে কি? এবং এই ভাবনার মূলে একমাত্র ভগবৎ-কৃপার কথাই আসিয়া পড়ে না কি?

কাহারও কাহারও মতে কাশীরাম একা এই ভারতগ্রন্থ রচনা করেন নাই, অন্যান্য কবিরও ইহাতে সহায়তা ছিল। তাঁহারা নিম্নের এই পদটি আবৃত্তি করিয়াও ইহা প্রতিপন্ন করিতে চান,—'আদি, সভা, বন ও বিরাটের কত দূর। ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥'—"কথিত আছে যে মৃত্যুর পূৰ্ব্বে তিনি প্রারব্ধ গ্রন্থের পরিসমাপনের নিমিত্ত নিজ জামাতার উপর ভার দিয়া যান। জামাতাও শ্বশুরের আদেশ অনুসারে সমস্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেন, কিন্তু স্বকায় কবিকীৰ্ত্তিলাভের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রন্থের সৰ্ব্বত্রই শ্বশুরের নাম সমেতই ভণিতা দিয়া যান, সুতরাং সমগ্র মহাভারতই কাশীরাম বিরচিত বলিয়া সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ হয়।—কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা স্থির বলা যায় না। ইহার বিশ্বাসযোগ্য কোন মূল নাই—রচনাগত কিছু বৈলক্ষণ্য আছে বটে, কিন্তু এরূপ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না,—যদ্দ্বারা ইহাকে প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সিঙ্গির নিকটবর্ত্তী কোন আত্মীয় অনুগ্রহপূৰ্ব্বক এ বিষয়ে আমাদিগকে অনেকগুলি সংবাদ আনিয়া দিয়াছেন। তিনি সিঙ্গির গ্রামের অনেকের মুখে শুনিয়াছেন যে, "কাশীরাম আদি, সভা, বন ও বিরাটের কিয়দ্দূর লিখিয়া ৺কাশীধাম যাত্রা করেন, সেই জন্যই তিনি উক্ত স্থানের স্বর্গোপমতা প্রকাশার্থ 'ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর' এইরূপ লিখিয়াছেন। 'ঐ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়, ও কবিতার অর্থ এরূপ নহে। যাহা হউক, আমরা কাশীরাম দাসের কবিকীৰ্ত্তির অংশ অপরকে দিতে সম্মত নহি।"*

---

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' অভিধানে, বহু গবেষণা পূর্ব্বক মহাভারতের কবিগণের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু বলেন, "বহু কবি যেমন রামায়ণ বা রামচরিত অবলম্বন করিয়া বৃহৎ বা খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বহু কবি ভারত-কথা বা মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয় লইয়া বহু কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তন্মধ্যে বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র, পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী * * * প্রভৃতি ৩১ জন কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভাবে, ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত খানিই আপাততঃ সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া মনে করি। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহের সময় কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, বঙ্গভাষারও সুবর্ণযোগ। তাঁহারই সময়ে (সম্ভবতঃ তাঁহারই, আদেশে) বিজয় পণ্ডিত 'বিজয় পাণ্ডব কথা' বা 'ভারত পাঁচালী—প্রণয়ন করেন। * * * কবীন্দ্র পরমেশ্বরও একজন মহাভারতের অনুবাদ রচক প্রাচীন কবি। ইহাঁর পরিচয় সম্বন্ধে জানা যায়, ইনি সম্রাট্ হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর উৎসাহে মহাভারতের অনুবাদ প্রচার করেন। এই জন্য ইহাঁর মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। * * * শ্রীকর নন্দী, পরাগল খাঁর পুত্র সেনাপতি ছুটি খাঁর আদেশে মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করেন। * * * নিত্যানন্দ ঘোষ একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ করেন।" * * *

শেষোক্ত কবির এই মহাভারতও নাকি কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত। কিন্তু কথাটা আমাদের কাণে নূতন গেল। যাই হউক, নগেন্দ্র বাবু উপসংহারে স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন,—"কবি কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মহাভারত অনুবাদকগণ অপেক্ষা কাশীরাম কিঞ্চিৎ আধুনিক হইলেও আজ বাঙ্গালী হিন্দু নরনারীর গৃহে গৃহে কাশীদাস কৃত মহাভারতই ভক্তিপূজ্য নিত্যপাঠ্য আদরের সামগ্রী।"

বড় ক্ষোভ, স্বনামখ্যাত মিশনরীপণ্ডিত এবং সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সাহিত্য-অধ্যাপক স্বর্গীয় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—কাশীরামের এই মহাভারতের বহু স্থান সংস্কারব্যপদেশে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার

ফলে, 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া পড়িয়াছে,—কোন পাঠটি ঠিক কাশীরামের, সহজে বুঝিয়া উঠিবার যো নাই। শুধু কাশীরাম নহেন,—কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবির কাব্যও ইনি এইরূপ গড়িয়া পিটিয়া নিজের মনোমত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বাজারে তাহারই প্রচলন অধিক। বলা বাহুল্য, আমরা এরূপ সংস্কার বা সম্পাদনের পক্ষপাতী নহি,—ঘোর বিরোধী। কেননা, মৃত কবির কাব্য বা জীবন-আলেখ্য, তুমি আমি সংশোধন করিবার কে? তাহাতে ত মৌলিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ই,—উপরন্তু এমন সব আন্দাজী ও বেখাপ রচনা তাহাতে স্থান পায় যে, প্রাচীন সাহিত্যের উপাসক ও ভক্তগণ তাহাতে কষ্ট অনুভব করে।

কাশীরামের জন্মস্থান—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন—সিঙ্গিগ্রাম। কাশীরাম কায়স্থ। 'দেব'ই তাঁহাদের উপাধি, কিন্তু ভক্ত-কবি বৈষ্ণবভক্তির স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও সৌজন্যবশে, আপনাকে দীন 'দাস'-ভাবেই বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কাশীরামের পিতৃদেবের নাম কমলাকান্ত। অনুমান সন ৯৬৫ সালে মহাত্মা কাশীরাম জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০০০ সালে মহাভারত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই অনুমান কতদূর সত্য, তাহা এখনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার বিষয়। কেননা, ইহার ঠিক ঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। কত বৎসর ধরিয়া কবি এই ভারত-রচনা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহারও কোন নিশ্চিত সংবাদ জানিবার উপায় নাই।

যাই হোক, এই ভাগ্যবান্ কায়স্থ-বংশটিতে বাগ্‌দেবীর বিশেষ কৃপা হইয়াছিল। কেননা, "কাশীদাসেরা তিন ভ্রাতাই বৈষ্ণব ও কাব্যামোদী ছিলেন। কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক ভাগবতের একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেন, ঐ গ্রন্থে প্রাঞ্জল ভাষায় হরিলীলা বর্ণিত হইয়াছে। গদাধর দাস ১৫৬৪ শকে 'জগন্নাথ মঙ্গল' নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থে কাশীরামের মহাভারত প্রণয়নের কথা উল্লিখিত আছে। গদাধর লিখিয়াছেন,—

"দ্বিতীয় শ্রীকাশীরাম ভক্ত ভগবান্। রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ॥
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস। জগৎমঙ্গল গ্রন্থ করিলা প্রকাশ॥"

সুতরাং জগৎমঙ্গলের পূর্ব্বে মহাভারত রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।*

যাই হউক, কাশীরাম,—কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের বহু পরে—শতাব্দীরও অধিককাল পরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার রচনা দেখিয়াও তাহা বুঝা যায়। চণ্ডীকাব্যে বা রামায়ণে যে সকল কথার অপভ্রংশ বা ভাষার অস্পষ্টতা আছে, কাশীরামের ভারতে তাহা নাই,—ভারতের ভাষা অনেকাংশে মার্জ্জিত, সুস্পষ্ট ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। এ সময়ে অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাহারও কাহারও মতে কাশীরাম সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন,—কেবল পণ্ডিতের মুখে পুরাণ-ব্যাখ্যা ও কথকতা (!) শুনিয়া তাঁহার মহাভারত রচনা। কুতার্কিকের কূট তর্কের অনুরোধে এ কথা মানিয়া লইলেও ইহাতে ভক্ত কবির মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পায়। কেন না, অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের ন্যায় অতবড় এক খানা মহাপুরাণ বা পঞ্চম বেদ, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র শুনিয়া অমন সরল মনোহরভাষায় ছন্দোবন্ধে বিবৃত করিতে পারেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই দৈববলসম্পন্ন;—শত সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিত অপেক্ষা আমরা তাঁহার প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত। কেন না, শুধু পণ্ডিত কেবল পড়িয়াছেন ও ভাষাশিক্ষা করিয়াছেন মাত্র,—ঈশ্বরদত্ত রচনা শক্তির অধিকারী তিনি হন নাই। বলা বাহুল্য, ভাগ্যবান্ কবি সংস্কৃতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন;—পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ মহাশয়েরা তাহা অনেক রকমে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

তবে ভক্তকবি যে সর্ব্বত্রই আপন দীনতা ও অক্ষমতা জানাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভক্তি ও বিনয়ের অভিব্যক্তিমাত্র;—

"ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত। কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

"ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥"

কাশীরামের মত ভক্ত কবি যে, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে গুরুপদে আসীন করিয়া ওরূপ বিনয়পূর্ণ ভাষায় তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য "কাশীরাম দাস মূল সংস্কৃত মহাভারতের অবিকল

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।'

অনুবাদ করেন নাই; আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ভাবানুবাদ করিয়াছেন মাত্র; এই জন্য কবি সংস্কৃত জানিতেন না, এই মত প্রচলিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থের অনেক স্থলে ভূরি ভূরি বিষয়ের নূতনরূপ যোজনাও করিয়াছেন।"*

কাশীরামের রচনা ও কবিত্বশক্তি সম্বন্ধেও নানাজনের নানা মত। কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস হইতে তাঁহার কবিত্ব খাটো, ইহাই অনেকে প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। কাশীরামের তুলনা কাশীরাম, কৃত্তিবাসের তুলনা কৃত্তিবাস, এবং কবিকঙ্কণের তুলনা কবিকঙ্কণ। আপন আপন কেন্দ্রে সকলেই বড়; উহার ঠিক তুলনা হয় না। কবির ভাষায় বলিলে বলিতে হয়,—'তোমার তুলনা তুমি।'

কাব্যরসজ্ঞ পাঠক কবির নিম্নের উদ্ধৃত অংশগুলি একটু নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিবেন এবং মনে মনেই স্থির করিবেন, ভাগ্যবান্ কাশীরাম কোন্ দৈবশক্তির প্রেরণায় ছন্দোবন্ধে এরূপ সুন্দর কবিতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—

লক্ষ্যভেদোদ্যত মহাবীর গাণ্ডীবীর চিত্রটিতে প্রথম এই পরিচয় লউন ;—

"দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি। পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম, তনু শ্যাম, নীলোৎপল আভা। মুখরুচি, কত শুচি, করিয়াছে শোভা।
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব, অধর রাতুল। খগরাজ, পায় লাজ, নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু, যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর। গজস্কন্ধ, গতিমন্দ, মত্ত করিকর॥
ভুজযুগে, নিন্দে নাগে, আজানুলম্বিত। করিকর, যুগ্মবর, জানু সুবলিত॥
মুকপাটা, দন্তছটা, জিনিয়া দামিনী। দেখি ইহা, ধৈর্য্য-হিয়া, নহেক কামিনী॥
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য, ঢাকিয়াছে মেঘে। অগ্নি-অংশু, যেন পাংশু, আচ্ছাদিত লাগে।

নারায়ণের 'মোহিনী বেশ' কবি কি ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করুন্ ঃ—

"হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ। ধীরে ধীরে উপনীত হৈলা সেই দেশ॥
রূপে আলো করিলেক চতুর্দ্দশ পুর। সুবর্ণে রচিত তাঁর চরণে নূপুর॥

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।"

কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি। যে চরণে জন্মিলেন গঙ্গা ভাগীরথী॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ। লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ॥
যুগ্ম উরু রম্ভাতরু চারু দুই হাত। মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ॥
নাভিপদ্ম বিধিসদ্ম সৃষ্ট যার শ্রেষ্ঠ। কণ্ঠকম্বু যুগ শম্ভু বক্ষঃস্থলে হেট॥
ভুজসম ভুজঙ্গম কি দিব তুলনা। সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর করের কঙ্কণা॥
পদ্মবর জিনি কর চম্পক অঙ্গুলি। নখবৃন্দ জিনি ইন্দু-প্রভা গুণশালী॥
কোটি কাম জিনি শ্যাম বদন পঙ্কজ। মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড়-অগ্রজ॥
নাসিকায় লজ্জা পায় শুক-চঞ্চুখানি। নেত্রদ্বয় শোভা হয় নীলপদ্ম জিনি॥
পুষ্পচাপ হরে দাপ ভ্রূদ্বয়-ভঙ্গিমা। গলে প্রাতঃ দিননাথ দিতে নহে সীমা॥
পীতবাস করে হ্রাস স্থির সৌদামিনী। দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি॥
দীর্ঘকেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী নিরমাণ। আচম্বিত উপনীত সভা বিদ্যমান॥"

ভীমের বীরত্ব বর্ণনার সহিত কবির উপমা-প্রয়োগের পারিপাট্য কি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী, পাঠ করুন ;—

"মুখ তুলি বৃকোদর যেই ভিতে চায়। পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়॥
সিন্ধুজল মন্থে যেন পর্ব্বত মন্দর। পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র-মণ্ডলে। দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র। খেদাড়িয়া লইয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি। দুই দিকে তট যেন মধ্যে হয় নদী॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা। খরস্রোতে বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা॥"

কবির দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণনায় ভারতচন্দ্রকে মনে পড়ে। এক একবার মনে হয়, ভারতের ভাষার ছাঁচ কাশীরাম হইতে গৃহীত। পূর্ব্বপুরুষের দান স্বরূপ, কাশীরাম ভারতচন্দ্রের জন্যই এই ভাষা রাখিয়াছিলেন।—যাই হউক, এই সকল বর্ণনা পাঠে চমৎকৃত হইতে হয়।—তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্গের একটি অজ্ঞাত ক্ষুদ্র পল্লীতে, ভক্তি, ভাব ও ভাষার কি অপূর্ব্ব গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম হইয়া গিয়াছে, নিবিষ্ট মনে চিন্তা করুন। এখনকার মত ছাপাখানা ও খবরের কাগজ তখন ছিল না, লোক চলাচলের এমন সুযোগ তখন হয় নাই, একস্থানে বহু লোকপূর্ণ বিরাট্ সভায় কবিকে পুষ্পমাল্য পরাইয়া ও জয়-

ধ্বনি দিয়া উৎসাহিত করার প্রথাও তখন প্রচলিত ছিল না,—প্রকৃতির পূর্ণ নীরবতার মাঝে, লোক-চক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচরে, সাধকরূপী কবি, নীরবে, আপন সাধন পথে অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে এমনি সব অপূর্ব্ব কাব্য-আলেখ্য অঙ্কিত করিতেছিলেন ;—ভাবুন দেখি, কি ধৈর্য্য, কি গাম্ভীর্য্য, কি ভোগলালসারহিত একনিষ্ঠ কর্ম্মযোগ! 'সাহিত্যের কর্ম্মযোগ' যদি বলিতে হয়, ত তাহা ইহারই নাম। নহিলে আধুনিক কালের নিজের প্রকাশিত, বহুস্থান প্রচারিত খবরের কাগজে, নিজের নামে রচিত বা প্রকাশিত খানকত ব্যবসাদারী বইএর বিজ্ঞাপন প্রচার উদ্দেশ্যে, নিজের জয়-ঢাক নিজে অথবা অনুগত কর্ম্মচারী দ্বারা বাজাইলে, তাহা 'কর্ম্মযোগ' হয় না, কিংবা সেই পেসাদার কাগজের মালিক মানীর মান হরণে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়া আত্ম-প্রশংসারূপ আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া নিজেই নিজকে কৌশলে 'মহাত্মা' 'মহাপুরুষ' 'স্বদেশহিতৈষী' 'সাহিত্য গুরু' প্রভৃতি উচ্চ বিশেষণে ভূষিত করিলে লোকের পূজা পায় না ;—ভদ্র ও সাধু ব্যক্তিমাত্রেই তাহা দেখিয়া মনে মনে হাসেন এবং দেশের পরিণাম স্মরণ করিয়া,—লোক-শিক্ষক 'লিডারের' নৈতিক উন্নতি দেখিয়া, বিরলে অশ্রুপাত করেন।

দ্রৌপদীর সেই রূপ-বর্ণনাটি এই ;—

"পূর্ণ শরদিন্দু, হেরি জীব বন্ধু, বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিল ফুল নাসা, হেরি মুনিমনসুখ॥
নেত্র যুগ্ম মীন, দেখিয়া হরিণ, লাজে দুহে গেল বন॥
চারু ভ্রু উন্নত, দেখিয়া মন্মথ, নিন্দে নিজ শরাসন॥
সুপর্ণ সোদর, নিন্দিত অধর, পূরব অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী, সিন্দুর চাঁচর জালে॥
তড়িত মণ্ডল, দিগন্তে কুন্তল, হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
"দেখি কুচ-কুম্ভ, লজ্জায়ে দাড়িম্ব, হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু, অগাধ অম্বুধি মাঝে॥
মাঝে দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন, কেশরী পড়িল লাজে॥"

ফলতঃ, উদ্ধৃত এই অংশটি পড়িয়া ভারতচন্দ্র ও কাশীরাম পাশাপাশি রাখিলে, হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না যে, কোন্‌টি কার রচনা। এরূপ রচনার ঐক্য,—ভাষাতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয়।

পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ভক্ত-চূড়ামণি মহাত্মা তুলসীরাম হিন্দী রামায়ণ প্রচারে, দিক্‌দিগন্তে রাম-নামের মহিমা প্রচার করিয়া ধন্য ও চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, বঙ্গেও তেমনি কৃত্তিবাস ও কাশীদাস ভাষাকাব্যে রামায়ণ-মহাভারতের অমৃতময়ী কথার প্রচার করিয়া আপামর সাধারণের বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন। যে দেবদুর্লভ রাম-চরিত ও লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতা দেবীর কথা,—শ্রীকৃষ্ণ-পরিচালিত যে ধর্ম্মপ্রাণ পঞ্চপাণ্ডব, মহীয়সী কুন্তী ও পাঞ্চালনন্দিনীর অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার কাহিনী,—পড়িয়া ও যাত্রা-কথকতায় শুনিয়া, আপামর সাধারণ ধর্ম্মজীবন লাভ করে,—চরিত্রগঠন করিতে সক্ষম হয়, তাহার প্রভাব অস্বীকার করা মহাধৃষ্টতা। তাই এক একবার আমার মনে হয়, একি কবির কাব্যের গুণ,—না রাম-কৃষ্ণের নামের মহিমা ?

কাশীরামের 'স্বপ্নপর্ব্ব', 'জলপর্ব্ব', ও 'নলোপাখ্যান' নামে অন্য তিনখানি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই, কেননা সাহিত্যে উহার বিশেষ স্থান নাই, বোধ হয় এগুলি কবির অপরিণত বয়সের লেখা।

কাশীরামের পর ভারতচন্দ্রের কাল। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে, মহাকবি ঘনরাম প্রণীত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কথা' মনে উদিত হয়। ফলতঃ ঘনরামের প্রভাবও এক সময়ে সমাজে যথেষ্ট ছিল। তাঁহার 'ধর্ম্মমঙ্গলের গান' এক সময়ে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। গ্রন্থখানির রচনা ও আখ্যান-ভাগ মৌলিক, চরিত্র-চিত্রণও বিশেষ প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে কবিত্বের সৌরভে মন মোহিত হয়। কিন্তু গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ, আদ্যন্ত পড়িতে একটু ধৈর্য্যধারণ করিতে হয়।

ধর্ম্মমঙ্গলেরও মেরুদণ্ড,—শক্তি-পূজা ও শক্তি-মাহাত্ম্য প্রচার। ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত দেবী-কৃপার পরিচয়ে গ্রন্থখানি ভক্ত-সমাজে আদৃত। পাঠকসমাজে ধর্ম্মমঙ্গল তেমন আদৃত হয় নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। অথবা এখনকার 'শিক্ষিত সমাজ' এ সব রত্নের আদর করিতে জানে না।

ধর্ম্মমঙ্গলের রচনার একটু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

ইঙ্গিতে অম্বিকা হইল ত্রিলোক-মোহিনী। যেই বেশে মহেশে মোহিলা চক্রপাণি॥
কামরূপ দেখিয়া কামিনী-রূপছটা। বিগলিত বাঘছাল ভূমে লোটে জটা॥
ধর্ ধর্ বলিতে মোহিনী দিল ধাই। খসিল অক্ষয় তেজ লজ্জিত শিবাই॥
হৈমবতী হইল হেন মোহিনীর বেশ। দেখে শূন্যে ত্রাসযুক্ত যত ত্রিদিবেশ॥
রতনে রঞ্জিত যত পদাঙ্গুলি সব। রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব॥
রাম-রম্ভা যিনি উরু গুরু আনিতম্ব। যেরূপ শুনিয়া মতি মজাইল শুম্ভ॥"

ঘনরামের নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়। ১৬০১ শকে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী—মাতার নাম সীতা দেবী।

শক্তি-মাহাত্ম্যের ন্যায় শিবমাহাত্ম্য বিষয়ক গ্রন্থও এই সময়ে রচিত হয়। গ্রন্থখানির নাম 'শিবায়ন'। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'শিবায়নের' প্রণেতা। ইহাঁর রচিত 'সত্যপীর'ও সে সময়ের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'সত্যপীরের গান' এখনও হিন্দু-মুসলমান সমান আগ্রহে শুনিয়া থাকেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই সুপ্রসিদ্ধ 'মনসার ভাসান' বিরচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রণেতা যে কত, তাহার স্থিরতা নাই। অবশ্য, গ্রন্থের পাঠ ভিন্ন ভিন্ন এবং রচনাও নানা প্রকার। তবে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ঐ এক—বেহুলা ও লখিন্দরের জীবনোপাখ্যান। কবি কেতকানন্দ ও ক্ষেমানন্দ উভয়ে এক যোগে যে 'মনসার ভাসান' খানি রচনা করেন, সেই খানিই উৎকৃষ্ট। 'ভাসান' রচয়িতা হিসাবে ঐ দুই কবিরই প্রসিদ্ধি অধিক।

অতঃপর বঙ্গসাহিত্যে যে দুই জন ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল,—মহাত্মা রামপ্রসাদ ও মহাকবি ভারতচন্দ্রের যে বিজয়পতাকা বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উড্ডীন হইয়াছিল, এইবার সেই দুই শক্তিশালী পুরুষের সম্বন্ধে,—বিশেষভাবে কিছু আলোচনা করিব।

শ্রীরামপ্রসাদ।

মা-নামের পুণ্যপ্রভাব যিনি জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই রামপ্রসাদকে বুঝিবেন। মা-মন্ত্রের শক্তি যিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই মায়ের ছেলে—মুক্ত মহাপুরুষ রামপ্রসাদকে চিনিবেন। মা-রব শ্রবণেই যাঁর চোখে জল আসে, গায়ে কাঁটা দেয়, তিনিই সেই জগদম্বার মানসপুত্র—অথবা মহামায়ার 'স্বগণের' সিদ্ধ—একটি 'ভাবের গণ'—কিংবা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একটি—সোনার মানুষকে ধ্যানের চক্ষুতে দেখিয়া জীবন সার্থক করিবেন।

নিত্যসিদ্ধ ভাবের মানুষের বিশেষণ,—বুঝি ভাষায় আজিও সৃষ্ট হয় নাই, তাই মহাত্মা রামপ্রসাদকে—লোকে ভক্ত, ভাবুক, সিদ্ধ, সাধক, কবি প্রভৃতি মানবীয় উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষের ঈষৎ মহিমাও যিনি জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ঐ মানবীয় উপাধি দিয়া মনের পিপাসা মিটাইতে পারেন না। তাই তাঁহাকে, মহামায়ার 'স্বগণের' একটি 'গণ'-স্বরূপ নির্ণয় করিয়া উদ্দেশে তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ভক্তের ভক্তি-অশ্রু ও প্রীতি-পুষ্পই—এই পুষ্পাঞ্জলি।

ধ্যানের ছবি যেমন সম্পূর্ণরূপে তুলিকায় অঙ্কিত হয় না,—মায়ের ছেলে রামপ্রসাদের মহিমাও তেমনি কাগজে কলমে, ঠিক আঁকা যায় না। হউন

তিনি যতবড় লিপিকুশল অথবা শব্দ-চিত্রকর,—কোথাও-না-কোথাও, কিছু-না-কিছু ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। 'ভাবের ঘরে চুরি'—যেমন বিষম কথা, এ শ্রেণীর মুক্তাত্মা মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বলিতে যাওয়ার স্পর্দ্ধাও তেমনি বাতুলতা। তাই অতি-সাবধানী, কোন কোন ভক্ত,—শক্তি-সামর্থ্য থাকিতেও আপন ইষ্টদেবকে আঁকিতে ভীত হন। কাহাকে কাহাকেও এমন বলিতেও শুনিয়াছি,—'কি বলেন, তাঁহার বিষয়ে কি লিখিব ?—পরিষ্কার, সাদা, ধবধপে কাপড়ে খানিকটা কালি ফেলিব মাত্র।' কথাটা এক হিসাবে বড় খাঁটী।

কিন্তু আমরা যে কার্য্যে ব্রতী, তাহাতে কিছু-না-কিছু বলিতেই হইবে। অন্ত কাহারও কথা বলি বা না বলি,—দু'দশটা নাম ছুট-ফাঁক-বাদ দিয়া যাই, সাহিত্যের অঙ্গহানি হইবে না, কিন্তু উপস্থিত পরিচ্ছেদে যে মহাত্মার নামগ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার সহিত সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ও বঙ্গভাষার সুদৃঢ় সম্বন্ধ। বঙ্গভাষার অস্থি, মজ্জা, মেরুদণ্ড—তাঁহার সাধনসিদ্ধ সঙ্গীতে। বাঙ্গালীর সব যাইতে পারে,—কালে হয়ত বাঙ্গালী সব ভুলিতে পারে, কিন্তু তাহার মধুমাখা মা-নাম যাইবে না,—সুধাময় মা-নাম সে ভুলিতে পারিবে না। কেননা, মাতৃস্তনপানের সহিত সে—এ অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে। বিশেষ বাঙ্গালী কাঁদিতে জানে। দুর্ব্বলের কান্না নয়,—মায়ের ছেলে যেমন মাকে না দেখিতে পাইলে কাঁদে, সেই ভাবে ভক্তির অশ্রু ফেলিতে পারে। মা বলিয়া কাঁদিয়া, বুকের-ভার লাঘব করিতে যিনি সর্ব্বাগ্রে শিখাইয়া গিয়াছেন, —সরল, মধুর, মর্ম্মস্পর্শিনী গ্রাম্যভাষায়—সঙ্গীতের সম্মোহন স্বরে মাতৃনাম প্রচার করিয়া যিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন,—মাতৃমন্ত্রের সেই আদিগুরু—মহামুক্তির সেই পরম পথ-প্রদর্শক, মাতৃভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক ও সংস্কারক—মহাত্মা রামপ্রসাদের স্বর্গীয় সঙ্গীতের কথা কিরূপে এড়াইয়া যাই বল ?

সাধক, সিদ্ধ, অথবা সিদ্ধের সিদ্ধ—অনেক মহাত্মাই ত হইয়া গিয়াছেন, অথবা এখনো এক আধজন হইতেছেন, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতি অথবা বাঙ্গালীভাষার উপর তাঁহাদের প্রভাব কতটুকু ? অমন যে বৈষ্ণবমহাজনগণের মধুর পদাবলী,—অমন যে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মনোহর হরিগুণগান,—যাহার ভাবে ভক্তমণ্ডলী গদ-গদ, তাহা ফেলিয়াও শত শত লোক প্রসাদী

সঙ্গীতের দুই এক চরণ শুনিবা মাত্র, এককালে মোহিত ও মন্ত্রমুগ্ধ হয় কেন? এ কি অদ্ভুত আকর্ষণ ও ঐশ্বরিক যোগ! সুরজ্ঞের সুস্বর তানলয় ত দূরের কথা,—সামান্য একজন পথ-ভিখারী অথবা রাতকাণা—একটি পয়সার কাঙ্গালও যদি রাজপথে আপন মনে গাহিয়া যায়,—"মা আমায় ঘুরাবি কত, যেন চোখ-ঢাকা বলদের মত"—দেখিবে, অমনি নিকটে, দূরে—যতদূর সেই স্বর-সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইবে, ততদূর পর্য্যন্ত সমগ্র মানবমণ্ডলী এককালে চমকিত হইয়া উঠে;—সহসা যেন তাহাদের প্রাণের তারে কে ঘা দিয়া দেয়। সুখী হোক্ দুঃখী হোক্, ধনী হোক, দরিদ্র হোক্—সকলেরই প্রাণ নাকি একসুরে বাঁধা, তাই মৃদু অঙ্গুলিস্পর্শোত্থিত বাঁধা-সেতারের সমগ্র তারের এককালীন ঝঙ্কারের ন্যায়—সমগ্র মানবহৃদয় একসঙ্গে বাজিয়া উঠে;—যেন সকলেরই ঘুম ভাঙ্গে, দুঃস্বপ্ন অন্তর্হিত হয়, অবসাদের একটি দীর্ঘ তপ্তশ্বাস বহিতে থাকে। তখন সকলেই যেন জীবনের ঘর্ষণে ব্যথিত হইয়া ঐ 'চোক ঢাকা' বলদের মত অন্তরের অন্তরে বলিতে থাকে,—'হায় মা! এ সংসার-প্রান্তরে আমায় আর কত ঘুরাইবি?'

'জাতীয়' 'জাতীয়' বলিয়া যে একটা কথা আজকাল চারিদিকে ধ্বনিত হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা এই—বাঙ্গালীর এই সমবেত ক্রন্দন। সত্যই বাঙ্গালী কাঁদিতে জানে। দুর্দ্দিনে, দুঃখের নিদারুণ পীড়নেও কাঁদিতে জানে,—আবার ভক্তির অনাবিল রসাস্বাদনে স্ব-স্বরূপকে চিনিতে পারিয়াও কাঁদিতে জানে। যে কবি বা ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ তাঁহার স্বজাতি—জাতি-ভাই-বন্ধুকে মর্ম্মের কথা শুনাইয়া ও আঁতের ব্যথা বুঝাইয়া, এরূপ অতি সহজ উপায়ে কাঁদাইতে বা ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারেন, তিনিই 'জাতীয় কবি।' মহাত্মা রামপ্রসাদ যে বাঙ্গালীর 'জাতীয় কবি' ও বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক, সে পক্ষে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই।—এ ক্রন্দনে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান ঘুচে, বিষয়ীর বিষয়-মদিরা ছুটে, দর্পী ও দাম্ভিকের অহঙ্কার টুটে—সকলেই যেন সমতা প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা রামপ্রসাদ বাঙ্গালীকে এই সরল, স্বাভাবিক ও অতি আন্তরিক কাঁদিবার সুর দিয়া গিয়াছেন,—আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

যেমন ব্যাটারি-স্পর্শে, তাহার বৈদ্যুতিকশক্তিতে, মুমূর্ষুর দেহেও বলসঞ্চার হয়, প্রসাদ-সঙ্গীতের দুইটি চরণ শুনিবামাত্র, অতিবড় দুঃখী ও

নিরাশাগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়েও সেইরূপ আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। তখন নিশ্চয়ই তাহার মনে হয়,—'ভয় কি, আমার মা আছেন,—আমি জগদম্বার সন্তান!'—এমন সান্ত্বনা ও সাহস,—অভয় ও নির্ভর যিনি দিতে পারেন, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।

সান্ত্বনাও ঐ গানে—'আমি কি দুখেরে ডরাই'—অথবা 'এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা-মহেশ্বরী।'—কি অমৃতময়ী দেব-উক্তি! কি গভীর আত্ম-নিমজ্জন ও নির্ভর! শ্রীভগবান্-মুখ-নিঃসৃত গীতার উপদেশও ত এই? তাই কি ভগবান্ নরদেহে আবির্ভূত হইয়া কলির জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন,—'ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবত এক।' সাদা গ্রাম্যকথা জলের মত করিয়া বুঝাইয়া, পণ্ডিত ও পুরনারীর বুঝিবার সমান অধিকার দিয়া, সমগ্র শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া, সঙ্গীতে যিনি এমন তত্ত্বকথার প্রচার করিতে পারেন, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।—হায় প্রসাদ!

তুমি রামের 'প্রসাদ', কি মায়ের 'প্রসাদ', তাও ঠিক বুঝিলাম না। অথবা যে রাম, সেই মা—কি যে, তা তুমিই জান। রামনামের মহিমাই কি এই? রামপ্রসাদ হইতে রাজা রামকৃষ্ণ,—শেষ সেই কলিকলুষনাশন পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, সকলেরই প্রাণ কি ঐ এক-সুরেই বাঁধা? মা বলিতে অজ্ঞান, মা-নামেই কাঁদিয়া আকুল। সরল আব্দারে ঠিক যেন পাঁচবছরের শিশু! কে তোমরা? মায়ের 'গণ', প্রতিনিধি, অথবা স্বয়ং মা—ঐ মূর্ত্তিতে?

শুনিয়াছি, তুমি রাজা রামকৃষ্ণ—রাজভোগ তুচ্ছ করিয়া জগদম্বার চরণে কেবল মা মা করিয়া কাঁদিয়াছিলে; হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গাহিয়াছিলে,—

"গো আনন্দময়ী হোয়ে আমায় নিরানন্দ করোনা।
(ওমা) ও দুটি চরণ, বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না॥
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বল না।
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চ'লে, মনে ছিল এই বাসনা,
অকূল পাথারে, ডুবাবি আমারে, (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না॥
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুখরাশি গেল না,
এবার যদি মরি, ও হর-সুন্দরি, তোর দুর্গানাম কেউ আর লবে না॥"

তুমি প্রসাদ,—তুমি ত 'লক্ষ উকীল' খাড়া করিয়া সওয়াল জবাবে, মার কাছ থেকে একরূপ জোর ক'রে মুক্তির চাবি কাড়িয়া লইয়াছিলে;—সেই পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া কি বাঙ্গালী তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিবে? পারে যদি—তোমার আশীর্ব্বাদ, আর মার কৃপা।

আর তুমি ভক্তের ভগবান্—শ্রীরামকৃষ্ণ!—তোমার অলৌকিক মহিমা,—তোমার ত্যাগ—তোমার দয়া—তোমার ক্ষমা—তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব কথামৃত—তোমার দেবদুর্লভ দিব্যকণ্ঠের মা-মা ধ্বনি,—ধর্ম্মে, সাহিত্যে, সমাজে, সমগ্র সংসারে কি নবীন যুগের অবতারণা করিয়াছে,—ভাবিলেও চোখে জল আসে। হে যুগাবতার! হে দয়াময়! হে অগতির গতি! বলিয়া দাও, বুঝাইয়া দাও, চিনাইয়া দাও,—কে তুমি, কে প্রসাদ, কে রাজা রামকৃষ্ণ! কেননা, তুমিই নিজগুণে একদিন কোন ভক্তকে তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছিলে,—'কেহ বলে আমি রামপ্রসাদ, কেহ বলে আমি রাজা রামকৃষ্ণ।' জানি না প্রভো, তোমার বাক্যের মহিমা; বুঝি না ভগবন্, তোমার এ কথার নিগূঢ় অর্থ! কেননা, তুমি নিজগুণে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করিয়া পতিতের পারের নৌকা আহরণ করিয়া দাও; স্বেচ্ছায় "ব-কল্ মা" লইয়া শরণাগতের সকল ভার গ্রহণ কর। তোমাদের দেববাক্যের অর্থ কে বুঝিবে? কিন্তু সত্য বলিতে কি প্রভু, তোমাকে মায়ের 'গণ' বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারি না,—মনে হয়,—তুমি স্বয়ং সেই মা—ঐ নর-শিবরূপে। এবার বিভূতি লুকাইয়া গুপ্তভাবে আসিয়াছিলে, তাই গুপ্তলীলা করিয়াই গিয়াছ।—আর গিয়াছই বা কোথায়? তোমার শক্তি যে এখন সমগ্র পৃথিবীতে ক্রিয়া করিতেছে? কাহাকে এক কলা, কাহাকে আধকলা, কাহাকে বা সিকিকলা শক্তি দিয়াই যে তুমি লীলাময়,—জীবের অলক্ষ্যে থাকিয়া লীলা করিতেছ? বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে যে তোমার বেদবাক্য অমূল্য 'কথামৃত' রাখিয়া দিয়া গিয়াছ? যোগ্য ভাণ্ডারীর জিম্মায় সে অমৃত রাখিয়া দিয়া, এখন আবার সময় বুঝিয়া ধীরে ধীরে তুমিই তাহা বিলাইতেছ! ত্রিতাপজ্বালা-জর্জ্জরিত মৃতকল্প জীব,—সে সুধাপানে আবার নূতন জীবন পাইতেছে,—সকল সমস্যাপূরণ ও সকল সংশয়ভঞ্জন করিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইতেছে। যোগীশ্বর! তোমার তুলনা তুমি,—ভাষায়ও

তুমি নূতন পথ দেখাইয়াছ। তোমার সবটাই অপূর্ব্ব,—ভাষাও অপূর্ব্ব না হইবে কেন? ভাষার এই এক প্রান্তে তুমি, আর এক প্রান্তে—তোমারই 'গণ'—জগদম্বার সন্তান—ভক্তকুলচূড়ামণি—শ্রীরামপ্রসাদ।

তাই তুমি দয়াময়, যখন তখন প্রসাদেরই মার-নাম গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে! বিদ্যাসাগরকে দেখিতে গিয়া প্রথমে তুমি এই গীতটিই গান করিয়াছিলে,—

"কে জানে গো কালী কেমন। ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাসে, লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না, ধ'রবে শশী হ'য়ে বামন।"

ভাগ্যবান্ গৃহীকে পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় গাহিয়াছিলে,—ঐ প্রসাদেরই গান,—

"মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কে ধোর্ত্তে পারে॥
অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তিসারে।
(ওরে) কোটার ভিতর চোর-কুটরী, ভোর হোলে সে লুকাবেরে॥
ষড়্‌দর্শনে দর্শন মিলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি-রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গ্‌বো হাঁড়ী, বুঝনা মন ঠারে-ঠোরে।"

প্রসাদ ঠারে-ঠোরে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে উপদেশ দিতেছেন,—গোলমাল হৈ চৈ তর্ক করিয়া নয়। ঠাকুরও প্রকারান্তরে সেই উপদেশ দিলেন। বিশেষ সন্দিগ্ধচেতা, ন্যায়ের পণ্ডিত যাঁরা,—'ঈশ্বর আছেন কি নাই,'—এই করিয়াই জীবন কাটাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রসাদের এই গীতটি কি গভীর শিক্ষাপ্রদ! যেন পাণ্ডিত্যাভিমানী মোহান্ধজীবকে 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্যই', প্রসাদ আপন মনকে উদ্দেশ করিয়া এ গানটি রচনা করিয়াছিলেন। এ গানের বুঝি আর তুলনা নাই। অথবা তাঁহার প্রত্যেক গানই অদ্ভুত—অপূর্ব্ব—অলৌকিক ভাবুকতার পরিচায়ক। একাধারে এরূপ গভীর ভাবুকতা ও উচ্চতম কবিত্বশক্তির পরিচয়,—সরল সহজ ভাষায় অতলস্পর্শ ভাব,—বঙ্গসাহিত্যের এই কৌস্তুভমণি অনুভবনীয়, বুঝাইবার নয়। কোন দেশের কোন ভাষার আধ্যাত্মিক-সঙ্গীত-সাহিত্যে যে, ইহা অপেক্ষা সুদুর্লভ রত্ন থাকিতে পারে, ইহা আমাদের ধারণাই হয় না।

আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বেদবাক্যের পরিচয়? সে পরিচয় যিনি না লইবেন, তাঁহার মনুষ্যজন্মই বৃথা। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের' ভাগ্যবান্ লিপিকার আমাদেরই আত্মার আহার যোগাইবার জন্য তাঁহার দৈনিক ডায়েরীতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে যাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ—যদৃচ্ছাক্রমে তাহা হইতে এখানে একটু উদ্ধৃত করিলাম;—

"আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা-লেক্‌চার দিও। কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দু'চারটে কথা শিখেই অম্‌নি লেক্‌চার। লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। ভগবান্‌কে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তা হ'লে লোকশিক্ষা দিতে পারে।"

অন্যত্র;—"সব মান্‌তে হয় গো—নিরাকার সাকার সব মান্‌তে হয়। কালীঘরে ধ্যান কোত্তে কোত্তে দেখলুম—রমণী খান্‌কি। বল্লুম, 'মা. তুই এইরূপেও আছিস।' তাই বোলচি, সব মান্‌তে হয়। তিনি কখন্ কিরূপে দেখা দেন, সাম্‌নে আসেন, বলা যায় না। * * * একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত প'ড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি।

চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গেছিলো। একদানা চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল। আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাব্‌চে,—'এবারে এসে পাহাড়টা নিয়ে যাব'।"

বলুন দেখি, এমন সহজ সরল স্বাভাবিক ভাষা,—সত্যের মহিমালোকে উদ্ভাসিত এমন পবিত্র মধুর বাঙ্গালা—নির্ঝরিণীর ধারার ন্যায় এমন নির্ম্মল সুধা, কোন্ যুগে—কোন্ অবতারে আর কাহার শ্রীমুখ হইতে অবিরল ঝর্ ঝর্ ধারে বহিতে দেখিয়াছেন? সর্ব্বশ্রেণীর—সর্ব্বধর্ম্মীর লোক সমান আগ্রহে—সমান উৎসাহে—সমান একনিষ্ঠার সহিত এ 'কথামৃত' পান করেন,—সত্যের আলোকে সত্য-স্বরূপ শ্রীভগবানের সত্ত্বা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন,—ভাব-গঙ্গার স্নিগ্ধ সলিলে স্নান করিয়া ত্রিতাপজ্বালার তীব্র যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পান, ইহাই বুঝি ভগবানের অভিপ্রেত তাই বলিয়াছি, ভক্তিভাবপূর্ণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক প্রান্তে মহাত্মা রামপ্রসাদের দেবসঙ্গীত আর এক প্রান্তে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব 'কথামৃত'—এই দুই যিনি উপভোগ না করিবেন, তিনি বড়ই অভাগা। তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন, সমাজের পদস্থ লোক হইতে পারেন, পার্থিব শক্তিসম্পদ তাঁহার অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যে তাঁহার কিছুই নাই, তথায় তিনি নগণ্য। ঠাকুরের শ্রীমুখের ভাষায় বলিতে হইলে বলিব,—"শকুনি যতই ঊর্দ্ধে উঠুক, তাহার দৃষ্টি ভাগাড়ে—গলিত শবদেহে; কামিনী-কাঞ্চনরূপ শবে।"

সত্যাশ্রিত, সাধনা-সমুদ্ভূত সহজ সরল ভাষার শক্তি রামপ্রসাদ যেমন বুঝিয়াছিলেন,—মাতৃনামামৃত সাধনসঙ্গীতের মাহাত্ম্যও তেমনি তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভাষার এরূপ অলৌকিক সরলতা এবং গভীর ভাবপ্রকাশের এমন সহজ উপায় যেমন তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, তদ্বিরচিত সঙ্গীতের সুর-সংযোজনও তেমনি—কি ততোধিক তাঁহার নিজস্ব। মহাপুরুষ বা প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের সবটাই নাকি নূতন, তাই প্রসাদী সুরও সেই নূতনত্বের একটি উচ্চ নিদর্শন। সুরেই যেন কি একটা মাদকতা শক্তি আছে,—যাহার নেশায় তন্ময় হইতে হয়,—যাহার ভাবে বিভোর হইয়া জীবনের সবটাই ওলট-পালট হইতে পারে।—আজ পর্য্যন্ত কোন ভাগ্যবান্

গায়ক কিংবা সুরজ্ঞ ব্যক্তি—প্রসাদের এই অভিনব সুরের অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রসাদী সুর—মাতৃভক্ত মহাত্মার ভাবের উৎস, ত্রিতাপ-জ্বালায় মহৌষধ, জীবের সঞ্জীবন সুধা।

অথচ এই সুর এত সহজ যে, সঙ্গীতে যাহার অতি সামান্য মাত্রও অধিকার আছে, সেও ইহা আয়ত্ত করিতে পারে। বড় বড় ওস্তাদ ইহা শুনিয়া মোহিত হন। অতিবড় জ্ঞানী পরম বৈদান্তিকও—প্রসাদী সুর ও সঙ্গীত শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। ইহার মূলে কি? মূলে মা নামের প্রভাব, সাধনার সিদ্ধ বাণী, সত্যের বিচিত্র মহিমা এবং ভক্তির অলৌকিক আকর্ষণ। বঙ্গভাষায় মাতৃভাবের মহাপ্রভাব মহাত্মা রামপ্রসাদই সর্ব্বাগ্রে আনয়ন করেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্থান বঙ্গসাহিত্যে সকলের শীর্ষস্থানে,—মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিতে পারি।

সঙ্গীতই ভাষার সার এবং সঙ্গীতই ভাষার আদি। প্রথম ও শেষ এই সঙ্গীতেরই সূক্ষ্ম আবৃত্তি মাত্র। যে কোন প্রতিভাবান্ কবি বা সাহিত্যকার প্রথম উদ্যমে কবিতা বা সঙ্গীত রচনা করেন বা রচনা করিতে চেষ্টা করেন, শেষবয়সেও সেই বাল্যের সুখস্মৃতিতে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তখন কবিতা ও সঙ্গীত লিখিতেও পারেন, না লিখিয়াও নীরবে আত্মার উদ্বোধনে ব্রতী থাকেন। সকল দেশের সকল ভাষারই উৎপত্তি এই কবিতা বা সঙ্গীতে। কবিতার কমনীয় মূর্ত্তির ধ্যানে প্রাণ সরস হয়, সঙ্গীত সেই সরসতাকে অতি সহজে ভগবদর্চ্চনার পথে লইয়া যায়,—যদি কাহারও সে সৌভাগ্যযোগ ঘটিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ রামপ্রসাদ এ বিষয়ে যতদুর অগ্রসর হইয়াছিলেন,—এ যুগে তেমন সৌভাগ্য আর কাহারও ঘটিয়াছে, কি না জানি না। বেদগানে ঋষিগণ তপোবন মুখরিত করিতেন, প্রসাদও তাঁর স্ব-রচিত মাতৃনাম গানে—সুরের অলৌকিক আকর্ষণে, সমগ্র সংসার মুখরিত করিয়া—ভক্তের মানস-তপোবন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—এখনো তাঁহার শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে।

এ হেন প্রসাদ বা মায়ের ছেলে, মাকে ও মায়তুল্য মাতৃভাষাকে যথান পূজা ও সাধনা করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার স্মৃতিপূজা করিলে বাঙ্গালী নিজেই গৌরবান্বিত হইবে।

প্রসাদের সকল গান সংগৃহীত হয় নাই. সংগ্রহ করিতে কেহ পারেন নাই। 'লক্ষউকীল' অর্থে যদি লক্ষ-গান হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মাতৃভক্ত মহাত্মা একলক্ষ গানে তাঁর ইষ্টদেবীকে আরাধনা করিয়া গিয়াছেন। সে লক্ষ সঙ্গীত ত নাই-ই, যাহাও অবশিষ্ট আছে, তাহাও লোক-মুখে ক্রমেই বিকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। যাহা হউক, তাহাতেও মাতৃনামের কোন ব্যত্যয় হয় নাই। প্রসাদের সেই মনমাতানো সুর ও মা-নামের সেই মধুরতম ঝঙ্কার—যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর ধরাতলে বিরাজ করিবে,—সত্যের কখন নাশ নাই।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব যেমন বাঙ্গালীর নিজস্ব, প্রসাদের গানও তেমনি বাঙ্গালীর নিজস্ব—ইহা তাহার সম্পূর্ণ আপনার ধন, খাঁটি ঘরের জিনিস। বাঙ্গালীর ধাত বুঝিতে হইলে, প্রসাদের মাতৃভাবময় সাধন সঙ্গীতগুলি বুঝিতে হইবে। যেমন তেমন করিয়া উহা বুঝিলে বা পড়িয়া গেলে চলিবে না,—একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তখন তাহার আত্মমর্য্যাদা ও গৌরব-বুদ্ধির বিকাশ হইবে,—বুঝিবে, যে সে আধারে সে জীবনধারণ করিতেছে না,—স্বয়ং রাজরাজেশ্বরী জগদ্ধার ক্রোড়ে সে লালিত ও পালিত ;—ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং জগদ্ধাত্রী তাঁহার মা। ধর্ম্ম-মা নয়, পাতানো-মা নয়, কিংবা বিমাতাও নয়,—তাহার নিজের গর্ভধারিণী মা। অন্তরে এই ভাবে ভক্ত জগজ্জননীকে দেখিবেন ও তাঁহাকে অতি আপনার—আপনার হইতেও আপনার ভাবিয়া ভালবাসিবেন। এই সত্যিকার ভালবাসা যার আসিবে, সেই প্রসাদের সঙ্গীতলহরী বুঝিবে,—তাহার অতলস্পর্শী ভাব-সিন্ধু-নীরে ডুবিয়া স্ব-স্বরূপকে চিনিতে পারিবে ; মনে হইবে, 'আমি ত সামান্য নহি,—বিশ্বজননী মহাশক্তি মা যে আমার অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন!'

'জাতীয়তা' বলিয়া যদি কিছু গৌরব করিতে হয়, তবে এই মা-নাম লইয়া কর ; প্রসাদের এই মাতৃ মহামন্ত্রের জীয়ন্ত শক্তি লইয়া কর ; মায়ের বিরাট্ সাকার প্রতিমা লইয়া কর। বাঙ্গালী সহস্র সহস্র জন্মেও গৌরব করিতে পারিবে যে, মহাত্মা রামপ্রসাদ তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন!

এই সোণার মানুষ—এই সংসারী সাধক—অতি সহজ সরলভাবে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে দেখাইয়া গিয়াছেন, স্ত্রীপুত্রপরিজনে পরিবৃত থাকিলেও, গৃহী তাহার আপন ইষ্টদেবতাকে পাইতে পারে, তাহার সাক্ষাৎ ও তাহার সহিত আলাপে ধন্য হইতে পারে, মনুষ্যজন্মের যা সার ও চরম-লক্ষ্য, তাহাও আয়ত্ত করিতে পারে,—যদি তার প্রকৃত পিপাসা ও প্রাণের টান হয়; যদি সে সত্য সত্য সেই অভয় পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে চায়; যদি সে সম্পূর্ণরূপে আপন কর্ত্তৃত্বাভিমান ভুলিয়া—মাকেই একমাত্র কর্ত্রী ও জগৎকারণ ভাবিয়া তাঁহার ধ্যান ও ধারণায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অপূর্ব্ব কথামৃতে এই কথাটি বড় স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আন্তরিক ব্যাকুলতা আসিলেই যে ঈশ্বরলাভ হয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন। এই ব্যাকুলতা বা প্রাণের টানের নামই ভালবাসা। সে ভালবাসা কেমন? না, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, আর বিষয়ী যেমন বিষয়কে ভালবাসে। এই তিনের ভালবাসা বা প্রাণের টান্ একত্র করিলে যতখানি হয়, ঠিক ততখানি ভালবাসা যদি কেউ ঈশ্বরকে দিতে পারে, তার নিশ্চয়ই হরিপাদপদ্ম লাভ হয়। সে হরি—তার ইষ্টদেবতা—তা মা-ই বল, আর বাপ-ই বল, আর যাই বল। তবে মাতৃভাবে সাধনায় আশুফল ফলে, আর ইহার পথও খুব সুগম এবং স্বাভাবিক,—পতনের ভয়ও ইহাতে বড় একটা নাই। কেননা, মায়ের উপর জোর চলে, আব্দার চলে, শত অপরাধেও মার ক্ষমা মিলে;—তিনি যে করুণাময়ী—দয়ার অবতাররূপিণী। মার চেয়ে দয়া, মার চেয়ে ক্ষমা, মার চেয়ে ভালবাসা—আর কার থাকিতে পারে, থাকা সম্ভব, বা স্বাভাবিক? তাই মাতৃভক্ত প্রসাদ মায়ের এই মহীয়সী মহিমা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া, মায়ের দান—সাধনসঙ্গীতের সম্পূর্ণ নূতন সুর—বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন,—যাহার অনুশীলনে তাহার আত্মার উদ্বোধন,—আত্মশক্তির বিকাশ,—তাহার কাব্য-সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তবে আজিও যে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহা বঙ্গবাসীর অদৃষ্টদোষে ও কর্ম্মবশে—অলসতা, ধর্ম্মহীনতা ও হীন অনুকরণ-প্রিয়তাই ইহার মুখ্য কারণ।

বঙ্গে দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর 'জাতীয়' উৎসব, আর প্রসাদের গান—বাঙ্গালীর 'জাতীয় সঙ্গীত'। শরৎ সমাগমে, কি জানি কাহার অলক্ষ্য আকর্ষণে, নির্জীব বাঙ্গালী সজীব হয়; তাহার অসাড় প্রাণে সাড়্ আসে; হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়; মনে স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা জাগে; প্রবাস হইতে ছুটিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়;—পাঁচ বছরের শিশু হইয়া মনে মনে 'জয় মা জগদম্বে' বলিতে বলিতে সে যেন নাচিতে থাকে;—এ সৌভাগ্যের মূলে কি?—মূলে মহামায়ার কৃপা—জগদম্বার অলৌকিক স্নেহ-আকর্ষণ। সমগ্র বঙ্গ ব্যাপিয়া উৎসব, সমগ্র বাঙ্গালীও তাই আনন্দে আত্মহারা। বঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে কি সুখ ও শান্তির অমৃতধারা প্রবাহিত! দেবীপক্ষও পড়িল, আর উৎসবও আরম্ভ হইল। যাকে যে ভাগ্যবান্ নিজগৃহে আনিতে পারিল, তাহার বাড়ীতেও যেমন উৎসব, যে যাকে আনিতে অপারক হইল, তাহারও মানসমন্দিরেও সেইরূপ উৎসব—মাতৃনামে কেহই বঞ্চিত হইল না। মায়ের বোধনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীর গৃহে মাঙ্গলিক চিহ্ন—পূর্ণকুম্ভ বা মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব ও কদলীবৃক্ষ, ধূপধূনাগুগ্গুলের সুগন্ধে দিক আমোদিত; ভক্তের হৃদয়-মন্দিরেও সেইরূপ মাঙ্গলিক স্মৃতি—প্রেম ভক্তি ভালবাসা। ভক্ত তখন মনে করেন,—'সমগ্র সংসারকে এই বুকের মধ্যে রাখি।' শারদীয় উৎসবের এ শুভদিনে শারদীয় সাহিত্যের সেই মধুরস্মৃতি স্মরণ করুন্ দেখি? আগমনি-গীতিতে প্রাণ কত স্নিগ্ধ ও সরস হয়!—প্রসাদের মার নামগুলি এ সময়ে প্রাণে কি অমৃত বর্ষণ করে! সমগ্র বঙ্গ যেন একটি দেবনগর, সমগ্র বাঙ্গালী যেন এক পরিবার, আর তাহারই মাঝে প্রসাদের সেই দেবদুর্লভ মাতৃনাম-যজ্ঞ!—প্রকৃতই 'জাতীয়' বলিয়া যদি কোন কথা মানিতে হয়, তবে তাহা বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব ও প্রসাদের মাতৃনাম। কেননা এ দুটি জিনিসই খাঁটী, আন্তরিক, ও হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। নহিলে, ভারতসঙ্গীত বাঙ্গালীর 'জাতীয় সঙ্গীতে' নহে,—উহা বিজাতীয় সঙ্গীতের অনুকরণ মাত্র। উহার ভাব, ভঙ্গি, অঙ্গ—সবটাই যেন বিজাতীয়, কেবল অক্ষর গুলা বাঙ্গালা। উৎসাহ বা উদ্দীপনা ভাল জিনিস বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মানুমোদিত না হইলে তাহার ফল বিপরীত হয়। সে বিপরীত ফল বাঙ্গালীর ধাতে সহিবে না, সহিতে পারে না। তবে যে ইদানীং সর্ব্বত্রই 'জাতীয়তার' একটা ঢেউ উঠিয়াছে,

তাহা বিজাতীয় ভাব-সংঘর্ষণের একটা তরঙ্গ মাত্র। এ তরঙ্গকে থামিতেই হইবে,—সাগরের জল সাগরে গিয়া মিশিবে।

বলিবে, তবে শক্তিপূজা কেন? বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের এত মহিমা কেন? একমাত্র উত্তর—বাঙ্গালীর ভক্তি। সহরের দুই দশজন ইংরাজী-নবীশ বক্তৃতাবাগীশ বা আড়ম্বরপ্রিয় বিলাসী বাবুকে দেখিয়া মনে করিও না যে, বাঙ্গালীর ভক্তি নাই,—বঙ্গবাসী নাস্তিক হইয়াছে। এখনো দেশে, প্রবাসে বহু সংখ্যক ভক্ত বাঙ্গালী আছেন,—যাঁহাদের কথা ভাবিলেও পুণ্য হয়। এখনো কালীঘাটে, সুদূর কামরূপ মহাতীর্থে মাতৃনাম-মহাযজ্ঞ ভক্তি-ভরে সমাহিত হয়। এখনো শত শত শাক্ত—শত শত গৃহী ভক্ত মা-নাম শ্রবণমাত্র পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। নীরবে, নিভৃতে, লোকচক্ষুর অন্ত-রালে,—এখনো কত শত সাধক মা-নামে ভাবমগ্ন হইয়া পড়েন। মূলে ভক্তি না থাকিলে, ইহা হয় কোথা হইতে? আছে—ভক্তি সুনিশ্চিত আছে,—ভক্তি বাঙ্গালীর মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। তবে সংস্কারের অভাব,—তাই তার বিকাশ নাই। সেই ভক্তির আদি শিক্ষাদাতা—মাতৃভাবময় বঙ্গসাহিত্যের আদিগুরু—শ্রীরামপ্রসাদ। আমি সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে প্রণাম করি।

শক্তি লাভ করিতে চাও? ভক্তি হইতে তাহা লাভ কর, ভগবান্‌কে ভালবাসিতে শিখ;—সর্ব্বশক্তির অধীশ্বর হইবে। দানবী শক্তি—দ্বেষ-হিংসা-রক্তপাত—শক্তি নয়, শক্তির ব্যভিচার মাত্র। মায়ের ছেলে—জগদম্বার সন্তান তুমি;—সে ব্যভিচার-মহাপাপে লিপ্ত হইবে কেন? মাতৃপূজা, মাতৃসেবা, মাতৃ-আবাহন, মাতৃনামগান যদি শিখিতে হয়, ত প্রসাদের নিকট হইতে তাহা শিখ;—সত্যিকার 'জাতীয়' ভাব তোমার মনে জাগিবে; দর্পণে আপনার মুখ দেখিতে পাইবে; স্ব-স্বরূপকে চিনিতে পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইবে; নিশ্চয়ই মনে মনে বলিবে, "হায়, কি ছিলাম, আর কি হইয়াছি! সিংহশিশু হইয়া এতকাল ছাগপালে মিশিয়া ছাগল বনিয়া ছিলাম!"

পরমহংসদেবের একটি গল্প এখানে মনে পড়িল। গল্পটি এই;—"একটা ছাগলের পালে একটা বাঘ প'ড়েছিল। এমন সময় লাফ্ দিতে গিয়ে তার প্রসব হোয়ে ছানা হোয়ে গেল। বাঘটা ম'রে গেল, কিন্তু ছানাটি

ছাগলদের সঙ্গে মানুষ হ'তে লাগ্‌লো। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও ভ্যা ভ্যা করে, বাঘের ছানাটাও ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে ছানাটাও খুব বড় হোল। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বড় বাঘ এসে প'ড়ল। সে ঘাস-খেকো বাঘটাকে দেখে অবাক্। তখন দৌড়ে এসে তাকে ধোরলে। সেটাও ভ্যা ভ্যা কোর্‌তে লাগ্‌লো। তাকে টেনে হিচ্‌ড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। ব'ল্লে, 'দেখ্, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ্—ঠিক আমার মত দেখ্। আর এই নে—খানিকটে মাংস—এইটে খা।' এই ব'লে তাকে জোর ক'রে খাওয়াতে লাগ্‌লো। সে কোন মতে খাবে না, ভ্যা ভ্যা ক'রছিল। কিন্তু রক্তের আস্বাদ পেয়ে তখন খেতে আরম্ভ ক'র্‌লে। নতুন বাঘটা ব'ল্লে, 'এখন বুঝেছিস, আমিও যা—তুইও তা।—এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চ'লে আয়।' তাই, গুরু-কৃপা হ'লে আর কোন ভয় নেই। তিনিই জানিয়ে দিবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি ?"

কথা ঠিক নহে কি ? সত্যই কি আমরা সিংহশিশু হইয়া ছাগপালে মিশিয়া ভ্যা ভ্যা করিতেছি না ? সাময়িক উত্তেজনায়, সাময়িক একটু যশ-মানের আশায়, আমরা কি পরমার্থকে বলি দিতেছি না ? কিসের প্রয়োজন ? কয়দিনের জন্য এই জীবন ? ঐ শুন প্রসাদ ডাকিতেছেন ;—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুতলে গিয়ে চারি-ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে, বিবেক নামে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
শুচি অশুচি নিয়ে দিব্য ঘরে ক'বে শুবি,
তাদের দুই সতীনে পিরীত হ'লে, তবে শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, সেটাকে তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয় রে, ধৈর্য্য-খোঁটা ধ'রে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, হাড়কাটে রে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানে, দূর হ'তে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥

প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু, বাছা, বাপের ঠাকুর, মনের মত ফল পাবি॥”

যদি এই ভাবে জীবন গঠিত করিতে পার, তবেই মনুষ্যজন্ম সফল—নইলে সকলই ব্যর্থ, ভস্মে ঘৃতনিক্ষেপ মাত্র। ভাই! এ অমৃতের আস্বাদ যদি একটু কণামাত্রও একবার—কেবল একবার মাত্রও পাইয়া থাক, তবে সেই স্ব-স্বরূপকে ভুলিয়া এ নকল অভিনয় কেন? সোণা ফেলিয়া আঁচলে গেরো কেন? সাচ্চা ছাড়িয়া ঝুটোর জলুসে মজিতে—মরিতে যাওয়া কেন? স্বদেশপ্রেম?—মাতৃভক্তি? অতি উত্তম কথা, প্রসাদের নিকটেই তাহা শিখ;—একাধারে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল লাভ করিবে। অগ্রে মানুষ হও, চরিত্র গঠন কর, ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর,—কল্পতরুর কৃপায় একে একে সব পাইবে।

প্রসাদের সঙ্গীতাবলীতে সকল তত্ত্বই নিহিত আছে। একটু ডুব দিয়া ঐ সকল রত্ন আহরণ করিতে হইবে। দেখিবে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—সকল শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া, স্বয়ং ভাবরূপিণী মা—ভাষারূপিণী বাণীর অঙ্গে বিরাজ করিতেছেন! স্বয়ং মা নহিলে প্রসাদ-সঙ্গীতের বর্ণে বর্ণে এত সুধা, এত মধুরতা, এত পবিত্রতা, আর এমনি কোমল করুণ মর্ম্মস্পর্শী ঝঙ্কার? হায় কবি! হায় দুঃখিনী বঙ্গভাষা!

মাকে দুঃখিনী বলিলাম কেন,—একটু অর্থ আছে। রামপ্রসাদের স্বর্গীয় মাতৃভাবের মহান্ আদর্শ—যে জাতির 'জাতীয় সাহিত্যের' আদিম স্তর, সে জাতিকে ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইতেছে এখন—বিদেশী বিজাতির পঙ্কিল নায়িকা-ভাব লইয়া। নায়িকা বলাও ঠিক হইল না, বোধ হয় প্রচ্ছন্না গণিকা বলিলেই অধিক সঙ্গত হয়।—কোথায় মা, আর কোথায় গণিকা! তাই আজকালের কোন কোন শক্তিশালী সৌভাগ্যবান্ সাহিত্যসেবীর রচনাভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, একি মাতৃসেবা হইতেছে,—না, গণিকার গুণ-গানে লেখনী কলুষিত, কলঙ্কিত ও শক্তির অপব্যবহার করা হইতেছে?

এ দুর্দ্দিনে মহাত্মা প্রসাদই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। বলিয়াছিত, বঙ্গসাহিত্যের এক প্রান্তে শ্রীরামপ্রসাদ আর প্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব—মধ্যে যেন একটি নদী ব্যবধান। সে নদী—বৈতরণী। সাহিত্যধর্ম্মের সহায়ে

যিনি পারে যাইবার আশা রাখেন,—আত্মার স্ফূর্ত্তি ও আত্মোন্নতির জন্য উদ্‌গ্রীব হন, তাঁহাকে এই দুই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইতে হইবে। অন্ততঃ মাতৃ-নামের ভেলায় যাঁহারা ভর করেন, তাঁহাদের গতি এই মায়ের 'পণ' প্রসাদ ও মায়ের মূর্ত্তিমান্ প্রতিনিধি দয়ালঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব। কিন্তু মধ্যে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন ও দুঃসহ জয়-পরাজয় আছে। তাঁহাকে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত সহিতে হইবে। অনেক উপদ্রব অত্যাচার তাঁহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইবে। অনেক চোর-দস্যু-বোম্বেটে-গুণ্ডা তাঁহার পশ্চাতে লাগিবে। অনেক কুকুরের ঘেউ ঘেউ গর্জ্জন—কখন বা তাহাদের অল্পাধিক দংশনও তাঁহাকে নীরবে সহিতে হইবে;—তার পর ভাগ্যে থাকে—ত সিদ্ধিলাভ। গুরু-কৃপা হইলে সিদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। এ পথের পথিক যিনি,—এক জন্মে না হউক, জন্মান্তরে আসিয়াও তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিবেন। শবসাধন করিতে বসিয়া, বিভীষিকা দেখিয়া বা পূজার কঠোরতা উপলব্ধি করিয়া,—বিচলিত হইলে চলিবে কেন? মা কি সহজে বর দেন? সেই বরাভয়াকে দর্শন করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকিলে,—সংযমী হইতে হইবে, একনিষ্ঠ হইতে হইবে, চরিত্রবান্ ধার্ম্মিক ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বী হইতে হইবে;—শেষ ভাগ্যের যোগ ও মহামায়ার কৃপা। আন্তরিক হইলে মা-ই সব মিলাইয়া দেন,—মানুষ উপলক্ষ মাত্র। মা যদি বর দেন, মার কৃপায় যদি মার আদেশ পাও, তবেই তুমি সত্যের এ বিমলরশ্মি জগতে বিলাইতে পারিবে। নহিলে তোমার কথা কেহ শুনিবে না, মানিবে না, তোমার লেখা কেহ পড়িবে না,—রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শনের ন্যায় একটু সাময়িক বাহবা ও হাততালি দিয়া লোকে তোমায় বিদায় করিবে।—ভাষার সংস্কার তুমি করিবার কে? আগে নিজের সংস্কার নিজে কর,—সচ্চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ, সরল, দ্বেষহিংসাবর্জ্জিত, দাম্ভিকতাশূন্য, ঈশ্বরবিশ্বাসী কর্ম্মী হও, তবেই মার প্রসন্নতা লাভ করিবে,—মাতৃরূপিণী মাতৃভাষার সংস্কারসাধনে সক্ষম হইবে। প্রসাদের চরণপ্রান্তে বসিয়া, ভক্তি শিক্ষা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সান্নিধ্যে উপনীত হও,—তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।

ঐ দেখ, সোণার মানুষ তোমায় ডাকিতেছেন;—ভাবের ঠাকুর তোমার

অলক্ষ্যে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন,— এ সুযোগ, সময় ও সৌভাগ্য হেলায় হারাইও না।

এইবার প্রসাদের মহামহিমপূর্ণ জীবনকথার একটু আলোচনা করিব।

২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরের সন্নিকট কুমারহট্ট গ্রামে অনুমান ১৭১৮-১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহাত্মা রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর ও পিতার নাম রামরাম সেন। জাতিতে তিনি বৈদ্য ছিলেন। কিন্তু জাতি-ব্যবসায় কখন অবলম্বন করেন নাই। চিকিৎসা-বিদ্যায় অর্থগ্রহণ এখনও অনেকের নিকট পাপ বলিয়া গণ্য। সুতরাং তখনকার সময়ে, মহাত্মা রামপ্রসাদের মত ধর্ম্মপ্রাণ লোকের নিকট তাহা কতদূর হেয় ছিল, সহজেই অনুমিত হয়। কাজেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। তখন প্রধানতঃ জমিদারী কাজই দেশে প্রচলিত ছিল। প্রসাদ আপন চেষ্টায় কোন মহানুভব ধর্ম্মাত্মা জমিদারের বাটীতে সামান্য একটি মুহুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রাণ অতি উচ্চসুরে বাঁধা.—মা-নামেই তিনি পাগল ;—ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ও দুর্লভ মাতৃভক্তি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ;—জমিদারীর হিসাব-নিকাশ-বিশিষ্ট পাটোয়ারী খাতায় তাঁহার মন বসিবে কেন ? তিনি সেই হিসাবের পাকা খাতায়—মাথামুণ্ড জমা-খরচ-ওয়াশীলের মুণ্ডপাত করিয়া—সেই সেই স্থলে মনের সাধে মনের ছবি আঁকিতেন।—একদিন কোন গতিকে —বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে—কোন গতিকে তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর তাহাতে দৃষ্টি পড়িল। তিনি প্রসাদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার এই অশিষ্টাচরণ তাঁহার প্রভুকে জানাইলেন ; পাকা খাতার পরকাল প্রসাদ কিরূপে খাইয়াছেন,—খাতার পাতা উল্টাইয়া এক এক করিয়া দেখাইলেন। জমিদারটির অদৃষ্ট ভাল ছিল ;—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিগুণে তিনি অল্পেই বুঝিলেন, প্রসাদ এ কাটমায় যাঁর চাকরি করিতে আসিয়াছেন, তাঁরই চাকরি করিবেন, সেই কর্ত্তা বা কর্ত্রীর বিভবের নিকট—তাঁর ক্ষুদ্র জমিদারী—অনন্ত সিন্ধুর একটি বিন্দু মাত্র। উদ্দেশে প্রণাম করিয়া. মানে মানে তিনি প্রসাদকে বিদায় দিলেন এবং সচ্ছন্দে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহজন্য মাসিক ত্রিশ টাকার একটি স্থায়ী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট

করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তখনকার ত্রিশ টাকা বর্ত্তমান কালের তিনশত টাকারও অধিক।

ভাগ্যবান্ জমিদার প্রসাদের সেই হিসাবের খাতায় যে কয়টি গীত দেখিতে পান, তাহার একটি এই,—

"আমায় দাও মা তবিলদারী। আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী॥"

বোধ হয়, এই গীতটিই—ভগবদ্ভক্ত মহাত্মার প্রথম সঙ্গীত। কিন্তু তাহা ঠিক বুঝিবার কোন উপায় নাই। ব্যাপারখানা কিন্তু বুঝুন। সেই প্রথম অবস্থার রচনাতেই মাতৃভক্ত প্রসাদের কি মহীয়সী আকাঙ্ক্ষা! সম্ভবতঃ কৈশোর ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভক্তের এই ভক্তিকামনা! পার্থিব ধন যশঃ মান নামের আশায় মানুষ যখন উদ্‌ভ্রান্ত ও দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য, তখন মায়ের ছেলে প্রসাদ চাহিতেছেন কিনা—অহেতুকী অমলা নির্ম্মলা ভক্তি! সেই বয়সেই মানুষ তাঁহার সীমানার বা'র—একমাত্র ভগবান্‌ই জীবের অবলম্বন ও লক্ষ্য,—চাহিতে হয় ত সেই কল্পতরুর নিকটেই চাইব;—মানুষ নিজেই ভিখারী,—ভিখারী আর কি ভিক্ষা দিবে?—বুঝি এমনি একটা ভাব বালকের মনের উপর আধিপত্য করিতেছিল, তাহার ফলে স্বভাবের শিশু গাহিল,—

"দে মা আমায় তবিলদারী। আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী॥"

জীবিকা অর্জ্জনের দায়—তথা পরাধীনতা হইতে মুক্তি পাইয়া, প্রসাদ গৃহে ফিরিলেন। বুঝিলেন, ভক্ত জমিদারের এ দান—তাঁহার আরাধ্য ইষ্ট-দেবীরই দানের নামান্তর।—মা-ই তাঁহাকে জন্মের মত জীবিকা অর্জ্জনের দায়ে মুক্তি দিলেন! দ্বিগুণ উৎসাহে ও পূর্ণোদ্যমে তিনি মাতৃ-সাধনায় ও সঙ্গীত-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গৃহে আসিয়া যথানিয়মে তিনি তান্ত্রিকমতে পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রস্তুত করিলেন এবং সেই মন্ত্রপূত আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া মা মা করিয়া সর্ব্বদাই ভজনপূজনসাধনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীত-রচনার মুখ্য লক্ষ্য—মাতৃ-আবাহন। জগজ্জননী মহাকালীর প্রসন্নতা সম্পাদনই তাঁহার উদ্দেশ্য—সুতরাং রচনার জন্য তিনি রচনা করিতেন না। তাঁহার সে সাধনসঙ্গীত স্তুতি-নিন্দার অতীত; ভাবরাজ্যের মানুষ ব্যতীত সে

দেবসঙ্গীত সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা অন্যের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তাই প্রসাদসঙ্গীতের বিশদ সমালোচনা করা সুবিধাকর নহে। ধ্যানের ছবি ধ্যানেই পরিদৃষ্ট হইতে পারে; আত্মার উপভোগের জিনিস আত্মাই উপভোগ করিতে সমর্থ হয়;—বাহিরে, লোকচক্ষুর সম্মুখে আনিয়া তাহার বিচার-বিশ্লেষণ করিলে রস নষ্ট হয়, মাধুর্য্য কমিয়া গিয়া থাকে। তাই প্রসাদের ঠিক সমালোচনা হইল না,—হওয়াও একরূপ অসম্ভব।

কালীর বরপুত্র প্রসাদ তন্ত্রমতে 'কারণ' সেবন করিতেন; তাহা দেখিয়া কুমারহট্টের তদানীন্তন একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক—তাঁহাকে 'মাতাল' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। ভক্ত-চূড়ামণি প্রসাদ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, আত্মনিবেদনে মাকে মনের কথা জানাইয়া নিম্নলিখিত গানটি গাহিলেন,—

"সুরা পান করি না আমি, বিষপান করি না আমি,
সুধা খাই—জয় কালী বোলে।
আমার মন-মাতালে মত্ত করে, যত মদো-মাতালে মাতাল বলে॥"

ইহাতে বোধ হয়, ভক্তবৎসলা অভয়ার বরে, ভক্ত-চূড়ামণি কবিকে কখন কাগজে কলমে কোন গান লিখিতে হইত না,—ভাবের ঘোরে মুখে মুখে তিনি যাহা আবৃত্তি করিতেন, তাহাই স্বর্গীয় সঙ্গীত-রত্নে পরিণত হইত। সিদ্ধ বা সিদ্ধির সিদ্ধ মহাপুরুষগণের রচনার প্রণালীই এইরূপ—তাঁহাদের সবটাই অদ্ভুত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত কথামৃতই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কেননা, মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান্ বাগ্মী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সুপণ্ডিত সুধী, ডাক্তার সরকারের মত পাশ্চাত্যবিদ্যা-বিশারদ বৈজ্ঞানিক, কৃষ্ণদাস পালের মত রাজনীতিক, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, পদ্মলোচন, গৌরীচরণ, বৈষ্ণবচরণ প্রভৃতির মত ন্যায় ও দর্শনের মহা মহা অধ্যাপক,—সেই নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদতলে বসিয়া ধর্ম্মের অতি গূঢ় রহস্য ও জটিল সমস্যা—জলের মত মুখে মুখে দুই এক কথায় বুঝিয়া লইতেন এবং বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া—ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে অশ্রুসিক্তনয়নে সেই মহা-পুরুষের শ্রীমুখপদ্ম দেখিতে দেখিতে, মনে মনে বার বার পরাভব স্বীকার করিতেন। জিজ্ঞাসায়, সেই বিনয়ের অবতার—মূর্ত্তিমান্ নিরহঙ্কার পুরুষোত্তম

উত্তর দিতেন,—'দেখ, আমি মুখ্যু মানুষ, কিছু জানি না, কিছু বুঝি না, মার নাম করি বোলে, মা-ই এ সব কথা বলাচ্ছেন। ও দেশে ধান মাপে জানো? একজন রামে রাম—তুইয়ে তুই করিয়া পালিতে ধান মাপিতে থাকে, যেই ফুরোয়-ফুরোয় হয়, অমনি আর একজন রাশ্ ঠেলিয়া দেয়। তেম্‌নি, আমি যখন কথা কই, মা-ই নিজে আসিয়া রাশ্ ঠেলিতে থাকেন,—আমি কি বলি, নিজেই বুঝিতে পারি না।'—সহস্র সহস্র চক্ষুর উপর সেদিন এই কলিকাতা মহানগরীর স্থানে স্থানে এ দৃশ্য হইয়া গিয়াছে;—মায়ের ছেলে প্রসাদের মৌখিক আবৃত্তিতে সঙ্গীতরচনা—অমন সুগভীর শাস্ত্রসিদ্ধ ধ্রুবসত্য কবিত্বপূর্ণ গাথার মৌখিক উন্মেষণায়—অবিশ্বাস করিব কেন? অবিশ্বাস ত করিই না, বরং বিশ্বাস করি,—মার দয়া হইলে, গুরু-কৃপায়, বোবাও বক্তৃতাবাগীশ হয়,—সেও জগৎ স্তম্ভিত করিতে পারে। ভাগ্যবান্ প্রসাদ জন্মজন্মের কঠোর তপস্যায় এ দুর্লভ সম্পদের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে—অথবা একদিন জগতের সাহিত্যেও যে তাঁহার স্থান কোথায় হইতে পারে, আপনারাই তাহার বিচার করুন।

জটিলা-কুটিলা সব সময়েই আছে, চিরকাল থাকিবেও।—লীলার পুষ্টির জন্য শ্রীভগবানেরই এ খেলা। প্রসাদের ভাগ্যেও এরূপ একটি জটিলা জুটিয়াছিল। তিনি একজন বাঁধনদার বটেন, প্রসাদের নামের সঙ্গে এক শ্রেণীর লোকের নিকট তাঁহার নামও থাকিবে বটে,—তবে তিনি যেন কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাবে, একটু ঈর্ষার বশে, ভক্ত-কবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। প্রসাদ গাহিলেন,—

'এই সংসার ধোঁকার টাটী ভবে এসে আনন্দ লুঠি॥'

প্রতিদ্বন্দ্বী গোঁসাই-কবি (অযোধ্যারাম গোস্বামী বা আজু গোঁসাই) অমনি উত্তর দিলেন,—

'এই সংসার রসের কুটী। ওরে ভাই, খাই দাই, আর মজা লুঠি॥
জনক রাজা, মহা তেজা, তার ছিলরে কিসের ত্রুটি,
সে যে, এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটী।'

অন্যত্র মহাভাবে বিভোর হইয়া প্রসাদ গাহিলেন,—

'মুক্ত কর্ মা, মায়া-জালে।'

আজু অমনি উত্তর দিলেন,—

'বন্ধ কর্ মা, খেপ্‌রা জালে।

যাতে, চুণোপুঁটী এড়াবে না, মজা মার্‌বো ঝোলে-ঝালে॥'

কবির লড়াইয়ের মত, আজু গোঁসাই মধ্যে মধ্যে এইরূপে প্রসাদকে আক্রমণ করিতেন, এবং নিশ্চয়ই এক শ্রেণীর লোকের নিকট খুব বাহবাও পাইতেন। কিন্তু তাহাতে প্রসাদের 'লক্ষ উকীল' বা লক্ষ গান রচনার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কেননা, তিনি ত রচনার জন্য রচনা করিতেন না,—মার চরণে আত্ম-নিবেদন ও মাতৃ-অর্চ্চনাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল,—তাহা হইতে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গসাহিত্যে এই অমূল্যনিধি লাভ। এই অমূল্যনিধির সদ্ব্যবহার আমরা করিতেছি না, তাই আমাদের অধোগতি। আবার প্রসাদী সুরে মন বাঁধিতে হইবে, তবেই আমাদের পরিত্রাণ। কেননা, আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ—মহাত্মা রামপ্রসাদ—কালীর বরপুত্র। কোন বংশে বা একটা জাতির মধ্যেও একজন ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ জন্মিলে সমগ্র দেশ সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হয়। বোধ হয়, এই জন্যই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দুর বংশাভিমান এত অধিক। 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতার এই অংশ টুকু ধরিয়া, কবি ব্রাহ্মণ হোন্ বা বৈদ্য হোন্, সে বিচার,—বংশ-কারিকাকার ঐতিহাসিকগণ করুন,—আমরা মায়ের ছেলে মুক্ত-মহাত্মার হৃদয়-পারিজাতের স্বর্গীয় সৌরভ উপভোগ করিয়া ধন্য হই।

প্রসাদের গুরু বা উত্তরসাধক কে, এ প্রশ্নও কাহারো কাহারো মনে হয়। আমরা বলি, মহাপুরুষেরা নিজেরাই নিজের গুরু—অথবা তাঁহাদের ইষ্ট-দেবতা স্বয়ং গুরুরূপে যথাসময়ে তাঁহাদের সম্মুখে আসেন। প্রসাদের গুরু—মা-ব্রহ্মময়ী স্বয়ং ;—'কৃপানাথ' নামে লৌকিক কোন গুরু থাকিলেও থাকিতে পারেন। তবে মা স্বয়ং তাঁহাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস। কালীর কৃপা না হইলে কালীভক্ত শাক্ত কখন সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। তবে এ কৃপা একদিনে হয় না, একজন্মেও হয় না,- কত সহস্র সহস্র দিনে, কত শত শত জন্মে সে কৃপালাভ হয়, মা-ই তাহা বলিতে পারেন।

এ অংশে ভাগ্যবান্ কবির সহধর্ম্মিণীও পরম ভাগ্যবতী। তিনিও পতির পুণ্যে, স্বপ্নযোগে, মা-মহেশ্বরীকে দর্শন করিয়াছিলেন। সে দর্শনে

ধন্য ও পবিত্র হইয়াছিলেন। কেননা, তাঁহাকেও ত পতির ধর্ম্মের সহায় হইতে হইবে? গৃহী স্বামী,—জীবনসঙ্গিনীকেও আপনার ছাঁচে ঢালিয়া মনের মত করিয়া গড়িতে না পারিলেই বা জীবন্মুক্ত হইবেন কিরূপে? তাই করুণাময়ী মায়ের এই কৌশল;—স্বপ্নযোগে প্রসাদ-গৃহিণীকে দেখা দিয়া আপন প্রিয়পুত্রের মুক্তির পথ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই ঘটনা এবং প্রসাদের স্ব-রচিত একটি গাথা অবলম্বনে কেহ কেহ অনুমান করেন, কালীকৃপা পাইলেও,—প্রত্যক্ষ মাতৃদর্শন প্রসাদের হয় নাই এবং সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অতি বিষম কথা, অতি মারাত্মক ভ্রম ইহা। কেননা, মায়ের মুক্ত-ছেলে, মাকে না দেখিয়া কি ইচ্ছামৃত্যু আলিঙ্গন করিতে পারে? তবে এ দৈব-ঘটনাগুলি কি? অবিশ্বাসীর চক্ষু ইহাতে ঝল্‌সিতে পারে এবং তাহার কুঞ্চিত মন আরো কুঁকড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ইহাতেই সমধিক আশ্বাসিত ও উৎসাহান্বিত হন। প্রসাদের অপরাধ এই, তিনি তাঁহার পুঁথির একস্থলে লিখিয়াছেন,—

'ধন্য দারা, স্বপ্নে তারা, প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥'

—অতএব, প্রসাদের মাতৃদর্শন হয় নাই এবং সিদ্ধিলাভও ঘটে নাই!—কেননা, উপরি উক্ত দুই ছত্র তাঁহার নিজ মুখের কথা! কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই ত হয়,—এটি প্রবর্ত্তকের প্রথম থাক্ বা সাধনার প্রথমাবস্থার কথা। কিংবা আর্ত্তির ভাবও হইতে পারে—'একবার ত দেখা দিয়াছ, আরবার দেখা দাও,—আমার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা বিরাজ কর।' অথবা ইষ্টদর্শন পাইয়াও ভক্ত আত্মগোপন করিতেছেন,—বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য আপনাকে অধম প্রতিপন্ন করিতেছেন,—এ ভাবও ত হইতে পারে? এই দুই ছত্র পাঠ করিয়া ওরূপ একটা গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপরাধ বলিয়া মনে করি। কেননা, ইষ্টদেবী মা যাঁর কন্যারূপে বেড়ায় দড়ি যোগাইয়াছেন;—স্বয়ং অন্নপূর্ণা সামান্যা একটি স্ত্রীলোকের বেশে আসিয়া যাঁর ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, 'তুমি কাশী যাইয়া আমায় গান শুনাইবে'; স্বয়ং মা শিবা,—শিবারূপ ধারণ করিয়া যে ভাগ্যবানের হস্ত হইতে অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন; যে

ক্ষণজন্মা মহাত্মা মার বরে গাবগাছ হইতে পদ্ম পাড়িয়া একদিন মার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন,—তাঁহার মাতৃদর্শন ও সিদ্ধিলাভ হয় নাই,—কোন্ মুখে এ কথা বলিব? দর্শন ত দূরের কথা,—হয়ত ঠাকুর পরমহংসদেবের ন্যায় মার সহিত তিনি আলাপও করিয়া থাকিবেন,—এই যেমন তোমার সহিত আমি আলাপ করিতেছি!—ভক্তিবলে কি না হয়? ভক্তের জন্য ভক্তবৎসল কি না করিতে পারেন? বিশেষ, প্রসাদের আবার মাতাপুত্র সম্বন্ধ;—মার উপর আরো জোর, আরো জুলুম, আরো আব্দার চলিয়াছিল,—বিন্দুমাত্র সন্দেহ তাহাতে করি না। 'কালী কথা কইতেন'—প্রসাদের পক্ষে কি ইহাই যথেষ্ট? যাঁহারা তাঁকে শুধু কবি কি সাধক ভাবেন, তাঁহারা এইরূপ ভাবিতে পারেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে আরো উচ্চস্তরে—আরো মহান্ আধারে রাখিয়া ধ্যান করি; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অবিশ্বাস করিতে পারি না। আর শুধু বিশ্বাসই বা বলি কেন? প্রত্যক্ষ অনুভূতি যেখানে, বিশ্বাসও সেখানে ছোট জিনিস—অবিশ্বাসের লেশমাত্র আসিলে, তবে ত বিশ্বাসের কথা?

সঙ্গীতই প্রসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সিদ্ধিও তাঁহার এই সঙ্গীতে—তাঁহার পঞ্চমুণ্ডীর আসনও বোধ হয় এখানে পরাভূত। এই সঙ্গীতই ভক্তের যোগ; সংসারে থাকিয়াও প্রসাদ যোগী। সঙ্গীতের এই সম্মোহন স্বরে তিনি জগন্মাতাকে আবাহন করিতেন, ভক্তবৎসলার আসন তাহাতে টলিত;—গান গাহিতে গাহিতে প্রসাদ তন্ময় হইয়া পড়িতেন,—শ্রোতাকেও তিনি তন্ময় ও মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারিতেন;—গানের দুই চারিটি চরণ দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। প্রাণের কোন্ নিভৃত স্থান হইতে এ ধ্বনি উত্থিত হয়,—এ সহজ সরল ধ্রুবসত্য বেদবাণী ঝঙ্কৃত হইতে থাকে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়;—মনে হয়, এ 'ভাবের মানুষ' মায়ের হাতে-গড়া মূর্ত্তিমতী বীণা। সা, রি, গা, মা, পা, ধা নি—এই সপ্তস্বর মানুষের হৃদয়-যন্ত্রে রহিয়াছে; মানুষ তাহা জানে না,—অজ্ঞান অন্ধপ্রায় দিন কাটায়;—দয়াময়ী মা তাই মধ্যে মধ্যে নিজ 'গণ' হইতে এক একটি সোণার মানুষ—প্রতিনিধিরূপে সংসারে পাঠাইয়া দেন;—তাঁহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসে, শুভ ইচ্ছার আশীর্ব্বাদে, অভয় আশ্বাসে, এমন কি, প্রসন্নমূর্ত্তির করুণ দৃষ্টিতে সংসার তরিয়া যায়;—যখন

তাঁহারা আপানাতে জীবের ভাব আরোপ করিয়া ঐ সপ্তস্বরের আলাপ করিতে থাকেন। মায়ের প্রসাদ সঙ্গীত-বাঁশরীতে, জীব-হৃদয়-যন্ত্রের ঐ সা-রি-গা-মা-পা-ধা-নি আলাপ করিয়াছিলেন, অভিশপ্ত বঙ্গবাসী সেই স্বর্গীয় স্বর ভুলিয়া যাইতেছিল,—অমনি করুণার অবতার গুরুরূপে আর্ত্তের ভার লইতে—মার প্রতিনিধি স্বরূপ—সশরীরে আবির্ভূত হইলেন,—'জয় রামকৃষ্ণ' নামে গগন-মেদিনী প্রতিধ্বনিত হইল, দেখিতে দেখিতে রামকৃষ্ণ-নাম পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল,—ইংরেজ, আমেরিকান্, জাপানী, সিংহলী—সকলেই আজ রামকৃষ্ণ-নামে মাতোয়ারা। কাহার প্রসাদে?—প্রসাদ! তুমিই বীজ রাখিয়া গিয়াছিলে;—মা-নামের সেই অক্ষয় বীজ আজ শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমায় উপ্ত, অঙ্কুরিত ও কাণ্ডযুক্ত হইয়া ফলে ফুলে ধরিত্রীর প্রাণ শীতল করিতেছে! ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবত অভেদ—এক। তাই তুমি ভক্তচূড়ামণি প্রসাদ,—আজ ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃতে তোমার নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত ও তোমার অমৃতময় সঙ্গীতলহরী সেই দেবদুর্ল্লভকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ গীত হইয়া ভক্তের প্রাণ শীতল করিতেছে। ধন্য তুমি,—ধন্য তোমার মাতৃনাম সাধন! বঙ্গভাষা-জননী আজ তোমাকে পাইয়া গৌরবান্বিত। সৎপুত্র তুমি;—তাই মাকে রত্নগর্ভারূপে বিদেশীর নিকটও সম্মানিত করিতে পারিলে। পিতৃপরিচয়ে মাতৃপরিচয়;—মার পরিচয় তুমি নিজে দিয়া যাইতে পার নাই বটে, কিন্তু করুণাময় পিতা আজ নিজে সে পরিচয়-ভার গ্রহণ করিয়াছেন;—তাঁহার অপূর্ব্ব 'কথামৃত'—'Gospel of Sri Ramkrishna'গ্রন্থে পরিণত হইয়া আজ পৃথিবী ছড়াইয়া পড়িতেছে!

নহিলে—শুনিয়াছি, তুমি সুগায়কও ছিলে না, সুকণ্ঠও তোমার ছিল না,—তথাপি তোমার মা-নামের গুণে অতিবড় পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইত কেন? যেমন তেমন পাষাণ নয়,—সে পাষাণ—সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ—প্রবলপ্রতাপ সিরাজউদ্দৌলা। কিংবদন্তী এইরূপ,—একদা নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ যাইতেছিলেন; প্রসাদ ভাববিভোর প্রাণে আপন মনে গান ধরিলেন। সে মাতৃনাম-ঝঙ্কারে বিশাল ভাগীরথি-বক্ষ আলোড়িত হইল, বিমানে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল,

নৌকারোহী রাজা, রাজকর্ম্মচারী, মাঝি-মাল্লা—সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল,—আর অদূরে অন্য একখানি সুসজ্জিত বজ্‌রার একটি আরোহী তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে দুই নৌকা একত্র সংযোজিত হইল;—নবদ্বীপাধিপতি সভয়ে ঈষৎ কম্পিত কলেবরে দেখিলেন, নবাগত নৌকার আরোহী—স্বয়ং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ স্বয়ং নবাব সিরাজউদ্দৌলা। সে সময়ে তিনি সপারিষদ জলবিহারে বহির্গত হইয়াছিলেন,—দৈবক্রমে এই সাক্ষাৎ। দুই এক কথার পরই সিরাজ প্রসাদকে গান গাহিবার আদেশ দিলেন। নবাবের অনুমতি,—প্রসাদ তখনি গান ধরিলেন। নবাবের বুঝিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া হিন্দীতে তিনি ঐ গান ধরিলেন। গানের মুখপাতটা ধরিতে-না-ধরিতে, সিরাজ যেন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া 'উঁহুঁ' বলিয়া উহা গাহিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, "না, হিন্দী নয়,—তুমি ঐ যে মা মা করিয়া কি গাহিতেছিলে, উহাই গাও।" মায়ের ছেলে প্রসাদ মায়ের মহিমা বুঝিলেন, কৃষ্ণচন্দ্রও ইহা বুঝিলেন; বুঝিলেন, মহামায়ারই এ খেলা; নহিলে এ যোগাযোগই বা হইল কেন,—আর মা-নামের ঈষৎ ঝঙ্কার শুনিয়া এ বন্যব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভীষণ জীব—এখানে বজ্‌রা আনিল কেন? যাই হোক, আজ সুপ্রভাত; গান শুনাইয়া সহজে ও সুকৌশলে আমার অভিসন্ধিটা সিদ্ধ করিতে পারিব।" ফলে, হইলও তাই;—প্রসাদের সেই অমৃতোপম গালভরা মাতৃনাম,—স্থান বিশাল ভাগীরথী-বক্ষ, মাথার উপর উদার অনন্ত আকাশ,—মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইল। গান শুনিয়া সিরাজ মোহিত ও মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় হইলেন।—নবদ্বীপাধিপতির প্রস্তাব—তিনি তদ্দণ্ডেই গ্রহণ করিলেন।

গুণজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে আপন সভাপণ্ডিত করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রসাদ তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ভাবিলেন, 'এক মার চাকরি লইয়াছি, আর কার চাকরিগ্রহণ করিব? বিশেষ, দয়া করিয়া তিনিই এ বন্ধন একবার খসাইয়া দিয়াছেন, তবে আর কেন?' যাই হোক, কৃষ্ণচন্দ্র—প্রসাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে কিছু জায়গীর দান করেন এবং 'কবিরঞ্জন' এই উপাধি দিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন। তারপর প্রসাদকে দিয়া

তিনি একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' লিখাইয়া লন। সত্যের অনুরোধে বলিব, এইটিই প্রসাদের মানবীয় দুর্ব্বলতা। গৃহী কি না? কাম কাঞ্চনের প্রভাব একেবারে এড়াইবেন কিরূপে? ফলে, সে ফরমাজী লেখা ভাল হইল না,—অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের মত হইল না। উহাতে কবির যশঃ-প্রভা মলিন হইয়াছিল। প্রখর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রসাদও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই বিদ্যাসুন্দরের একস্থলে তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন,—'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব মত্ত।'

বস্তুতঃ প্রসাদের পদাবলীই প্রসাদকে অমর করিয়াছে। যেমনি অমৃতোপম সঙ্গীত, তেমনি অমৃতোপম সুর;—আশ্চর্য্য এই,—আজ পর্য্যন্ত এ অভিনব সুর কেহ ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না;—ইহা যেন চির-নূতন। এ অংশেও প্রসাদের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব। অতি অল্প বয়সেই তিনি এই সুরের সৃষ্টি করেন, অথবা স্বয়ং মা তাঁহার কণ্ঠে বিরাজ করিয়া ত্রিতাপজ্বালা-জর্জ্জরিত জীবকে এই করুণার সুর দিয়া যান। আপামর সাধারণ যাহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে, মা সেই ব্যবস্থা করিয়া দেন।

বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে প্রসাদের আনুরক্তি। পরিণত বয়সে সে আনুরক্তি কিরূপ পরিপক্ব অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল, সহজেই তাহা অনুমিত হয়। হিন্দী, পারসী, সংস্কৃত—সকল ভাষাতেই প্রসাদের অল্পাধিক অধিকার ছিল। কিন্তু গীতেই তাঁহার প্রাণ গঠিত। আত্ম-জীবনানুশীলনে স্পষ্টই তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

এক এক করিয়া সকল দিক্ হইতে মুক্তাত্মা মহাপুরুষের জীবন-কথা একটু আধটু আলোচনা করিলাম; কিন্তু তাঁহার অন্তিমের সে অলৌকিক দৃশ্য না দেখিলে এ চিত্র সম্পন্ন হইবে না।

৺ কালীপূজার মহানিশা। অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে মা-শ্মশানেশ্বরীর উদ্বোধন। শক্তিমন্ত্রের উপাসক, শক্তিপূজক, সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের হৃদয়ে আনন্দ আজ আর ধরে না। ভক্তচূড়ামণি—ভক্তের রাজা আজ ষোড়শোপচারে মাঁর পূজা করিবেন। দীপালোকে আজ চারিদিক্ উদ্ভাসিত, সারা-পল্লী ব্যাপিয়া উৎসব। প্রসাদের চণ্ডীমণ্ডপে আজ সাক্ষাৎ মা চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। মা হাসিতেছেন। মায়ের সে মোহিনী প্রতিমা চারি-

দিকে রূপের জ্যোতি ছড়াইয়া আজ যেন নৃত্য করিতেছে। নৃত্যকালী নৃমুণ্ডমালিনী বরাভয়করা, সর্ব্বদুঃখহরা মার সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিলে কে বলিবে, মা আমার ভয়ঙ্করা? অভক্তের ভয়—ভক্তের পক্ষে তিনি সদা মঙ্গলা-লয়। ভক্ত দেখিতেছেন, মার অধরে লুক্কায়িত হাসি, ত্রিনয়নে করুণা-দ্যুতি, রাঙ্গাপায়ে রক্তজবা ও সচন্দন বিল্বদল। যোগীশ্বর সদাশিব সে চরণ-কমল বক্ষে ধারণ করিয়া গভীর যোগে মগ্ন। মূঢ়জনে ভাবিতেছে, মা পতির বুকে পা দিয়াছে। কিন্তু এখানে পতিপত্নী সম্বন্ধ নয়, মাতাপুত্র সম্বন্ধ। শিব ভিন্ন রাজরাজেশ্বরী মার অভয়চরণ এমন ভাবে পায় কে? ব্রহ্মাবিষ্ণু অচৈতন্য, দেবগণ স্তম্ভিত। 'জয় মা জগদম্বে'—ধরাবক্ষ ভেদিয়া, নাদস্বরে এ ধ্বনি উঠিতেছে,—ভক্ত ভাবের কর্ণে তাহা শুনিতেছেন।

মায়ের ছেলে প্রসাদ ভক্তিবিভোর প্রাণে মায়ের পূজায় বসিয়াছেন। তাঁহার বাহ্যচেতনা লুপ্ত, তিনি একরূপ সমাধিস্থ। ললাটে রক্তচন্দন, বক্ষে রুদ্রাক্ষ-মাল্য, মুখে অলৌকিক জ্যোতি, সর্ব্বাঙ্গে পুলক। সে গম্ভীর ধ্যানের মূর্ত্তি, ধ্যানেরই বিষয়,—বুঝাইবার নয়।

'কে বলে মা আমার কালো রে! ঐ দ্যাখ্ মার রূপ নিয়ে ত্রিভুবন হয় আলো রে!'—ভক্তের মানস-দর্পণে, বুঝি এই ভাবে মায়ের রূপের জ্যোতি প্রতিফলিত হইতেছে। অন্তরে বাহিরে তিনি মাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ; ঠোঁট ঈষৎ নড়িতেছে,—বুঝি মায়ের ছেলে মানসে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। ঘোরা তিমিরা রজনী; ভক্তের হৃদয়-গগনে কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের উদয়!—অমা-পূর্ণিমা ইহারই নাম।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ জীবনদীপ নির্ব্বাণের সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়া থাকেন। ভাগ্যবান্ প্রসাদও তাহা পাইয়াছেন। মা-ই তাঁহাকে ইহা জানাইয়াছেন। তাই প্রসাদ মনের সাধে আজ মাকে ডাকিতেছেন, প্রাণ ভরিয়া মার অভয় পাদপদ্ম চিন্তা করিতেছেন, মার সে অপরূপ রূপের ছবি বুকের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিতেছেন। মার পাদপদ্মে লীন হইতে তিনি চান না, আবার তাঁহার 'গণ'রূপে তাঁহারই শ্রীচরণপ্রান্তে বসিতে অভিলাষী। মুক্ত ত তিনি হইয়াই আছেন, জন্ম জন্ম মুক্ত;—চান শুধু তিনি

ভক্তি;—অমলা নির্ম্মলা অহেতুকী ভক্তি;—ভক্তির জন্যই ভক্তি; কল্পতরু মা অবশ্যই সন্তানের সে সাধ পূর্ণ করিবেন।

কোনরূপ আধিব্যাধি শোকতাপ নাই, মৃত্যুর কোন হেতু উপস্থিত হয় নাই,—পূজার কিছু পূর্ব্বে—ধীর প্রশান্তভাবে—প্রসাদ আত্মপরিজনবর্গকে জানাইয়া রাখিয়াছেন,—আগামী কল্য প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও দেহ-প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইবে। তজ্জন্য কেহ কোনরূপ শোক বা হা-হুতাস না করে, তাহাও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। বিশেষ অদ্যকার পূজায় কোনরূপ বিঘ্ন না হয়,—পূজান্তে আত্মীয়-কুটুম্ব নিমন্ত্রিতগণ পরিতোষ পূর্ব্বক মার প্রসাদ গ্রহণ করে,—তাহারও সবিশেষ ব্যবস্থা করিয়া পূজায় বসিয়াছিলেন।

কর্ম্মীর ব্যবস্থামত কার্য্য হইল। যথারীতি মার পূজা, ভোগ, আরতি প্রভৃতি হইয়া গেল। দীপালোক-সজ্জিত মণ্ডপে মার শ্রীমূর্ত্তি, প্রাঙ্গণে বাদ্যভাণ্ডসহ লোকজনের উল্লাস, চারিদিকে দর্শক ও নিমন্ত্রিতগণ,—উৎসব-রজনী নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রতিমার বিসর্জ্জন। দক্ষিণান্ত প্রভৃতি কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হইল। মধুর অপরাহ্নের মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে, বাদ্যভাণ্ডসহযোগে ঘোর ঘটা করিয়া বাহকগণ ৺গঙ্গাতীরে প্রতিমা লইয়া চলিল। পশ্চাতে পট্টবাস-পরিহিত, তপঃপ্রভান্বিত প্রসাদ। পাষাণভেদী করুণস্বরে মা মা বলিতে বলিতে, আনন্দবিভোর প্রাণে মাতৃনাম গান করিতে করিতে, মায়ের ছেলে—মায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

সে এক অলৌকিক দৃশ্য। প্রসাদের ইচ্ছামৃত্যু-কাহিনী অল্পক্ষণ মধ্যে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। তাহা শুনিয়া লোকদল দলে দলে ছুটিয়া আসিল। কেহ বা বিশ্বাসভরে—শ্রদ্ধাবুদ্ধি সহকারে, মুক্তাত্মা মহাপুরুষের অন্তিমদৃশ্য দেখিয়া জন্ম সফল করিবে বলিয়া আসিল; আর কেহ বা অবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া—কৌতুহল-কণ্ডূয়ন পরিতৃপ্তির জন্য—বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে, তথায় সমবেত হইল। বিশেষ সে সময় বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে—প্রায় প্রতি গৃহেই সমারোহে কালীপূজা হইত। বিসর্জ্জনের দিন গঙ্গার ঘাটে মহাধুম পড়িয়া যাইত। ত্রিবেণী হইতে নৈহাটী পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে

যেমন অসংখ্য প্রতিমা. তেমনি গভীর গর্জ্জনে বিসর্জ্জনের বাজনা। সেই বাদ্যভাণ্ডের পশ্চাতে, ধীর প্রশান্তভাবে, ঈষৎ হাসি-হাসিমুখে, প্রসাদ পরিচিত অপরিচিত সকলকেই—ইঙ্গিতে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছেন। তাঁহার নিজ পরিবারস্থ সকলেই তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। প্রসাদের এ সময় বয়স হইয়াছিল। দীর্ঘজীবী পুরুষ,—যোগ ও ভোগ—দুই-ই লাভ করিয়াছিলেন।

ভাগীরথীর তখন বড় সৌম্যশান্ত কমনীয় মূর্ত্তি। তরঙ্গ নাই, গর্জ্জন নাই, একটানা স্রোতও নাই,—গঙ্গা শান্ত ও স্থির। সেই স্থির গঙ্গাগর্ভে, প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে, যে মহাপুরুষ চিরশায়িত হইবেন,—সহস্র সহস্র চক্ষু এইবার তাঁহাকে শেষদেখা দেখিয়া লইল।

বহু পল্লীর বহু প্রতিমা একে একে বিসর্জ্জিত হইল, আর অল্পই বাকী। প্রসাদ ইঙ্গিত করিলেন, সে গুলিও নিঃশেষিতপ্রায় হইল। তখন তিনি ধীরে ধীরে 'জয় মা' বলিয়া গঙ্গাগর্ভে নামিলেন। এক-গলা গঙ্গাজলে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্বহস্তে পূজিতা—তাঁহার চিন্ময়ী প্রতিমা তাঁহার সম্মুখে আনীতা হইলেন। গম্ভীর নাদে মা-মা ধ্বনি করিতে করিতে তিনি জল-স্থল-ব্যোম আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। প্রতিমার পূর্ণজ্যোতিঃ তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। বড় অপরূপ শোভা হইল। মুহূর্ত্তকাল অনিমেষ নয়নে তিনি প্রতিমাপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। আবার মা-মা ধ্বনি উঠিল। 'জয় মা জগদম্বে' বলিয়া তিনি হুঙ্কার ছাড়িলেন। সেই ধ্বনিতে সকলে হরিধ্বনি দিল।

সপ্তমে সুর চড়াইয়া ঈষৎ ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া, হাসি-হাসি মুখে মুক্তাত্মা মহাপুরুষ গান ধরিলেন। গঙ্গার কুলুকুলু তান তাহার সহিত যোগ দিল। দেবগণ অন্তরীক্ষে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। সহস্রচক্ষু সবিতা সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া তাহা দেখিলেন। তীরে সহস্র সহস্র লোক সজলনয়নে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সে অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া জন্ম সফল করিল।

প্রসাদ গাহিলেন,—

'বল দেখি ভাই, কি হয় ম'লে। এই বাদানুবাদ করে সকলে॥'

নির্জ্জন ভাগীরথী-তীরে ভক্তিবিভোর প্রাণে, ভাবের কাণ লইয়া, কেহ দাঁড়াইলে, এখনো বোধ হয় প্রসাদের সেই সিদ্ধস্বর শুনিতে পান,—

'বল্ দেখি ভাই, কি হয় ম'লে। এই বাদানুবাদ করে সকলে॥'

চিত্রার্পিত স্থিরভাবে রোমাঞ্চিত কলেবরে সকলে এই গান শুনিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, কোন আন্দোলন নাই, কোনরূপ উৎকণ্ঠা বা চাঞ্চল্য নাই,—সকলে যেন একমন একপ্রাণ হইয়া ঐ দেব-সঙ্গীত শুনিতে লাগিল।

আবার গান চলিল। মায়ের সিদ্ধ'গণ', ভক্তের অবতার, লোকশিক্ষক, প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ পুনরায় তন্ময় হইয়া, বাহ্যজগৎ ভুলিয়া গাহিলেন,—

"কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এ তনু-তরণী ত্বরা ক'রে চল বেয়ে।"

পুনরায় গান। যেন দেব-রঙ্গমঞ্চে সজীব অভিনয়। প্রসাদ আপন মনে গাহিলেন,—

"তারা তোমার আর কি মনে আছে।
(ওমা) এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেম্‌নি সুখ কি আছে পাছে॥"

আবার গান; উপর্য্যুপরি চারিটি গান। এই শেষগানেই সব শেষ। মর্ম্মভেদী করুণস্বরে প্রসাদ-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো!
তারা-নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো!
এসেছিলেম ভবের হাটে, হাট ক'রে ব'সেছি ঘাটে,
ওমা, শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে কখন লবে গো!"

কি মর্ম্মভেদিনী করুণ-উক্তি! এই এক 'গো' শব্দ শ্রবণে, যেন বুকের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া যায়! হায় প্রসাদ! তোমার এ আন্তরিক মাতৃ-ভক্তির—এ অকপট সাধনার এক বিন্দু অশ্রুও যদি কেহ বঙ্গসাহিত্যে দিতে পারে!

শেষগানটির—"(মাগো) আমার দফা, হ'লো রফা,—দক্ষিণা হ'য়েছে।"

—এই 'দক্ষিণা হয়েছে' অংশটুকু গীত হইবামাত্র,—প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্য-শ্লোক মাতৃমন্ত্র প্রচারক প্রসাদের ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া গেল!—কালীর

কৈবল্য-ধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন! ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে, প্রসাদের মন্ত্রপূত প্রতিমারও বিসর্জ্জন হইল!

সহস্র সহস্র লোকচক্ষুর সম্মুখে, দিব্য দিবালোকে, এক-গলা গঙ্গাজলে দাড়াইয়া,—দিব্যকণ্ঠে মাতৃনাম গান গাহিতে গাহিতে সজ্ঞানে গঙ্গার অতল-গর্ভে চিরশয়ন,—'সশরীরে কৈবল্য-ধাম গমন' ভিন্ন আর কি বলিব?—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 'কৈবল্য-ধাম' আর কি আছে জানি না। থাকে যদি, এমনি দিনের—এমনি মুহূর্ত্তের গঙ্গার সহিত সে স্থানের যোগ আছে।

'ভাবে মৃত্যু' ইহারই নাম। এমন মৃত্যু কে না কামনা করে? প্রসাদ এই মহান্ আদর্শ রাখিয়া এখনো বঙ্গের বহু ভক্ত-পরিবারের পূজা পাইতেছেন!

এ হেন প্রসাদের পূত-চরিত্তের কথার সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের যোগ বাঞ্ছনীয় মনে করি। কবির কাব্য বা পদাবলী ত পাঠ করেন সকলেই; কিন্তু কোন্ গুণে, কি শক্তিবলে কার কৃপায়, তিনি এ অমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ দিন দিন বড় হীন ও মলিন হইতেছে। এ দুর্দ্দিনে রামপ্রসাদের ন্যায় ঈশ্বরজানিত মহাত্মার পুণ্যস্মৃতি অনুশীলনে ফল হয়। তাই, কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা তাঁহার মহদাদর্শের মূলমন্ত্র লইয়া কিছু বেশী সময় কাটাইলাম এবং এই সঙ্গে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য-প্রসঙ্গেরও কিছু আলোচনা করিলাম। কেন করিলাম, গ্রন্থের উপসংহার ভাগে তাহা বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। আমার এই মাতৃভাষা আলোচনার আদিগুরু প্রসাদ। বালককাল হইতে আমি তাঁহার ভক্ত। তাঁহার প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশীমাত্রায় আসিয়াছে। ছেলেবেলা থেকে প্রসাদ-সঙ্গীত ও প্রসাদীসুর আমার হৃদয়ের উপর বিশেষ আধিপত্য করিয়াছে। এ জীবন-সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণও বুঝি আমার সেই ভাগ্যফলে। ভক্তকে না ধরিলে ত ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। সাহিত্যের মধ্যে দিয়া আমিও তাই সেই ভক্ত ও ভগবানের যোগ দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

বলিয়াছি, বঙ্গসাহিত্যের এক প্রান্তে রামপ্রসাদ, আর এক প্রান্তে

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব,—মধ্যে বৈতরণী। এ বৈতরণী সকলকেই পার হইতে হইবে। সাহিত্যধর্ম্ম যখন জীবনের ব্রত, তখন তাহার ভিতর দিয়াই—যো সো করিয়া তাহা করিয়া লইতে হইবে। গুরুকৃপা থাকে ত হইবে,—নচেৎ এই শাদার পিঠে কালী ঢালা মাত্র।

আমার মতে যে সকলকে চলিতে হইবে, সে স্পর্দ্ধা রাখি না। রাখা উচিতও নয়। যাহার যে ভাব, তাহার সেই ভাবেই থাকা উচিত। তবে একটা কিছু আদর্শ দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকা চাই। দয়াল ঠাকুর এই উপদেশই দিয়া গিয়াছেন। কাহারও ভাব ভাঙ্গিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। 'ভাবের ঘরে চুরি'—এই কঠোর অনুশাসন-বাক্যে জীবকে বিশেষ সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। ভক্তের ভগবানের যে উক্তি, প্রসাদ এবং আর আর ভক্তও বহুপূর্ব্বে সেই অমৃতময়ী উক্তি জীবকে বিলাইয়া গিয়াছেন,—'যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়।' তাই ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশ,—'ভক্ত, ভগবান্, ও ভাগবত—এক।'

আমি এই মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রসাদকে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক হইয়াছে বুঝিতেছি। তবে ভরসা আছে, আমার অবর্ত্তমানে, পরবর্ত্তী কোন সৌভাগ্যশালী লেখক ইহার সংস্কার করিবেন। পূর্ব্বপুরুষের দান বলিয়া, তিনি ইহা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না,—মনে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল রহিল।

বড় দুঃখে এখানে একটা কথা লিখিতে হইতেছে। 'প্রসাদ-চরিত' আলোচনায়,—এ বিষয়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন,—"ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও একটু প্রসিদ্ধি হইলে তৎসম্পর্কে কতকগুলি অলৌকিক প্রবাদের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কালী কন্যারূপে কবির বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন; কাশীতে যাইতে অনুমতি দিয়া পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন; কালী নাম করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তাঁহার তনুত্যাগ হয়,—এই সব জনশ্রুতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া ছাপাইতে অনেক সময় ও ব্যয়ের আবশ্যক, তাহা আমাদের

কিন্তু কথাটা কি ঠিক? বিজ্ঞ ও সুধিজনোচিত মন্তব্য কি এই? সকলেই আপন আপন বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী কাজ করিতে পৃথিবীতে আসে; কাজ করিয়া চলিয়া যায়। 'কালী কন্যারূপে প্রসাদের বেড়া বাঁধিয়া যে দেন নাই, দীনেশ বাবু ইহা জানিলেন কিরূপে? 'কালী নাম গান করিতে করিতে যে প্রসাদের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তনুত্যাগ হয় নাই'—তাহাই বা তিনি অবগত হইলেন কোন্ উপায়ে? মা-অন্নপূর্ণা যে প্রচ্ছন্ন-বেশে তাঁহার সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া তাঁহার মণ্ডপে কিছু লিখিয়া রাখিয়া যান নাই,—এ ধারণাই বা তাঁহার কি হেতু হইল? তিনি যাহা অবিশ্বাস করিতেছেন এবং অন্ধবিশ্বাস বলিয়া তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, আর একজনের পক্ষে ত তাহা ধ্রুব-সত্য ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিরূপে গণ্য হইতে পারে? সে ত তাঁহারই নজীরে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে,—অবিশ্বাস-প্রেতিনীই তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দিয়াছে,—তাই তুমি এমন কথা বলিতে সাহসী হইলে। বলিবে, 'অলৌকিক প্রবাদ ও জনশ্রুতি এই রূপই হয়।' কিন্তু তাই বা হয় কেন? তোমার আমার বা জনসাধারণের ভাগ্যেই বা সে 'প্রবাদ' ও 'জনশ্রুতি' ঘটে না কেন? যাহা চিরপ্রচলিত ও দশমুখে কথিত, বুঝিতে হইবে, তাহার মূলে কিছু-না-কিছু সত্য আছে। তবে ডাল-পালা কিছু বাড়িয়া যায় বটে। তা কোন্ জিনিসে তা নাই? দীনেশ বাবু যে অত শ্রম করিয়া অত দিন ধরিয়া সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাও কি বর্ণে বর্ণে সত্য? গ্রন্থ ত দূরের কথা, আমরা পরস্পর সাক্ষাৎ-সন্দর্শনে যে আলাপ করি, দু'দিন পরেই কি বাজারে তাহাই অতিরঞ্জিত হইয়া দাঁড়ায় না: অতিরঞ্জিতও হয়, আবার আসল কথারও অনেক ছুট-ফাঁক-বাদ পড়ে। বৈষয়িক কোন বিষয়ের কথা হইলে না হয় দীনেশ বাবুর এ মন্তব্য উপেক্ষা করিতাম; কিন্তু ইহা যে সাধকের সাধনসমুদ্ভূত ঈশ্বরীয় কথা,—ভক্তের হৃদয়-অভিব্যক্তি স্বরূপ আধ্যাত্মিক জগতের কথা? এ সব গুরুতর বিষয় কিরূপে এড়াইয়া যাই বল? বিশেষ, এই সময়। দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়াও অনেক সময় কথা কহিতে হয়। অবিশ্বাস ও নাস্তিকতায় দেশ ভরিয়া রহিয়াছে,—এ দুর্দ্দিনে প্রসাদের ন্যায় মাতৃভক্ত মহাত্মার সাধনার কথা অমন বিদ্রূপের ভাষায় বলিতে নাই। বলিলে

অপরাধ হয়। অন্ততঃ প্রসাদের ভক্তগণ উহা পাঠে ব্যথিত হন ও কষ্ট পান। আর প্রসাদ? সে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, এখন স্তুতিনিন্দার অনেক উর্দ্ধে; আমাদের ন্যায় সমালোচকের এরূপ মন্তব্যে তাঁহার কিছু যাইবে আসিবে না। আকাশের গায় নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলে তাহা নিজের গায়েই নিক্ষিপ্ত হয়;—দীনেশ বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ লেখকের এটি বুঝা উচিত ছিল। বিশেষ তাঁহার ঐ উদ্ধৃত অংশের শেষছত্রটি পড়িয়া আমাদের হাসিও পায়, দুঃখও হয়;—"এই সব জনশ্রুতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া ছাপাইতে 'অনেক সময় ও ব্যয়ের' আবশ্যক, তাহা আমাদের এখন আয়ত্ত নাই।"—কেন, ৬।৭ শত পৃষ্ঠার অত বড় বইখানা ছাপাইবার তিনি সময়ও পাইলেন এবং ব্যয়ও সংগ্রহ করিলেন,—আর বোঝার উপর এই শাক-আটীটা দিতেনই বা? দিলে, ভক্ত-সমাজ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত।—না দীনেশ বাবু, না, এমন ভাবে লেখনী চালনা করাটা আপনার ভাল হয় নাই। রামু শামু লিখিলে, হয়ত আমরা আদৌ এ কথা উত্থাপনই করিতাম না;—কিন্তু আপনার নাকি একটু শক্তি আছে, একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে,—তাই "মৃতের সম্মান রক্ষার্থ" এই অপ্রিয় কথাটি তুলিতে হইল এবং পরে হয়ত আরও তুলিতে হইবে। কেননা, আপনি পরবর্ত্তী কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রকে, এবং ভক্তকবি দাশরথি রায় প্রভৃতিকে বিস্তর গালি দিয়াছেন,—এমন কি, স্থান বিশেষে অপমানের ভাষা অবধি প্রয়োগ করিয়াছেন,—আপনার হাত কাঁপে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। কেননা, সাধক ও ভক্ত মাত্রেই আমাদের আচার্য্য; পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বা লেখকগণকে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া মনে করি। তাঁহাদের রচনা পাঠে আমাদের কিছু-না-কিছু উপকার হইয়াছে। আমরা যতই কেন বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান্ হই না, পিতৃ-পিতামহকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিব না, তা ধর্ম্মেও নয়, কর্ম্মেও নয়। তাঁহাদের প্রতি যেটুকু ভক্তি বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা স্বাভাবিক ও একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। তারপর তাঁহাদের লেখার দোষ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে,—চরিত্রে কোন কলঙ্ক থাকে,—শিষ্ট ভাষায়, সংযত-ভাবে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নহিলে, মনে রাখিবেন,—আমাদের এই নজীর দেখিয়া, আমাদের পরবর্ত্তী লেখক-ধুরন্ধরগণও আমাদিগকে এই

ভাবে—কি ইহা অপেক্ষা অধিক ভাবে—সুদসমেৎ—পুষ্প-চন্দন দিয়া পূজা করিবে। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছেই আছে, তা সঙ্গে সঙ্গেই হউক আর দু'দিন পরেই হউক। আশা করি, এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা পাঠ করিয়া বন্ধুবর আমাদের উপর রাগ করিবেন না।—নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে, আমি তাঁহার অতি কঠোর কথার যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রসাদের এই প্রসঙ্গে আমি সাধককবি **কমলাকান্ত ও নরেশচন্দ্র** প্রভৃতি দুই এক জন কালীভক্ত মহাত্মার নামোল্লেখ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কমলাকান্ত সাধক, কবি ও পণ্ডিত-ব্যক্তি ছিলেন। বর্দ্ধমান রাজসভার তিনি একজন প্রসিদ্ধ সভাপণ্ডিত ছিলেন। কালে ঐ রাজবংশের রাজা তেজশ্চন্দ্রের গুরুরূপে তিনি বরিত হন। সুতরাং সাংসারিক সচ্ছলতার সহিত কমলাকান্তের ইষ্টপূজা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়াছিল।

ভক্ত কমলাকান্তের শ্যামাবিষয়ক গান প্রসিদ্ধ। এক সময়ে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ইহাঁর গান গীত হইত। এখনো যে ভক্তসমাজে না হয়, তাহা নহে। তবে সত্যের অনুরোধে বলিব, ইহাতে প্রসাদের সেই প্রাণ-মাতোয়ারা মহামাতৃভাবের মহাবিকাশ নাই। গানগুলি পাণ্ডিত্য, ভাবুকতা ও কবিত্বের পরিচায়ক হইলেও, প্রসাদের সেই আকর্ষণীশক্তি ইহাতে নাই। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, প্রসাদ-সঙ্গীতও তেমনি এক লহমার মধ্যে হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রিয়া করিতে থাকে; মুহূর্ত্তের মধ্যে মানুষ কেমন হইয়া যায়। কমলাকান্তের কি পরবর্ত্তী কবির সাধনসঙ্গীতে সে শক্তি নাই। যাই হউক, ভট্টাচার্য্য কমলাকান্ত যে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক এবং এক অংশে সিদ্ধপুরুষ, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তাঁর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, পত্নীর শব চিতানলে পুড়িতেছে, তদ্দর্শনে সংসার বিরাগী কবি, সেই শ্মশানে দাঁড়াইয়া, হাতে তালি দিতে দিতে গাহিলেন,—

'কালি! সব ঘুচালি লেটা।'

ভক্ত একবার দস্যুহস্তে পতিত হন। দস্যুগণ তাঁহাকে প্রাণে মারিবার

া। মাতৃভক্ত মহাত্মা তখন হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে মাকে ডাকিতে লাগিলেন,—

"আর কিছু নাই মা শ্যামা,
(কেবল) তোমার দুটি চরণ রাঙ্গা।"

এমনি আবেগে ও আকুল উচ্ছ্বাসে এবং পূর্ণ নির্ভরতায় এই গীতি-ধ্বনি উঠিল, যে, দস্যুদলের বজ্রকঠোর হৃদয় ও তাহাতে গলিয়া গেল;—তাহারা তাঁহাকে ফেলিয়া পলাইল,—ভক্তবৎসলা অভয়া ভক্তের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

কমলাকান্তের কয়েকটি গানের নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। দুই একটি গান কিন্তু রামপ্রসাদের বলিয়া আমাদের মনে হয়।

(১) "আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ, আর আমি দেখি,
আর যেন মন কেউ না দেখে।" * * *

(২) "সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী,
তুমি আপনি নাচ, আপনি হাস,
আপনি দেও মা করতালি।" * * *

(৩) "যখন যেমন রূপে মা! রাখিবে আমারে।
জনম সফল যদি না ভুলি তোমারে॥" * * *

(৪) "আপ্‌নাতে মন আপনি থেকো, যেয়োনাক কারো ঘরে।
যা চাবি তাই ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
কত মণি-মুক্তা প'ড়ে আছে, আম্‌র চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে॥" * * *

(৫) "মন গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমন নাচাও, তেমনি নাচে॥" * * *

(৬) "যতন কোরে ডাকি তোরে, আয় দেখি মন শুয়াপাখী।
কালী-পাদপদ্ম-পিঞ্জরে, পরমানন্দে থাকো দেখি॥" * * *

(৭) "পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে রে।
বিবসনা সমরে, নরকর কোমরে, অসিবর বামকরে ধরে॥" * * *

(৮) "শ্যামা-ধন কি সবাই পায়। অবোধ মন বুঝনা একি দায়॥

শিবেরো অসাধ্য সাধন, মন মজনা মার রাঙ্গা পায়॥" * * *

ভক্তি-রাজ্যে, প্রসাদের পরেই কমলাকান্তের আসন।

কমলাকান্তের পরবর্ত্তী বহু কবিও এইরূপ শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সকল গান কতক লুপ্ত, কতক লোকের মুখে মুখে গীত। সকলের সম্যক পরিচয় দেওয়া একরূপ অসম্ভব।

নরেশচন্দ্রের একটি গানের দুই ছত্র মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রসাদ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলাম।

"যে ভালো ক'রেছ কালী, আর ভালোতে কাজ নাই।
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চ'লে যাই।"

নদীতে যেমন বাণ আসে, ভাবরাজ্যেও তেমনি এক একটা ভাবের বাণ আসে—সে বাণে সব একাকার হইয়া যায়। কিন্তু বেশী দিন এ ভাব থাকে না। সাম্য বা সমতা নাকি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, তাই সে ভাব অন্তর্হিত হইয়া যায়। বৈষম্য না থাকিলে মায়ার সংসার চলে না, সৃষ্টির কাজ বা প্রকৃতির খেলা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়,—তাই সেই মহামায়ার ইচ্ছাতেই আবার সব বৈষম্য বা দ্বন্দ্ব-দ্বেষ প্রভৃতি চলিতে থাকে।

ভক্তের ভগবান্ রামপ্রসাদকে দিয়া যে কাজ করাইলেন, কিছুদিন সমগ্র বঙ্গভূমি তাহাতে আলোড়িত হইল;—শত শত কবি—শত শত সাধক মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গম্ভীর মা মা রবে গগন-মেদিনী পূর্ণ করিলেন; চারিদিকে শক্তিপূজা ও শক্তি-উপাসনার ধুম পড়িয়া গেল; শত শত সহস্র সহস্র সাধন-সঙ্গীত বিরচিত হইতে লাগিল, প্রসাদের সাধনপথে ও সিদ্ধ-সঙ্গীতে তাহা সহায়ও হইল;—কিন্তু মহামায়ার ইচ্ছায়, প্রসাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে স্রোত রুদ্ধ হইয়া আসিল। স্রোত রুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গু সমানে বহিতেছে; আবার কোন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইলেই সে স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে হইবে। প্রকৃতির নিয়মই এই।

ভারতচন্দ্র।

ধন্য নবদ্বীপ! ধন্য কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ! বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন, পুষ্টি, বিকাশ—এই সময়েই চরমরূপেই হইতে থাকে। আর সে চরমাবস্থার অগ্রণী—রায় গুণাকর কবিশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্র; ভাষাকবিতার ও শব্দ-চিত্রের সুনিপুণ চিত্রকর—মহাশিল্পী ভারত। প্রকৃতই ভারতের তুলনা ভারত। এ অংশে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ হন নাই, হইতে পারেন নাই।

ভারত বিদ্বান্, প্রতিভাবান্ ও স্বভাবকবি। বর্ণনায় ও ভাষার উন্মেষণায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার ভাষার স্রোত তরঙ্গিণীর ন্যায় তর তর বেগে প্রবাহিতা,—কষ্টকল্পনার লেশমাত্র তাহাতে নাই। তাঁহার বিবিধ ছন্দঃ, বিবিধ অনুবন্ধ, বিবিধ রসের অবতারণা, বিবিধ উপমা—প্রকৃত কবিজনোচিত প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির সম্যক্ পরিচায়ক। ভাষায় এরূপ অসামান্য অদ্ভুত অধিকার—আজ পর্য্যন্ত কোন কবিতে দেখি নাই। যেন ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার লেখনী-মুখে আবেগময় ভাষার স্রোত মন্দাকিনীর ন্যায় প্রবাহিত। আদি, করুণ, বীর, রৌদ্র, হাস্য অদ্ভুত, বীভৎস, ভয়ানক, শান্ত—এই নবরসেই তাঁহার মহতী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত মহাকবি আখ্যা যদি কাহাকে দিতে হয়, তবে আমরা নিঃসঙ্কোচে ভারতচন্দ্রকেই তাহা দিব। রুচিবাগীশ মহাশয়েরা তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের

অশ্লীলতা দোষ ধরিয়া তাঁহাকে ভদ্র-সমাজ হইতে, সৎসাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চান, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাঁহাদের লেখাতে তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক পূতিগন্ধময় পাপ-আবর্জ্জনারূপ অশ্লীলতা—প্রচ্ছন্নবেশে রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। অথবা দেখেনও বেশ, মনে বুঝেনও বেশ, কেবল মনকে চোখ ঠারিয়া, ভাবের ঘরে চুরি করিয়া, তাঁহারা বড় হইতে চান। কিন্তু তাহা হয় কি? মেকি চলে কি? হুজুগপ্রিয় পল্লবগ্রাহী বাঙ্গালী দিনকত তাঁহাদের 'সুরুচির' বক্তৃতায় ভুলে বটে, কিন্তু প্রকৃতির এমনি প্রতিবিধান যে, তাঁহারা নিজের বিদ্যাতেই নিজে ধরা পড়েন। বঙ্গসাহিত্যের মহারথ—স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, কাহাকেওইহাতে বাদ দেখি না। অথবা তাঁহাদেরই বা দোষ কি? যাহা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ, তাহা হইবেই হইবে। কাব্য লিখিতে বসিয়া, মানবচরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে লেখনী ধারণ করিয়া, মনুষ্যের প্রকৃতিবর্ণনা কবি এড়াইবেন কিরূপে? মানবচরিত্রের ফটো তুলিতে গেলে সৌন্দর্য্যের সারভূত রমণীর রূপ ও প্রণয়—বাদ পড়ে কি করিয়া? ভারতচন্দ্রের ত তবু একটা জোর কৈফিয়ৎ দিবার আছে যে, তিনি বিদ্যা ও সুন্দরকে কালীর কিঙ্করী ও কিঙ্কররূপে কাব্যের রঙ্গমঞ্চে আনিয়া অভিনয় করিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক রুচিবাগীশ মহাশয়দের লেখনী কে, তাহা হইতে শতগুণে ভ্রষ্টা—প্রচ্ছন্না রঙ্গিণীদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তরলমতি যুবক যুবতীর মাথা খাইতেছে! পালিস করা সভ্যতার ভাষায় 'প্রেম' বা 'পবিত্র প্রণয়' বর্ণন করিবার ব্যপদেশে তাঁহারা দেশের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়া যাইতেছেন, পরবর্ত্তী বংশধরেরা তাহার বিচার করিবেন।

হ'রে প্যালার গ্রন্থ ধরিয়া বিচার করিতেছি না; থিয়েটারী নাচ-গান বা রং-সং-ঢংয়ের বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়া নজীর সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই;—বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুই জন বাঘা-ভাল্‌কো লেখকের গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যে বঙ্কিম-চন্দ্র 'বঙ্গের উপন্যাস-গুরু' বলিয়া সর্ব্বজন মান্য ও একরূপ জগৎবরেণ্য; যে রবীন্দ্রনাথ নব্যলেখক-লেখিকাগণের ও এক শ্রেণীর কবিকুলের মাথার মণি এবং উপাস্য দেবতাস্বরূপ;—তাঁহাদের নায়ক নায়িকার চিত্র ধরিয়া

যে, বিদ্যাসুন্দর হইতে শতগুণ পঙ্কিল-চরিত্র উদ্ধৃত করা যায়? 'বিষ-বৃক্ষের' দেবেন্দ্র দত্ত বৈষ্ণব সাজিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া ভদ্রলোকের অন্দরে প্রবেশ করিয়া 'কাঁটা-বনে তুল্‌তে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল। মাথায় প'রলেম্ মালা গেঁথে, কাণে প'রলেম্ দুল॥''—ইতিশীর্ষক গান গাহিতে পারে; রবীন্দ্রনাথের বড় আদরের "চোখের বালীর" প্রচ্ছন্না রঙ্গিণী বিনোদিনী দুটো ভদ্রঘরের ছেলেকে লইয়া দীর্ঘকাল "লাট্টুখেলা" খেলিতে পারে,—ইস্তক 'চড়ুই-ভাতী' প্রেমের খেলা, ফটো তোলা হইতে দুই নায়কের ডুয়েলের কাছাকাছিও যাইতে পারে; পরপুরুষের প্রণয়পত্র যে বিধবা—চাপিয়া ধরিয়া? বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া থাকিতে পারে; যে কবির অস্ফুট "নষ্টনীড়ের" কামজ-চিত্র "চোখের বালী"তে উৎকর্ষ প্রাপ্ত;—তাঁহাদের হইতে প্রায় দুই শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনায় যে কি মহাপাতক হইয়াছিল, বুঝিতে ত পারিলাম না,—কেহ বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব। এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলিয়া আর বন্ধুসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দেখিতেছি, মৃত মহাত্মাদের ন্যায্যপ্রাপ্য সম্মান প্রদান করিতে অনেকেই এখন নারাজ;—তাই এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইল।

কুক্ষণে—অতি অশুভক্ষণে—বঙ্গের একজন শক্তিশালী প্রবীণ লেখক—মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গদর্শনে" (বঙ্কিম বাবুর আমলের কাগজে) ভারতচন্দ্রের সমালোচনা ব্যপদেশে এই বিষ ছড়াইয়াছিলেন, সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত—সেই বিষের প্রসার ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। অক্ষয় বাবু যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এই;—

"আমরা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রকে তাঁহার স্রষ্টা মালিনীর সহিত এক বলিয়া বিবেচনা করি। কবি ভারত ও হীরামালিনী এক; বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়নকর্ত্তা ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কর্ত্রী এক।

"এক্ষণে মালিনীর স্বভাবের সহিত এই কাব্যের ভাবের তুলনা করুন।** আমাদের কবি ভারতও তাই। প্রথমতঃ কাব্যভাব দেখুন। হীরার সেই গালভরা পান, আর কাব্যের সেই আদিরসপূর্ণতা। হীরার সেই মাজা দোলা, আর ভারতের নাচনি ছন্দ। হীরার সেই সুচিক্কণ পরিষ্কৃত দন্ত; আর কাব্যের সেই মার্জ্জিত স্বভাব। হীরার সেই মুচ্‌কে মধুর হাসি,

আর ভারতের সেই সহজ প্রসাদ-গুণ। হীরাও হাসে, ভারতের কবিতাও হাসে।* * *

"এমন কদর্য্য স্বভাবান্বিত কবিও বঙ্গদেশে সমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কেন? মালিনীর যে সকল গুণ থাকাতে চেঙ্গড়া-মহলে তাহার পসার ছিল, ভারত সেই সকল গুণেই বঙ্গীয় চেঙ্গড়া-মহলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

"এখনও ভারত সমাদরে কিঞ্চিৎ থাকুন, তাহাতেও আপত্তি নাই এবং ভারত ও তাঁহার মালিনী এখনও চেঙ্গড়া ভুলাইয়া খাইতে থাকুন, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু যে যুবক মালিনীর বাড়ী বাসা লইয়া থাকে, তাহার দিকে সকলের একটু দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়; আর যে সকল বঙ্গীয় মহাজন ভারতকে মালিনী স্বভাবাপন্ন কবিযোগ্য আদর অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিতে চান, তাঁহাদের দিকেও সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।"

দেখুন, সরকার মহাশয়ের লেখার ভঙ্গি! কবিকে একেবারে জাহান্নমে পাঠানোই যেন তাঁহার অভিপ্রেত। অক্ষয় বাবু লিপিকুশল বটেন, লেখাও তাঁহার চমৎকার বটে, কিন্তু তাঁহার বিচার বা বিশ্লেষণ এখানে তেমন পাকা নয়। ফলে তাঁর দেখাদেখি—রামু শামু দামু যে কেহ কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্রের কথা লিখিতে যায়, সেই কবিকঙ্কণকে বড় করিয়া ভারতকে সর্ব্বপ্রকার নিম্নে ফেলিয়া দেয়। এখনকার 'শিক্ষিত-সমাজ' মানে পদস্থ ইংরেজীওয়ালা; ইহাঁদের মন যোগাইয়া কথা কহিতে পারিলে একটু 'মান' হয় বটে, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সে মানের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করেন। 'বাপকে বড় করিতে হইবে বলিয়াই কি খুড়াকে ছোট করিতে হয়?' বাপ ত বড় আছেনই; বলিলেও আছেন, না বলিলেও আছেন; পরন্তু পিতৃব্যও যদি সেই পিতৃগুণে—অথবা তাঁহা অপেক্ষা অধিক গুণে গুণবান্ হন,—ধর্ম্মনিষ্ঠ সন্তানের কি তাহাও মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য নয়? কবিকঙ্কণ ত বড় আছেনই, ভারত তাঁহা হইতে মূল আখ্যান, ভাব ও চরিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন,—তাহাও ঠিক;—সে ত সকলেরই জানা-কথা,—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, সবটা

জড়াইয়া ধরিলে, ভারত বড় নয় কি ? নিরপেক্ষ হইয়া সত্যের পানে চাহিয়া এটি বলিতে হইবে। তোতাপাখীর মত পরের কথা আবৃত্তি করিলে চলিবে না। 'অমুক বলিয়াছেন' 'অমুকের মত পণ্ডিত ব্যক্তি এই মত দিয়াছেন',—ইহা বলিলেও শুনিব না,—সত্য তোমার নিজের কি মত ও বিশ্বাস, সংযুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। ভুল আমাদেরও হইতে পারে, হইয়াও থাকে ; কিন্তু আমরা তখনি তাহা স্বীকার করি। তোমরা ওস্তাদ, মনে বুঝিলেও মুখে ভুল স্বীকার করিতে চাও না ;—এই না বিড়ম্বনা ?

অক্ষয় বাবু কবিকঙ্কণের বড় ভক্ত, তাহা আমরা অনেককাল হইতে জানি। তাঁহার "নবজীবন" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে এক সময়ে তিনি কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সহিত অনেক মসীযুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও অবগত আছি। রবীন্দ্র বাবুও তাহার উত্তর—বোধ হয় তাৎকালিক "বালক" নামক মাসিকপত্রে দিয়াছিলেন, তাহারও কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি ;—সত্যের অনুরোধে বলিব, সে বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রবাবুর সহিত একমত। অক্ষয় বাবু কবিকঙ্কণকে বড় করিতে গিয়া যেন নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সেই—"দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। আমানী খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥"—ইহা খাঁটী কবিত্ব বলিয়া অক্ষয় বাবু স্বীকার করেন, রবীন্দ্র বাবু বলেন, ঘটনাটি ঠিক ঠিক হইলেও এরূপ বর্ণনা কবিত্বের পরিচায়ক নহে। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে রবীন্দ্র বাবুর উক্তিই ঠিক। কবিকঙ্কণের সমালোচন-প্রসঙ্গে তাহা আমরা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি।

এখন কথা হইতেছে, অক্ষয় বাবুর দেখাদেখি, কথিত 'শিক্ষিত'-সমাজে কবিকঙ্কণের মৌখিক একটু মান আছে,—ভারতচন্দ্র যেন একেবারে জাহান্নমে গিয়াছেন। তা, যে—ঐ দুই মহাকবির কাব্যাবলী কিছু মাত্রও না পড়িয়াছে, বিজ্ঞের মত সেও ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে। প্রকাশ না করিলে যে, সে বেচারা 'সভ্য-সমাজে' আসন পায় না ?—হায় রে গড্ডালিকা-প্রবাহ !

যাহা হউক, অক্ষয় বাবু যে, ভারতচন্দ্রকে খাটো করিয়াছেন, ইহাই আমাদের আক্ষেপ। আবার সে লেখা, যে সে কাগজে স্থান পায় নাই,—

বঙ্কিম বাবুর সাবেক "বঙ্গদর্শন" অক্ষয় বাবুর সে প্রবন্ধ অঙ্গে ধারণ করিয়া জয়ধ্বনি পাইয়াছিল। খুব সম্ভব, বঙ্কিম বাবুরও ইহাতে সহানুভূতি ছিল। সেইটিই হইয়াছিল,—যত অনর্থের মূল!

কেননা, সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিতে, তাঁহার ঈষৎমাত্র অঙ্গুলি হেলনে, 'শিক্ষিত'-সমাজ উঠব'স করিত, এখন ত নিশ্চিতই করে। সেই বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' যখন ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, তখন আর ভারতের মূল্য কোথায়?

সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক মাননীয় রমেশচন্দ্র, এতটা না করুন, কবিকঙ্কণের তুলনায়, ভারতকে বিলক্ষণ নামাইয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধেও বটে, আর তাঁহার চরিত্র-চিত্র সম্বন্ধে ত বটেই। রমেশ বাবু তাঁহার "Literature of Bengal" নামক গ্রন্থের এক স্থলে বলিয়াছেন,—"We need scarcely remind our readers, however, that in all these descriptions Bharat is a close imitator of Mukunda Ram. * * * In character-painting however, Bharat Chandra cannot be compared with the great master whom he has imitated. * * * And in all the higher qualifications of a poet, in truth, in imagination, and even in true tenderness and pathos such as we meet with in almost every other Bengali poet, Bharat Chandra is singularly and sadly wanting."

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ও তাঁহার "সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন,—"অনেক স্থানে ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ছায়া মাত্র। উদ্ভাবনী শক্তিতে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।" ভারতের কবিত্ব সম্বন্ধেও বসুজ মহাশয়ের তেমন আস্থা ছিল না। বাহুল্যভয়ে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরী দেখাইয়াছেন, আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তিনি একেবারে অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া—উলঙ্গভাবে ভারতের উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি করিয়াছেন! পড়িলে বড় ক্ষোভ হয়, দুঃখ হয়,—উদ্দেশে ভারতের মুক্তাত্মার নিকট ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা হয়। কেননা,

আমাদের অকৃতজ্ঞতা পাপের সীমা নাই ;—বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মহাকবিকে সামান্য 'অশ্লীলতার' ধূয়া ধরিয়া আমরা তাঁহাকে কোথায় ফেলিয়াছি। দীনেশ বাবুর সেই কটূক্তির একটু নমুনা দেখুন। আমাদের স্থানাভাব বশতঃ তাঁহার মন্তব্যের বিভিন্ন স্থান হইতে আমরা এই নমুনা উদ্ধৃত করিলাম ;—

"আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতা, ভাবের গুরুত্ব হিসাবে অতি নিকৃষ্ট মনে করি। * * * বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভগ্ন পতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত ; কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য। * * * বিজাতীয় আদর্শ অনুসরণ করার দরুণই হউক, কি অন্য কোন কারণে হউক, বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে। এই চরিত্রের ভাব কতকটা তাঁহার স্বীয় প্রতিভার অনুরূপ। * * * কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন ;—এই অবলম্বন অর্থে একরূপ চৌর্য্যবৃত্তি। * * * মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন। * * * বিদ্যার রূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভারতচন্দ্র নিজের বিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। * * * ভারতচন্দ্র সেই রাগের অতিরঞ্জন চেষ্টা করিয়া ছবিগুলি বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। * * ভারতচন্দ্রের তুলি প্রাণ দিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যে কোন স্থানেই, হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী দুঃখ কি স্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের কোন অংশ পবিত্র করে নাই। * * * এই বিকৃত রুচি ও পদলালিত্য কাব্য সাহিত্যের আদর্শ হইল। * * * গম্ভীর ভাব বিরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যস্ত, অন্নদামঙ্গলরূপ ধর্ম্মমণ্ডপে তিনি বাইনাচ দেখাইয়াছেন। * * * বিদ্যাসুন্দরের সিঁদকাটা বিলাসের অভিনয় ও কু—সংযোগে গৃহস্থের বাড়ীর কন্যাকে বশীকরণ—এ সমস্ত সম্ভবতঃ মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক। পার্শী অনুরাগী ধর্ম্মভীরু কবিগণ চণ্ডীপূজার বিল্বপত্র কাণে গুঁজিয়া মুসলমানী কেচ্ছা শুনাইয়াছেন ; তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চ্চিত ললাট, কর্ণলগ্ন বিল্বপত্র ও মুখে "কালি কালি কালি কালি কালিকে। চণ্ডমুণ্ড মুণ্ডখণ্ডি, খণ্ডমুণ্ড মালিকে॥" প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিদ্যাসুন্দর পূজামণ্ডপে গাওয়াইছেন ; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের উপর মুসলমানী সাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট

ভারতচন্দ্রের উপর প্রায় আগাগোড়াই দীনেশ বাবুর এইরূপ শ্লেষ ও বিদ্রূপের উক্তি। অনুগ্রহ করিয়া কেবল তিনি ভারতকে 'শব্দমন্ত্রের' একটি জাঁকালো সার্টিফিকেট দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার ভঙ্গিটাই যেন কেমন এক রকমের। ভারতকে খাটো করিবার জন্য যেন তিনি প্রস্তুত হইয়াই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এমন কি, কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগটার উপরও—এমন কি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁহার আক্রমণের বিষয়। অবশ্য আমরা তাঁর সকল মন্তব্য ঠিক পরপর উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

অথচ, এই ভারত আজ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা-সাহিত্যে কি অমূল্য মণি-মাণিক্য রাখিয়া গিয়াছেন,—বাঙ্গালা ভাষার কি অদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন,—ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, প্রৌঢ়ের সন্ধিক্ষণে, তিনি যে মহতী কীর্ত্তি, যে অবিনশ্বর নাম রাখিয়া গিয়াছেন, হয়ত তোমার আমার ভাগ্যে, জন্ম জন্মের তপস্যাফলেও সে সৌভাগ্য লাভ হইবে না। ভারত-সম্বন্ধে, পূর্ব্বোক্ত মহাশয়দিগের ঐরূপ মন্তব্য দেখিয়া মনে হয়, উহা কি সমালোচনা,—না আমাদের অদৃষ্টের বিড়ম্বনা?

বিদ্যাসুন্দরের আদিরসের আধিক্য আমরাও স্বীকার করি; আদর্শ-মূলক কাব্যও ইহা নয়, তাহাও মানি;—গল্পের উদ্ভাবনা ভারতের নিজের নয়, তাহাও জানি; কিন্তু তাহাতে কবিত্বের কি যায় আসে? চরিত্র-চিত্রণের তাহাতে কি অঙ্গহানি হয়? আদিরসের আধিক্য দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে কালিদাসের শকুন্তলাও পড়া উচিত হয় না; সেক্সপিয়রের রোমিওজুলিয়েট অথবা ক্লিওপেট্রার পাতাও মুড়িতে হয়; আর বাঙ্গালার হেম-নবীন-রবীন্দ্র-বঙ্কিম—ইহাঁদিগকেও দূর হইতে নমস্কার করিতে হয়। বলিবে, 'বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল,—উহাতে বিপরীতবিহার অবধি আছে।' আমি বলিব, ঐটি তোমার বড় ভাল লাগিয়াছে বলিয়া, এবং মনে মনে তুমি উহার রসটি সম্পূর্ণ উপভোগ করিয়াছ বলিয়াই, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ 'অশ্লীল' বলিয়া, প্রকারান্তরে তুমি কবিকে ব্যজস্তুতি করিতেছ! নইলে অত শত ছাড়িয়া, যে অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য—অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা, শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণ, হরিহোড়ের

বৃত্তান্ত,—অত সুন্দর সুন্দর সেই সব বীর-করুণ-শান্ত রস ভুলিয়া গিয়া—ঐটিই তোমার মনে জাগরূক হইবে কেন? তাই মনে হয়, সু কু বা শ্লীল অশ্লীল মনে,—বাহিরে আমরা বিজ্ঞতার ভাণ করি মাত্র।

আর প্লট বা আখ্যান, ভাব বা চরিত্র—পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট হইতে ভারত লইয়াছিলেন, সে ত জানা-কথা। এ প্রথা চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কবি-প্রতিভার গৌরব বৈ অগৌরব হয় না। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আখ্যানও মূল মহাভারত বা মতান্তরে পদ্মপুরাণ হইতে গৃহীত। সেক্সপিয়রের প্রায় সমুদয় মহানাটকের গল্পও প্রাচীন কাহিনী হইতে সংগৃহীত; বঙ্গের আধুনিক কবিগণের অধিকাংশ চরিত্র-চিত্র,—বিদেশীয় ভাব, ছায়া এবং ঘটনা—প্রধানতঃ ইংরেজী-কাব্যের আদর্শ লইয়াই গঠিত। তাহাতে কি যায় আসে? পূর্ব্বের একটা কিছু থাকিলে পরের একটা কিছুতে তাহা লাগিবেই লাগিবে। ইহা ত প্রকৃতির নিয়ম। সেই জন্যই ত, যে—যে পথের পথিক, বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে, তাহার একটা স্বাভাবিক দাবী থাকে। সাহিত্যও এ নিয়মের বহির্ভূত হইবে কেন? সে হিসাবে ভারতচন্দ্র,—কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি পূর্ব্বতন কবিগণের নিকট অল্পাধিক ঋণী; কোন না কোন বিষয়ে তিনি এই সকল মহাত্মার কাব্যাবলী হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। বিন্দু-বিন্দু জলে সাগরের সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্য-সমুদ্রও এ নিয়মের অন্তর্ভূত। সেই শ্রীজয়দেব গোস্বামী—কি তাঁহারও পূর্ব্বযুগ হইতে কত অজ্ঞাত কবির ভাবরাজি একটু একটু করিয়া সংগৃহীত হইয়া, তিলোত্তমার রূপের ন্যায়, বঙ্গের এই কাব্যপ্রতিমা গঠিত করিয়াছে।

ভারতের বিদ্যাসুন্দরের মূল আখ্যান রামপ্রসাদেরও অগ্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কলিকাতার কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্বে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়ার সন্নিকট নিমতা গ্রামের কবি কৃষ্ণরাম প্রথমে বিদ্যাসুন্দরের কাট্‌মা গঠন করেন; প্রসাদ সেই কাটমায় প্রতিমার গঠন করিয়া যান; ভারত সেই প্রতিমার অঙ্গরাগ—এমন কি, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা বোধ হয় অবিসংবাদী সত্য। প্রকৃতই 'বিদ্যাসুন্দর' বলিলেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরকে বুঝায়; রামপ্রসাদ বা আর কাহারও বিদ্যাসুন্দরের যে কোনরূপ

অস্তিত্ব আছে, ইহা অনেকেই অবগতও নন। বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের আদি ইতিবৃত্তলেখক, স্বর্গগত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহোদয় অতি সরলভাবে, সত্যনিষ্ঠার সহিত, সাহসপূর্ব্বক এ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "ভারত-চন্দ্রের ভিন্ন অন্যের রচিত যে বিদ্যাসুন্দর আছে, তাহা অনেকে অবগত নহেন, সুতরাং ঐ উপাখ্যানের এতাদৃশ সর্ব্বজনীনতা হওয়া বিষয়ে ভারতের লিপিনৈপুণ্য ভিন্ন আর কিছুই কারণ নহে। আমরাও পূর্ব্বে রামপ্রসাদাদির বিদ্যাসুন্দরের কথা জানিতাম না। ভারতের বিদ্যাসুন্দরই প্রথমে পড়িয়া-ছিলাম, এবং তাহার অনেক ভাব আমাদের হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় একেবারে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় মনের বল এই, তিনি কোথাও কোন 'বড়-লোকের' মতের প্রতিধ্বনি করেন নাই;—স্বাধীন ভাবে, অতি ধীরতার সহিত, সরল বিশ্বাসে আপন মন্তব্য—গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখায় আন্তরিকতা আছে, ভাণ নাই; তীক্ষ্ণ অনুভূতি আছে, আন্দাজী কিছু বলা নাই; বিনয়ের সহিত নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করা আছে, ওস্তাদী চালে আসর জমাইবার প্রয়াস নাই। বড় আহ্লাদের কথা, এবং আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথাও বলিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার ও আমার মত প্রায় এক হইয়াছে। কিন্তু বড় দুঃখ এই, তাঁহার সেই অমন সুন্দর আদি গ্রন্থখানা—বঙ্গসাহিত্যের ইতিবৃত্তের সেই মৌলিক পুস্তক-রত্নটি—বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণে সংস্কার করিতে গিয়া—রত্নের কিঞ্চিৎ বিকৃতি সম্পাদিত হইয়াছে। কার দোষে, কি বলিব? গ্রন্থকার এখন ইহজগতের পরপারে; তাঁর নিজস্ব—প্রাণের জিনিস এরূপ ভাবে পরিবর্দ্ধন করিবার অধিকার কাহার আছে বলিয়া মনে হয় না।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম:—মহাকবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ-প্রসঙ্গে, কৌশলে বিদ্যাসুন্দরের যে আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশমতেই হউক আর কবির নিজ ইচ্ছাক্রমেই হউক,—তাহা বাঙ্গালা দেশে এত লোক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে যে, তাঁহার তুলনা হয় না। ভারতের কবিত্বে ও রচনানৈপুণ্যে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ। তাঁহার ভাষার ঝঙ্কার ও শ্রুতিসুখকর ছন্দের বৈচিত্র্য যেমন পাঠককে

মন্ত্রমুগ্ধ করে, অপরপক্ষে তাহা চিত্রটিকে সজীব করিয়া তুলে। একটি অনূদিত অংশ হইতেও ইহা সপ্রমাণ করা যায়ঃ—

"নয়ন অমৃতনদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি, নিজপতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু, কদাচ অধর বিনা অন্যদিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা, প্রিয়সখী বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌনভাব, কেহ টের পায় না॥"

এ অংশটুকু শ্রীজয়দেবের 'রতিমঞ্জরীর' অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদটুকুই কেমন মিষ্ট বলুন দেখি? কোথাও কি কিছু কটমট দেখিলেন? যেন স্বভাবের একটি নিখুঁৎ ছবি সজীব মূর্ত্তিতে চোখের সম্মুখে সমুপস্থিত। এমন কবিতাও 'অশ্লীল' বলিয়া এক শ্রেণীর সমালোচক নাসিকা কুঞ্চিত করেন!

অন্নদামঙ্গলে শিবের ব্যাজস্তুতির এই অংশটি এখনও সর্ব্বত্র সাদরে পঠিত হয়;—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান, অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম, চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে, শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মলিল, ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥" * * *

কৈ, আজ পর্য্যন্ত ত এরূপ 'ব্যাজস্তুতি' কবিতায় কাহাকেও অতিক্রম করিতে দেখিলাম না?—অথচ এ হেন ভারত হইলেন—'অনুকরণকারী' মাত্র!

শিবের দক্ষালয় যাত্রার বর্ণনাটিও কেমন প্রাণময়ী ও মর্ম্মস্পর্শিনী!—
"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ সিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে। দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধ্বকধ্বক্ ধ্বকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে। ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥"**

শিবের মহারুদ্রমূর্ত্তির ইহা অপেক্ষা প্রকট ভাব আর কি হইতে পারে? যেন সংহারবেশে স্বয়ং শিব সাক্ষাতে সমুপস্থিত।

অন্যত্র, দক্ষযজ্ঞ নাশের চিত্রটিও কেমন মনোজ্ঞ, দেখুন ;—

"ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে। যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগসানুরাগঝম্পঝম্পঝাঁপিছে। ঘোররোলগণ্ডগোলচৌদ্দলোককাঁপিছে॥"

ছন্দের নর্ত্তনের সহিত, পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়ও যেন নাচিয়া উঠিতেছে,—দক্ষযজ্ঞনাশ ব্যাপার যেন চোখের সন্মুখে হইতেছে।

মধুররসের মধুর চিত্রটিও এই সঙ্গে দেখুন ;—

"অন্নপূর্ণা দিলেন শিবেরে অন্ন। অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥
কারণ-অমৃত পূরিত করি। রত্ন পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা। পরশেন হরে হরিষে মাতা॥" * * *

অন্যত্র,—অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রাকালে পাটুনির সহিত পরিচয় ;—

"ঈশ্বরীকে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী। বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গানামে সতা তার তরঙ্গ এমনি। জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে। না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই। যে মোরে আপনাভাবেতারসঙ্গেযাই॥"

এমন দ্ব্যর্থঘটিত সরল কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে কেমন একটি পবিত্র ভাব ও ভক্তির উদয় হয়! গঙ্গাজল যেমন পবিত্র ও স্নিগ্ধ, ভারতের অন্নদামঙ্গলের এক একটি চিত্র ও সেই মত পবিত্র ও স্নিগ্ধ।

তবে নায়ক নায়িকার প্রেমপূর্ণ আদিরসের সঞ্চার করিতে বসিয়া, কবি 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র সুর আনিবেন কেন? বিদ্যাসুন্দরের খোলাখুলি প্রেমের অভিনয়ে তিনি সংযমী সাধুর তত্ত্বকথার অবতারণা করিবেন কিরূপে? যেখানকার যা, সেখানকার তা দেখাইয়া ত মানাইয়া চলিতে হইবে? বিবাহের বাসরশয্যায়, শ্যালি-শালাজের সম্মুখে, বরের মুখে শ্মশান-বৈরাগ্যের

গান কেমন শুনায়? অথবা শ্মশানে স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের শবদাহ করিবার সময় নিধুর টপ্পাই বা কেমন মানায়? যে কবি ভক্তিরসপূর্ণ অন্নদামঙ্গলে হরপার্ব্বতীর বিবিধ স্বর্গীয় চিত্র,—ইচ্ছামাত্রে অতি অল্প আয়াসে অপূর্ব্ব-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন; যাঁহার সুমার্জ্জিত ছন্দতানলয়বিশিষ্ট সুমধুর ভাষার অতুল্য ঝঙ্কারে শত শত সুখের চিত্র, শান্তির চিত্র, মাধুর্য্যের চিত্র,—ইন্দ্রজালিকের মন্ত্রপূত কুহকদণ্ডস্পর্শের ন্যায় ইঙ্গিত মাত্রেই সজীব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে;—ইচ্ছা করিলেই কি তিনি বিদ্যাসুন্দরের ঐ খোলাখুলি ভাবটা বদ্‌লাইতে পারিতেন না? লেখনী-তুলিকা তাঁহার হস্তে, বিভিন্নরূপ রং ও সাজসজ্জা তাঁহার ইচ্ছাধীন; কল্পনারথে চড়িয়া মনে করিলেই ত তিনি একটি তাপসবালা ও কামকাঞ্চনত্যাগী নবীন যোগীর ফটো তুলিতে পারিতেন;—সে শক্তি ও সৌভাগ্য তাঁহার যথেষ্ট ছিল, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিবার কাহারও উপায় নাই; কিন্তু যে কারণেই হউক, তাহার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া তিনি অন্য পথ ধরিয়াছেন—ব্যক্ত প্রেমের চরম অভিনয় করিয়া তদানীন্তন রুচির উপযোগী সমাজের একটি নিঁখুৎ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। গুপ্তপ্রেমে 'ঘোম্‌টার ভিতর খ্যাম্‌টার নাচ' হয়, বোধ হয়, তাহাই এক শ্রেণীর পাঠক বা সমালোচক ভালবাসেন; আর বিদ্যা-সুন্দরের মত খোলাখুলি ব্যক্ত প্রেম—অত রঙ্গিলা বর্ণনা—তাঁহারা দেখিতে চান না, এই বোধ হয় একটা কারণ। কিন্তু ইহা রুচিভেদের কথা।

এখন কবি যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা ধরিয়াই ত তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে? যাহা দেখান্ নাই অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবি যাহা দেখাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করা সঙ্গত হয় কি? পরন্তু ভারতের কবিত্বের যদি কোন বিশেষত্ব না থাকিবে, তবে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর আজ বিশ্ববিশ্রুত হইল কেন? যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালী, হাফ্‌আখড়াই—বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় কোথায় হয় নাই, কোথায় না হইতেছে? বলিবে, আদিরসের প্রাবল্যই ইহার কারণ। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ত অনেক আদিরসের গ্রন্থ রহিয়াছে? কৈ, সে সকলের নামও ত কেউ করে না? না, তা নয়। শুধু আদি রস বলিয়া নয়,—লিখিবার ভঙ্গি ও রস-উদ্দীপনার অভিনব প্রণালীতে ভারতের বিদ্যাসুন্দরের এরূপ একাধিপত্য। শক্তির

বিকাশ যেখানে, মানুষ সেই খানেই অবনত হয়। ভারত শক্তিমান্ সৌভাগ্যশালী কবি;—অশ্লীলতার ধূয়া ধরিয়া তুমি আমি তাঁর ঈশ্বরদত্ত যশঃ মলিন করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সফল হইবে কেন? ভারত বঙ্গভাষার প্রধান সেবক, পালক ও পুষ্টিকর্ত্তা; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ আধিপত্য। বঙ্গভাষার অস্তিত্বের সহিত তাঁহার অস্তিত্বও বিরাজ করিবে।

আর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র? কূটবুদ্ধিজীবী বিষয়ী হইলেও বহুগুণে গুণবান্ এবং প্রকৃত গুণজ্ঞও তিনি। গুণের আদর তাঁর সময়ে যেমন হইয়াছিল, তেমনটি ত আর কোন হিন্দু ভূস্বামীর সময়ে দেখিতে পাই না। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রকে তিনিই আশ্রয় দিয়া, উৎসাহ দিয়া, নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দিয়া অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ লিখাইয়াছিলেন;—তাহার ফলে বঙ্গসাহিত্যে কত অমূল্য মণি-মাণিক্য স্থান পাইয়াছে। এ হিসাবে, কৃষ্ণচন্দ্রের অন্ত সাত খুন মাপ।

এখন সেই আদিরসের রাজা, 'বিদ্যাসুন্দরের' কবি—ভারতের রস-উদ্দীপনার অদ্ভুত ক্ষমতা,—বিদ্যার রূপবর্ণনাতেই লউন। আশা করি, রুচি-বাগীশ পাঠক, এ অংশ টুকু বাদ দিয়া এ প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন;—

"বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে।
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ ল'য়ে কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম; কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার। ভুলায় তর্কের পাতি দন্তপাতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া। ভয়ে বিধি তার মুখে থুলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়ি ছিল। ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শিহরে কদম্ব-ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"

ইহা ব্যতীত কবির কত খণ্ড কবিতা,—সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দীর কত পদ্যানুবাদ, কত পাদপূরাণ, কত গান আছে,—সে সকলের সম্যক আলোচনা করিবার অবসর আমাদের নাই

পঞ্চদশ বর্ষ বয়সেই, এরূপ বাল্যকালেই কবির এই অমানুষী কবিত্বের বিকাশ পায়। যখন তিনি আশ্রয়চ্যুত ও অসহায় হইয়া কোন সদাশয় গৃহীর আলয়ে পালিত হন, সেই সময়ে তাঁহার এ মহাসৌভাগ্যের যোগ হইয়াছিল। তাই মনে হয়, ভগবান্ কখন কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহার বিশেষ অনুগৃহীত ও চিহ্নিত ব্যক্তিকে মঙ্গলের পথে লইয়া যান, তাহা মানববুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য। ভারত যদি চিরদিন সৌভাগ্যের ক্রোড়ে থাকিতেন, পারিবারিক বিপদ ও আত্মজীবনের ঝঞ্ঝাবাতে দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া না পড়িতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার এ দুর্লভ কবিত্বশক্তির বিকাশ হইত না। যে গৃহে ভারত প্রতিপালিত হইতেছিলেন, সেই গহস্বামীর আদেশে, তিনি 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা' পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ঐ পুঁথির প্রচলিত পাঠ না পড়িয়া তিনি স্বরচিত 'সত্যনারায়ণের কথা' পাঠ করিলেন। শুনিয়া গৃহস্বামী প্রভৃতি সকলেই চমৎকৃত হইলেন। সুঠাম, সুন্দর, পঞ্চদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-বালক নিশ্চয়ই কোন ঐশ্বরিক-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে নচেৎ এত অল্পবয়সে এরূপ মনোহর—চিত্তস্নিগ্ধকর 'ব্রতকথা' রচনা করিল কিরূপে?—সকলেই মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিল। যাই হউক, এই হইতেই বালকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইল, অথবা বঙ্গবাসীর সৌভাগ্যবশেই, বালক ভারতের প্রতিভা-কিরণ এই ভাবেই ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃতির নীরব আহ্বানে, যথাদিনে, ভারত কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। ভগবদিচ্ছায় মণি-কাঞ্চন যোগ হইল, কিন্তু মধ্যে একটা মহা ব্যবধান পড়িল।—কবির চরিত-কথা আলোচনার সঙ্গে পাঠক সে সংবাদ অবগত হইবেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত আম্‌তার সন্নিকট পেঁড়ো বসন্তপুর নামক গ্রামে সন ১১১৯ সালে ভারত জন্মগ্রহণ করেন। ভারত ধনীর পুত্র। তাঁহার পিতা একজন ভূস্বামী ছিলেন। রাজ-উপাধিও তাঁর ছিল। ভারত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের (মুখোপাধ্যায়) চতুর্থ বা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র।

বর্দ্ধমান রাজসংসারের সহিত ভারতের পিতার বৈষয়িক কি মনোমালিন্য হয়। সেই সূত্রে তিনি হৃতসর্ব্বস্ব ও আশ্রয়চ্যুত হন। ভারতের পিতা সপরিবারে শ্বশুরালয়ে গিয়া উঠেন। মণ্ডলঘাট পরগণায় নওয়াপাড়া গ্রাম তাঁহার শ্বশুরালয়। ঐ গ্রামের নিকট তাজপুরের টোলে বালক ভারত

সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পরে ঐ গ্রামের নিকট সারদা গ্রামের নরোত্তম আচার্য্যের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত ভারতের বিবাহ হয়।

ভারতের পিতা কালে আবার তাঁহার নষ্টসম্পত্তি ফিরিয়া পান। নরেন্দ্র-নারায়ণ পুনরায় পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস করেন। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে গৃহবাস আর হইল না,—ভ্রাতাদের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। হুগলী জেলার দেবানন্দপুরের মুন্সী মহাশয়েরা তখন সমৃদ্ধিশালী ভূস্বামী; ভারত গিয়া ঐ মুন্সীগৃহে আশ্রয় লইলেন। তথায় পারসী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন; অল্পদিনে পারসী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

এই কায়স্থ মুন্সীগৃহে ভারতের কবিত্বশক্তির প্রথম বিকাশ হয়। প্রথম প্রথম গোপনে তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন; আপন মনে পুনঃ পুনঃ তাহা আবৃত্তি করিতেন; শেষ "সত্য-নারায়ণের ব্রতকথায়"—তাঁহার সে কবি-প্রতিভা জনসাধারণের গোচরে আসিল। দুইবার দুই রকমের রচনায় এই ব্রতকথা তিনি গৃহস্বামীকে শুনাইয়াছিলেন; তাহাতে সকলে মুগ্ধ হয়। পঞ্চদশবর্ষে. কবির এ সৌভাগ্য-যোগ ঘটে; তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মুন্সীগৃহে পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করিয়া ভারত পুনরায় পিতৃগৃহে গমন করেন। গ্রহবৈগুণ্যে আবার তাঁহার পিতার সহিত বর্দ্ধমান রাজসংসারের বিবাদ হইল। নিয়মিতরূপে খাজনা না দেওয়ার দরুণ এই বিবাদ। ভারত পিতার প্রতিভূস্বরূপ হইয়া, বিবাদ মিটাইতে গিয়া ঘোর বিপদগ্রস্থ হইলেন। সম্ভবতঃ কথার হের-ফেরে তিনি রাজ-রোষে পড়িলেন। তাহার ফল—ভারতের কারাবাস।

যাই হোক্, ভগবদিচ্ছায়, কারাধ্যক্ষের কৃপায়, ভারতকে বেশীদিন এ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই,—ভারত কারাগৃহ হইতে পলাইয়া ছদ্ম-বেশে একেবারে সুদূর পুরুষোত্তমে গিয়া উঠিলেন। সেখানে সন্ন্যাসীবেশে রহিলেন. সঙ্গে তাঁহার একটি বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। এই সময়ে ভারতের বয়স ৩৯ বৎসর।

প্রকৃতি তাঁহার প্রিয়পুত্রের দ্বারা এইবার আপন কাজ করাইয়া লইলেন। পুরুষোত্তমের একদল ভক্ত বৈষ্ণব ৺ বৃন্দাবন গমনে উদ্‌যোগী হইলেন,

ছদ্মবেশী ভারত তাঁহাদের সঙ্গ লইলেন, তাঁহার সেই অনুচরও সঙ্গে রহিল। বৈষ্ণবদল খানাকুল-কৃষ্ণনগরে গোপীনাথজীর মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেছেন, সেই সময়ে ভারতের সেই অনুচর ভারতের অগোচরে তাঁহার শ্যালীপতি ভাইকে গিয়া প্রভুর সংবাদ দিল। তিনি আসিয়া ভারতকে সযত্নে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার সন্ন্যাসী বেশ ঘুচাইয়া জটা কৌপীন ছাড়াইয়া, আশ্রমী সাজাইলেন। কয়েকদিন মধ্যে ভারতের স্ত্রীও তথায় আনীতা হইলেন। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে পতিপত্নীর মিলন হইল। সে মিলনের মধুরতা তাঁহারাই বুঝিলেন।

সন্ন্যাসী ভারত যখন গৃহী হইলেন, তখন অর্থোপার্জ্জন ত করিতে হইবে ? কাজেই চাকরির চেষ্টায় তিনি বহির্গত হইলেন। ফরাসডাঙ্গার তৎকালীন ফরাসী গভর্ণরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট তিনি কর্ম্মের জন্য হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিলেন। ভারতের সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় স্বনাম ধন্য কৃষ্ণচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় আগমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ভারতের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

জহুরি জহর চিনিল। কৃষ্ণচন্দ্র অল্প আলাপেই ভারতের অসামান্য কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়া সাদরে ভারতকে আপন রাজধানীতে লইয়া গেলেন, এবং মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া—রায় গুণাকর উপাধি প্রদান করিয়া—ভারতকে আপন সভাসদ নিযুক্ত করিলেন। স্বভাবকবি এইবার রাজ-কবি হইলেন।

প্রতিভা আপনি ফুটে বটে ; কিন্তু একজনকে একটু উপলক্ষ হইতে হয়। কালিদাসের প্রতিভা ছিল, কিন্তু বিক্রমাদিত্য তাহা ফুটাইয়াছিলেন। ভারতের প্রতিভাও তেমনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকম্পায় ফুটিয়া উঠিল।

নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে বসিয়া, সর্ব্ববিধ বিঘ্নবিপত্তির হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া, স্বভাবকবি ভারত, হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে—উচ্ছ্বাসভরে 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করিলেন। বিদ্যাসুন্দরের যে আখ্যান, তাহা ঐ অন্নদা-মঙ্গলেরই একটি অংশ ;—কবি কৌশলে উহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এবং ভবানন্দ মজুমদারের প্রসঙ্গ উপলক্ষে—মানসিংহের আখ্যানে উহার পরি-সমাপ্তি করিয়াছেন।

কবি-হৃদয়ের যে লুক্কায়িত বহ্নি এতদিন তুষানলের মত হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, স্বভাবের নিয়মবশে, এতদিনে তাহা দপ্ দপ্ জ্বলিয়া উঠিল। হৃতসর্ব্বস্ব, আশ্রয়চ্যুত, চোরের ন্যায় ছদ্মবেশে দিন যাপন, কারাবাস, নির্য্যাতন, অপমান—কবির সে মর্ম্মভেদী ক্ষোভ এতদিনে উপশমিত হইল। বিধাতার বরে একটা প্রধান অবলম্বন ও আশ্রয় পাইয়া এইবার তিনি তাঁর মনের কালি ধুইয়া ফেলিলেন। কেননা স্বয়ং নবদ্বীপাধিপতি প্রবলপ্রতাপ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সহায়, ততোধিক সহায় তাঁহার আরাধ্যা ইষ্টদেবী কবিতা-সুন্দরী ;– সেই কাব্যকলার প্রভাবেই তিনি তাঁহার আজন্মসঞ্চিত মনের কালি ধৌত করিলেন। তাহারই ফল—কবির বিশ্ববিশ্রুত 'বিদ্যাসুন্দর।'

কৈফিয়ৎ দিয়া, ভাষার মারপেচ করিয়া, কবির নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চাহি না.—স্বভাবের নিয়মবশে যাহা ঘটিতে পারে, অধিকাংশ স্থলে যাহা ঘটিয়া থাকে, ভারত তাহাই করিয়াছিলেন ;—চিরশত্রুর কুলকলঙ্ককাহিনী জ্বলন্তভাষায় বর্ণন করিয়া, তিনি এক ঢিলে তিনটি পক্ষী মারিলেন। রাজার মন রাখিলেন, শত্রুর উন্নতশির অবনত করিলেন, আর নিজের মনের কালি মনের সাধে ধুইয়া ফেলিলেন। কিন্তু পরোক্ষে, বঙ্গভাষা তাহা হইতে যে অমুল্য সম্পত্তি লাভ করিল, তাহার তুলনা হয় না। বলিবে,—মহাপ্রাণ কবির পক্ষে কি এটি গৌরবকর ? ইহারও আবার পোষকতা করিতেছেন? না, পোষকতা করিতেছি না—কাজটা অবশ্যই নিন্দনীয় ; কিন্তু সাধারণত ও স্বভাবত যাহা হইতে পারে, আমরা তাহাই বলিতেছি মাত্র। কেননা, প্রতিহিংসা অপেক্ষা প্রেম অনেক বড় জিনিস, কবির পক্ষে সেই প্রেমের পথ অবলম্বন করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু যে কারণে হউক, ভারত তাহা করেন নাই। না করিয়া, এইভাবে কবিতানুশীলনে ব্রতী হন। তাহার ফল কি হইয়াছে, আমরা তাহাই মাত্র দেখিব। কেননা সেই সময় ; পূর্ব্বতন সমাজের সেই রুচি ;—আগেকার সমাজ এরূপ ব্যক্তিগত কুৎসায় বেশী টলিত না। বোধ হয়, তখনকার লোকের ধারণা এইরূপ ছিল,—পাপ যতই প্রকাশ পায়, ততই ভাল,—উহা ঢাকিয়া রাখাটা কিছু নয়।

যাক্, সে অতীত কাহিনী। হয়ত আমাদের এ অনুমান ভুল হইতেও

পারে। পরন্তু কবির এই 'হৃদয়ের ছবি' হইতে বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য যে অমূল্য মণি-মাণিক্য সঞ্চয় করিয়াছে, কাল-নিশ্বাসে তাহা ক্ষয় হইবার নহে,—বাঙ্গালী চিরদিন গৌরবের সহিত ভারতের নামগ্রহণ করিবে, এবং অন্নদামঙ্গলের ন্যায় মহাকাব্য যে তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া সেই মহাকবির চরণে বার বার মস্তক অবনত করিতে থাকিবে—তা অক্ষয় বাবু, রমেশ বাবু বা দীনেশ বাবুর ন্যায় লেখক যতই তাঁর যশোপ্রভা মলিন করিবার চেষ্টা পান!

ভারত সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর মন্তব্য আবার সকলের সেরা। তিনি একেবারে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। যেখানে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে দু'কথা বলিবার সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানেই সেই মহাকবিকে হেয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কবিকঙ্কণের 'রতিবিলাপের'—"মোর পরমাণু ল'য়ে, চির-কাল থাক জীয়ে, আমি মরি তোমার বদলে" এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দীনেশচন্দ্র বলিতেছেন,—"যাঁহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খোঁজ করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন,—চণ্ডিদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতাস্বাদ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।"

এবার আর শুধু, বেচারা ভারতকে নয়,—শ্রীজয়দেবকে পর্য্যন্ত বন্ধুবর টান্ দিয়াছেন। এবার বন্ধুবরের কথাতেই বন্ধুবরের মত খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইব। তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থে*, 'কাব্যশাখা' সমালোচনা ব্যপদেশে, তিনি নিজেই লিখিয়াছেন এবং সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, "কাব্য অর্থে কেবলই বাক্য নহে, "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং"—রসবিহীন বাক্যাবলী চিত্তে কোন স্থায়ীভাব মুদ্রিত করে না।" অতএব বেশ স্পষ্টরূপেই দীনেশ বাবু চিরপ্রচলিত মহাজন-বাক্য স্বীকার করিতেছেন যে, 'রসসংযুক্ত বাক্যই কাব্য।' এখন, বাঙ্গালীর আদিকবি—বৈষ্ণবের চিরনমস্য—অধিক কি, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরও প্রণম্য—শ্রীজয়দেবেও **কবিত্ব নাই,** ইহা দীনেশ বাবু বড় গলা করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহার ভক্তির আকর্ষণে স্বয়ং ভক্তের ভগবান্ প্রচ্ছন্নবেশে কবির কুটীরে আসিয়া কবির পাণ্ডুলিপি

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দ্বিতীয় সংস্করণ।

সংশোধন করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন,—যাঁহার 'গীতগোবিন্দের' অমৃতনিস্যন্দিনী রচনা স্তোত্ররূপে সর্ব্বত্র পঠিত ও সম্পূজিত;—যাঁহার "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং, বিহিতবহিত্র চরিত্রম্ খেদং। কেশবধৃতমীন মীনশরীর, জয় জগদীশ হরে,"—ইতিশীর্ষক দশ অবতারের স্তব,—বঙ্গের বালকবৃদ্ধ-বনিতা ভক্তিভরে আবৃত্তি করে; দেবী-মণ্ডপে সুমধুর স্বরে গীত হয় এবং সহস্র সহস্র লোক যাহা অশ্রুপূর্ণ লোচনে শুনিতে শুনিতে মন্ত্র-মুগ্ধপ্রায় হইয়া পড়ে;—যে পুণ্যপ্রাণ কবির কেন্দুবিল্ব এখন পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত;—সাহিত্য-সম্রাট স্বয়ং বঙ্কিম বাবু যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—"এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। * * জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।"—দীনেশ বাবু অম্লান বদনে বলিলেন, সে জয়দেবেও কবিত্ব নাই! কবির ঐ উদ্ধৃত অংশটুকুও যদি 'রসাত্মক বাক্য' না হয়, তাহা হইলে রসাত্মক বাক্য আর কার নাম, জানি না। কবিকঙ্কণ বা চণ্ডিদাসের প্রতি ভক্তি দেখাইতে হয় বলিয়া কি এমনি অন্ধ হইতে হয়? আমরাও কি উক্ত দুই কবির ভক্ত নই? 'আমার মতই ঠিক্, আর সকলের ভুল'—এই ধারণাটাই খারাপ। ঠাকুর শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন,—ইহা 'মতুয়ার বুদ্ধি'। (Dogmatism) ভক্তির আধিক্য দেখাইতে গিয়া দীনেশ বাবুরও শেষে এই 'মতুয়ার বুদ্ধি' হইল? তাঁহার এই অতি-ভক্তি দেখিয়া, কবিকঙ্কণ বা চণ্ডিদাসের মুক্তাত্মা তাঁহাকে কি ভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন!

অনেক দিন হইল, একবার যেন 'সাধনায়' এই ভাবের একটি লেখা পড়িয়াছিলাম,—ঠাকুর-বাড়ীর একটি নব্যলেখক লিখিতেছেন,—'গীত-গোবিন্দে গীত আছে, গোবিন্দ নাই।'—হরিবোল হরি! একেবারে রাম-বিহীন রামযাত্রা! দীনেশবাবু বুঝি কিছু বেশী রকমে ঠাকুর-বাড়ীর গোঁড়া;—তাই তিনি এই মন্তব্যকেও উঁচাইয়া বলিতেছেন,—"যাঁহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খোঁজ করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন,—চণ্ডিদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতাস্বাদ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।"

অতএব সাব্যস্ত হইল, হয়—আমরা চণ্ডিদাস ও কবিকঙ্কণ বুঝি না, *দীনেশ বাবুই তাহা একা আয়ত্ত করিয়াছেন;* নয়—জয়দেব ও ভারতচন্দ্র আমরাই বুঝি, দীনেশ বাবু তার ধার ধারেন না। কিন্তু এমন স্পর্দ্ধা আমরা করি না, করা অধর্ম্ম বোধ করি।

কেননা, যাহা ভাল, তাহা সকলেরই ভাল লাগে। পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া শিশু-অধরেও হাসি ফুটে,—সংসারতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিও অবসাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একটু তৃপ্তি পায়,—আবার কবি, ভাবুক ও দার্শনিকও তাহা দেখিয়া কত শিক্ষালাভ করেন। আর ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাও তাহা দেখিয়া ভক্তিতে আপ্লুত হন।—আমাদের চণ্ডিদাস-কবিকঙ্কণও ভাল লাগিয়াছে, অন্য পক্ষে জয়দেব ও ভারতচন্দ্রেও মন আকৃষ্ট হইয়াছে.—দীনেশ বাবুর মত বিজ্ঞ সমালোচকের তাহা হয় নাই কেন, ইহাই ভাবিবার বিষয়।

কিন্তু এ ভাবনার ভার নিরপেক্ষ পাঠকের উপর দিয়াই আমরা নিরস্ত হইলাম। কারণ বিদ্যাপতিরও গুরু জয়দেব। সেই জয়দেব এবং ভারতের বাক্যও যদি রসাত্মক না হয়,তাহা হইলে বাঙ্গালার প্রাচীন বা আধুনিক কোন্ কবির বাক্য (বর্ণনা) যে রসাত্মক, তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না। যে মহাকবির প্রত্যেক বাক্য--প্রত্যেক বর্ণনা রসে পরিপূর্ণ,—রস যাহা হইতে উপচিয়া পড়িতেছে,—যাঁহার পরিহাস-রসিকতা—বঙ্গের একটি কিংবদন্তীর বিষয়, *—তাহাতেও যদি দীনেশ বাবু রস না পাইলেন, তবে তাঁহার রসের ধারণা কিরূপ, তিনিই জানেন।

মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, বহুমূত্র রোগে, বঙ্গের এই মহাকবি মহা-প্রয়াণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘজীবী হইলে, অন্নদামঙ্গলের মত নবরসপূর্ণ

---

* প্রবাদ এই যে, নিষ্ঠাবান্ ভারত একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া, গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তর্পণাদি করিতেছেন, এমন সময় একটি সুন্দরী বারাঙ্গনা—তাঁহার সুঠাম সুন্দর রূপ দেখিয়া,—ততোধিক তাঁহার পীযূষপূর্ণ কাব্যরসের আস্বাদ পাইয়া, হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে—সেই জলেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। চমকিত ভারত, নিমিষে পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন; বারাঙ্গনা উপহাস করিয়া কহিল,—"আরে ছি! বিদ্যাসুন্দরের কবি এমন অরসিক। উপযাচিকা কামিনীর প্রেমালিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিল!"—প্রত্যুৎপন্নমতি কবি,—সুরসিক ভারত, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"তা নয় সুন্দরি! আমি দেখিতেছিলাম, তোমার পীনোন্নত পয়োধর—ঐ উন্নত কুচ যুগ—আমার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইয়াছে কি না?"

মহাকাব্য যে তাঁর অমৃতময়ী অমরলেখনী হইতে নিঃসৃত না হইত, তাঁহা কে বলিবে? যাই হউক, প্রাচীন সাহিত্যালোচন উপলক্ষে, আজ তাঁহার পুণ্যস্মৃতির আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা ধন্য হইলাম, এবং আমাদের সমসাময়িক সমালোচকবৃন্দের অবিচারপূর্ণ একদেশদর্শী সমালোচনার আংশিক প্রতিবাদ করিয়া একটু সান্ত্বনা লাভ করিলাম।

ভারতচন্দ্রের অবসানের পর, কিছুদিন বঙ্গসাহিত্যে সঙ্গীতেরই বিশেষ আধিপত্য হইল। সেটা একরূপ 'গানের যুগ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা সেই সঙ্গীত-সাহিত্যেরই আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে আর একখানি মাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিরচিত হয়, সেখানির নাম—'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।' "মনসার ভাসান, চণ্ডী ও রামায়ণের ন্যায় ইহাও চামর-মন্দিরাসহযোগে গীত হইয়া থাকে। * * * নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাগ্রাম-নিবাসী ৺ দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনা করেন।" (পণ্ডিত ৺রামগতি ন্যায়রত্ন)

গানের যুগ—নিধুবাবু।

—○•○—

টপ্পার রাজা নিধুবাবু—বা রামনিধি গুপ্তের নাম বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষের বিরহ, মিলন, পূর্ব্বরাগ প্রভৃতির মান-অভিমানের সূক্ষ্ম হৃদয়-কথা লইয়া সঙ্গীত রচনা,—এবং সে সঙ্গীতে বিশেষ গুণপনা প্রকাশ, বোধ হয় এই প্রথম। অন্ততঃ, নিধুবাবুর আগে, এমন ভাবে বিরহ-সঙ্গীত রচনা করিয়া, কেহ বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেন নাই এবং জনসাধারণের তেমন সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজনও হন নাই। অধিক কি, আজিও—বঙ্গসাহিত্যের এই বর্ত্তমান যুগেও, এক শ্রীধর কথক ব্যতীত নিধুর টপ্পার সহিত কাহারো তুলনা হইতেও পারে না। প্রসিদ্ধিও নিধুরই সমধিক। হইবারই কথা এবং হওয়াও উচিত। কেননা, তিনি যে সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী। পরবর্ত্তী কবিবৃন্দ—শ্রীধর প্রভৃতি—কোন-না-কোন প্রকারে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়াছেন। ভাবে, ভাষায় ও রচনা-পদ্ধতিতে,—কোন-না-কোন অংশে, পরবর্ত্তী সঙ্গীত-রচকগণ তাঁহার নিকট ঋণী। আজিও কেহ রবীন্দ্র গিরিশ বা বঙ্কিমের কোন বিরহ-গীত গাহিলে, নিধুকেই মনে পড়ে।

সন ১১৪৮ সালে হুগ্‌লী-ত্রিবেণীর সন্নিকট চাপ্‌তা গ্রামে রামনিধি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইহাঁদের

আদিম বাস কলিকাতা-কুমারটুলী। তখন ইংরেজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, প্রাচীন কলিকাতা তখন সামান্য গ্রাম মাত্র,—একরূপ জঙ্গলময়। বর্গীর হাঙ্গামা তখনও দেশমধ্যে বর্ত্তমান ছিল। তবে ব্যবসায়ী ইংরেজ, ব্যবসায়ের উন্নতিব্যপদেশে ধীরে ধীরে কলিকাতার উন্নতিসাধন করিতেছিলেন।

এক পাদরির নিকট বালক নিধু ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন; শিক্ষা কিন্তু সামান্য রকমই হইয়াছিল। কিন্তু সেই সামান্য শিক্ষাতেই, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তাঁহার এক কেরাণীগিরি চাকরি মিলিয়াছিল। অল্প-স্বল্প ইংরেজী শিখিলেই তখন কাজ মিলিত। কিন্তু এ কাজ নিধু অধিকদিন করিতে পারিলেন না;—কাজে ইস্তফা দিয়া সঙ্গীতসাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। কেননা, সঙ্গীতে তাঁহার প্রাণ গঠিত; বাল্যকাল হইতে সেই ভাবেই তিনি বিভোর। কোথাও সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইলে তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেন। কলিকাতার সন্নিকট চাপ্ড়া গ্রামে তখন অনেকগুলি হিন্দুস্থানী কালোয়াৎ বাস করিতেন; স্বভাবের শিশু—সঙ্গীতের চির-উপাসক নিধু—সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সরিমিঞার টপ্পার অনুকরণে, সুস্বর তানলয়-সংযোগে, সরল বাঙ্গালায়, টপ্পা-সঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একাধারে তিনি সুকবি ও সুগায়ক—দুই-ই ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। যে, যে বিষয়ের প্রধান বা অগ্রণী হইবে, ভগবান্ আগে হইতেই তাহার সকল রকম জোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়া দেন। স্থূলবুদ্ধি মানব, অহঙ্কারে ও মোহে ইহা বুঝে না বলিয়াই যত দ্বন্দ্ব ও অশান্তি। বালক নিধুর কবিজনোচিত রূপ, রচনাশক্তি ও সুকণ্ঠ—তিনই ছিল। ভগবানের অভিপ্রেত না হইলে এ তিনের যোগ এক আধারে হয় কিরূপে? এগুলি ত মানব,—চেষ্টার দ্বারা, যত্ন-ভক্তির বা অর্থের দ্বারা, আয়ত্ত করিতে পারে না? কোন বিশেষ শক্তি বা প্রতিভা, ভগবানের দান বলিয়া মনে করিতে হয়; তাহা হইলে আর সেই ভাগ্যবানের প্রতি লোকের বিদ্বেষ থাকে না।

নিধুর গান—'নিধুর টপ্পা' নামে পরিচিত। হিন্দী খেয়াল, টপ্পা ও গজলের সুর ভাঙ্গিয়া, একটু অভিনব প্রণালীতে তিনি বাঙ্গালায়,—এই টপ্পা-সঙ্গীতের প্রচার করেন। অল্পদিনে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

তাঁহার গানে সকলেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে সাধনসঙ্গীতই বাঙ্গালার প্রধান সম্বল ছিল। বড় জোর ভারতচন্দ্রের প্রণয়সঙ্গীতগুলি কোথাও কোথাও গীত হইত; কিন্তু এই হইতে 'নিধুর টপ্পা'—বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত হইল। এবং বলা বাহুল্য, নিধুর দেখাদেখি, অনেকেই এ পথে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু প্রতিভা ও শক্তির অভাবে তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হইল। কেবল কথকচূড়ামণি শ্রীধর—সেই পরবর্ত্তী ভাগ্যবান্ কবি—কোন কোন অংশে নিধুকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরেচ্ছায়, নিধুবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল আপনার সাধনার ফল উপভোগ করিয়া ও জনসাধারণকে তাহা বিলাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনালব্ধ সম্পত্তি—সেই ঐশ্বরিক দান—সেই অপূর্ব্ব প্রণয়সঙ্গীত—বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এবং বাঙ্গালা ভাষা তাহাতে বিশেষ পরিপুষ্টও হইয়াছে। রসিক ও ভাবুক-সমাজে নিধুর স্থান অনেক উচ্চে।

নিধুর তিন বিবাহ, প্রথম দুই বিবাহে কবির গৃহসুখ হয় নাই;—তাঁহার দুই পত্নী অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অবশ্য স্ত্রী বর্ত্তমানে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। শেষ বিবাহ, কবির অনিচ্ছাসত্ত্বে, ৫৩ বৎসর বয়সে হইয়াছিল; সেই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার সন্তনাদি জন্মে। ৮৭ বৎসর বয়সে কবি ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণের সন তারিখ—১২৩৫ সাল, ২১শে চৈত্র।* দেহান্তে প্রায় শতাব্দীকাল তাঁহার কবিত্বপূর্ণ সঙ্গীতাবলী মজ্‌লিসে মাফেলে গীত হইয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তবিনোদন করিতেছে এবং আশা হয়, আরও শতাব্দীকাল ভাগ্যবান্ কবির মধুরস্মৃতি লোকে শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিবে। 'বাবু' আখ্যা, প্রাচীন কবিদের মধ্যে, এক নিধুই পাইয়াছিলেন। এটিও তাঁহার বিশেষ গৌরব ও সম্মান-চিহ্ন। বিশেষ শক্তি ও সৌভাগ্য না থাকিলে কবিকে সহজে লোকে এ উচ্চ সম্মান দেয় না।

* শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত "বাঙ্গালীর গান" হইতে আমরা নিধুর এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা সঙ্কলিত করিলাম।

'বাঁশ-বনে ডোম কাণা' বলিয়া যে একটা কথা আছে, নিধুর গান নির্ব্বাচন করিয়া উদ্ধৃত করিতে গেলেও আমাদিগকে সেইরূপ কাণা হইতে হইবে। তাই যদৃচ্ছাক্রমে সেই প্রেমিক-কবির সঙ্গীতাবলী হইতে আমরা তিনটি মাত্র রত্ন উদ্ধৃত করিলাম ;—

(১) ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান।

"সে কেন রে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয়।
জানি আমি তার সনে কভু ত বিচ্ছেদ নয়॥
কখন কি ব'লেছি মানে, আজিও কি তা আছে মনে,
তা ব'লে কি মানে মানে, অভিমানে রইতে হয়॥
সখি গো আমার হ'য়ে, বল তারে বুঝাইয়ে,
পিরীতি করিতে গেলে সুখ দুখ সইতে হয়॥"

কাহারও কাহারও মতে এই গানটি শ্রীধর রচিত। কিন্তু ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। নিধু, শ্রীধরের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি এবং প্রণয়সঙ্গীতের গুরু স্থানীয়,—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী যিনি, তাঁহার মান্য সর্ব্বাগ্রে ; এটি সমীচীন ও সঙ্গত। দ্বিতীয় কথা, যে কারণেই হউক, নিধুর নাম যেমন সর্ব্বব্যাপী,—সুযোগ্য হইলেও শ্রীধরের নাম তেমন নয়। এটি অদৃষ্টের ফলে হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। পরন্তু এই অদৃষ্ট, পক্ষপাত দোষদুষ্ট নয়। কারণ যিনি যে কোন বিষয়ে প্রথম পথ দেখান, —কোন নূতন পথ আবিষ্কার করেন, ধর্ম্মপক্ষে, তাঁর স্থান সকলের উচ্চে হওয়াই উচিত। পরবর্ত্তী ব্যক্তি সেই পথ অধিকতর সুগম ও সুন্দর করিলেও প্রথম পথপ্রদর্শকের সম্মান কমে না,—বরং বাড়ে,—ইহাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে, নিধু অপেক্ষাও শ্রীধর বা বঙ্গের আধুনিক কোন কবি, প্রণয়সঙ্গীতে সমধিক শক্তিমত্তা দেখাইলেও, নিধুকেই তাঁহার গুরু স্বীকার করিতে হইবে। তিনি স্বীকার না করিলেও, নিরপেক্ষ বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে স্বীকার করাইবেন ;—কেননা কালই ন্যায্যান্যায্যের বিচারকর্ত্তা।—কালের তুল্য বিশিষ্ট সমালোচক আর কেহ নাই। সুতরাং উপরোক্ত গানটি নিধুর বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য।

দ্বিতীয় কথা, প্রাচীন কবিদের অনেক গান, লোকমুখে প্রচলিত থাকায়

অনেক রূপান্তরিত হইয়াও আসিয়াছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-কবিদিগের অনেক গান এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই রূপান্তর বা পাঠান্তরের নমুনা দিয়া আমরা পুঁথি বৃদ্ধি করি নাই,—নিধুর এই প্রণয়সঙ্গীত প্রসঙ্গেও তাহা করিব না। উদ্ধৃত গানের শেষেও আর দুটি ছত্র কেহ কেহ গান করেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ও দু ছত্র নিধুর রচিত নয়, পরবর্ত্তী কোন গায়ক বা কবি উহা যোগ করিয়া দিয়া থাকিবেন। চোখের উপর দেখিয়াছি, এমন সংযোগ বিয়োগ করিয়া, অথবা নূতন একটি কথা বসাইয়া, গান গাওয়া এক শ্রেণীর লোকের স্বভাব। নিধুর ঐ উদ্ধৃত গানের সেই সংযুক্ত দু'ছত্র এই ;—

'দিনান্তে প্রাণান্ত হ'ত, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত, হৃদয় মাঝে উদয় হয়॥'

এ দু'ছত্র যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা গানের রচনা-ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়। কেননা, কবি যে মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ঐ "পিরীতি করিতে গেলে সুখদুখ সইতে হয়"—ইহাতেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইল,—ইহার পর আর ঐ 'দিনান্তে প্রাণান্ত' ইত্যাকার কথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। অন্ততঃ আমাদের ত তা নাই, যদি কাহারো থাকে, তিনি ঐ দু'ছত্র যোগ করিয়া লইতে পারেন এবং নিধুর নামে উহা চালাইতে পারেন,—আমাদের সে প্রবৃত্তি নাই।

কবির আর একটি প্রণয়সঙ্গীত শুনুন ;—

(খাম্বাজ—মধ্যমান)

"তোমারই তুলনা তুমি, প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥"

প্রণয়িনীর প্রতি কি গভীর প্রেম-অভিব্যক্তি! ভালবাসার সামগ্রী এমনই হয় বটে,—তার তুলনা এ পৃথিবীর কোন বস্তুতেই নাই। প্রেমের ভাষাও তাই—'তোমার তুলনা তুমি'। এ ভাবের অভিব্যক্তিটি, নিধুর মত

কবিই প্রকাশ করিতে পারেন। বঙ্গভাষা এই ভাবটি পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। সংস্কৃত কবির কাব্যে, প্রাচীন মহাজন পদাবলীতে এ ভাবের ছবি থাকিলেও থাকিতে পারে ; কিন্তু বঙ্গভাষার ভাব-সম্পত্তি হিসাবে, নিধুরই এ উচ্চসম্মান প্রাপ্য ; তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য বস্তু, আমরা আর কাহাকেও দিতে অনিচ্ছুক।

মাতৃভাষার প্রতিও কবির কতটা সহানুভূতি,—কি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নিম্নের এই গীতটিতে পরিদৃষ্ট হইবে ;—

(কামোদ-খাম্বাজ—জলদতেতালা)

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা। বিনে স্বদেশীয় ভাষা, পূরে কি আশা।
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর, ধারাজলবিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?"

মাতৃভাষায় বিমুখ—পর-ভাষায় পণ্ডিত—"স্বদেশহিতৈষী" মহাত্মাদের - কবির এই অমৃতময়ী উক্তিটি স্মরণ করিবার বিষয়। সাময়িক যশঃ বা পদগৌরবে তাঁহারা বড় হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই স্বদেশ-হিতৈষণা—জুয়ারের জল,—এই আছে এই নাই। মাতৃসেবায় যে বিমুখ, মাতৃভাষার অনুশীলন যে জীবনে করিল না, তাহার স্বদেশভক্তির কথা শুনিলে, 'কাঁঠালের আমস্বত্ব,' মনে পড়ে।
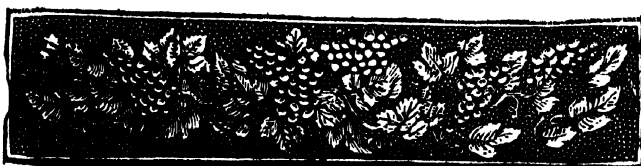
গানের যুগ—কবির গান।

রাম বসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি।

—:০:—

নি ধু বাবুর পর 'কবিওয়ালাদের' কাল। ইহাঁদের প্রভাবও এক সময়ে বঙ্গসমাজে কম ছিল না এবং সেই প্রভাবের ফলে বঙ্গসাহিত্যও যে পরিপুষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা মনে করি না। রাম বসু, হরুঠাকুর, রাসু ও নৃসিংহ প্রভৃতির 'কবির গান' এক সময়ে বঙ্গসমাজের বিশেষ উপভোগের জিনিস ছিল। এখনো ভাবের কাণ পাতিয়া শুনিলে, কবির গানের সেই আড়ম্বরহীন কবিত্ব ও স্বাভাবিক পদলালিত্য শুনিয়া আজিকার অনেক 'কবি-অভিমানী' নব্যকবিকে লজ্জা পাইতে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সম্মানিত দেশপ্রসিদ্ধ কবির সম্পাদিত ভূতপূর্ব্ব "সাধনা" পত্রে কবির গানের অতি অবজ্ঞাসূচক সমালোচনা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ব্যথিত হইবার কারণ এই, সমালোচক মহাশয় সত্যের মর্য্যাদা সম্যকরূপে রক্ষা করেন নাই; তাঁহার সেই সমালোচ্য ভাষার ভঙ্গিটা কিরূপ দেখুন;—

"কবির দল * * * সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে

চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য্য সমস্ত ভাঙ্গিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া লঘুস্বরে উচ্চৈঃস্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁশি-সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্ ঝন্ শব্দে ঝঙ্কার দিতে হইবে, আবার বীণার কাষ্ঠখণ্ড লইয়াই ঠক্ ঠক্ শব্দে লাঠী খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থ এই এক অপূর্ব্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল। প্রথমে নিয়ম ছিল, দুই প্রতিপক্ষদল পূর্ব্ব হইতে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিয়া আনিতেন—অবশেষে তাহাতেও তৃপ্তি হইল না—আসরে বসিয়া মুখে মুখেই বাক্‌যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় যে কেবল প্রতিপক্ষকে আহত করা হয়, তাহা নহে—ভাষা ভাব ছন্দ সমস্তই ছারখার হইতে থাকে। শ্রোতারাও বেশী কিছু প্রত্যাশা করে না—কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিত মত জবাবেই সভা জমিয়া উঠে এবং বাহবা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে—তার উপর আবার চার জোড়া ঢোল, চারখানা কাঁশি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চীৎকার—বিজন বিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিকক্ষণ টিকিতে পারেন না।”

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্র বাবুর নিজেরই লেখা বলিয়া মনে হয়। কেননা, এমন মুন্সীয়ানা কোন আনাড়ী লেখক দেখাইতে পারে না। কিন্তু কথাগুলি কি সম্পূর্ণ সত্য? আসর জমাইয়া বসিয়া, নিজের যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি করিয়া, কি এমনি ভাবে, অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে প্রাচীন কবিদের প্রতি কটাক্ষ করিতে হয়? ইংরেজী শিক্ষার এই নবীনযুগের—রুচি সভ্যতা আদব কায়দা না শিখিয়া, এই সমালোচকের ন্যায় কোন কবি—যদি শতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনিও কি রাম বসু, হরু ঠাকুর অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়া, ‘কবিকীর্ত্তি’ সঞ্চয় করিতে পারিতেন? যে কালের যা, সে কালের সেই ব্যবস্থা। তখনকার সমাজ যেমন,—রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা দীক্ষা চাল্‌চলন যেমন, তেমনি ভাবে কবির গানও হইত।

এখনকারের সাজ-সজ্জায় আবৃত বাঁধা-ষ্টেজে বসিয়াও দুই ঘণ্টা অভিনয় শুনিতে কষ্টবোধ হয়, কিন্তু এমন দিনও ত আমাদের গিয়াছে, চেটাইয়ে বসিয়া সহস্র লোকের মধ্যেও তন্ময়ভাবে অশ্রুপূর্ণ লোচনে চণ্ডীর গান শুনিয়াছি! পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, থিয়েটারের নামে লোকে পাগল হইত,—আর এখন হয়ত সেই থিয়েটারের নামে গায়ে জ্বর আসে!—কেন এমন হয়? বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় বা রবীন্দ্র বাবু কি এবিষয়ে কিছু চিন্তা করিয়াছিলেন? চিন্তা করিলে বোধ হয় এমন ভাবে লেখনী চালনা করিতেন না, অন্ততঃ আরো একটু সংযতভাবে শিষ্টভাষায় এই মন্তব্য প্রকাশ পাইত। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিবৃন্দের উপকার ও সেই উপকার স্মরণহেতু তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা মনে জাগিয়া এমন কঠোর মন্তব্যপ্রচারে হয়ত বাধাও দিত। কারণ আমরা এ কথা বহুবার বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন সম্পত্তি আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষের দান এবং সে দান প্রকারান্তরে ভগবানের দান বলিয়াই মনে করি। হউক না কেন তাহা সামান্য, হউক না কেন তাহা স্বল্প মূল্যের,—কৃতী হইয়াছি বলিয়া কি আমরা পূর্ব্বপুরুষগণকে অবজ্ঞার চোখে দেখিব এবং বিদ্রূপের ভাষায় তাঁহাদিগকে অভিহিত ও তদ্রূপ বিশেষণে তাঁহাদিগকে বিভূষিত করিয়া, হীন অনুকরণকারী সমধর্ম্মাদের নিকট আপন প্রভাব দেখাইব? 'কবির গানের' সম্পূর্ণ পোষক আমরাও নহি; কিন্তু তা বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে অমন অবজ্ঞা ও ঘৃণা করি না। অবজ্ঞা বা ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই—তা ভালতেই হউক আর মন্দতেই হউক। কেননা, ভাল বা মন্দ ত আমাদের রুচিভেদে, প্রকৃতিভেদে? যে ভগবদ্গীতার গভীর উদার মত প্রায় সমগ্র পৃথিবীর পূজ্য,—এমনি বিড়ম্বনার কথা যে, এ দেশেরই এক শ্রেণীর 'শিক্ষিত' ব্যক্তি সেই গীতাকেও 'আজগুবি' বলিয়া অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দেয়। যে রামচরিত জগৎবরেণ্য, সেই দেবদুর্ল্লভ আদর্শ দেবচরিত্রেও কোন কোন হিন্দুসন্তান—'শিক্ষিত' আখ্যাধারী মহাত্মা দোষারোপ করিয়া থাকেন! এটি কি? তাই বলিতে হয়, 'কবির গান' তোমার আমার ভাল না লাগিলেও, এক সময়ে অনেকের ভাল লাগিত এবং এখনও এক শ্রেণীর লোকের তাহা বিশেষ ভাল লাগিয়া থাকে! তাঁহারাও সমাজের বিশেষ পদস্থ লোক।

'সাধনার' সমালোচক বা রবীন্দ্র বাবু 'কবির গান' সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বঙ্গের একজন বিশেষ শক্তিশালী সৌভাগ্যবান্ কবি—দেশপ্রসিদ্ধ ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—বঙ্কিমেরও গুরু—সেই 'কবির গান' সম্বন্ধে, কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন শুনুন ;—

"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের মধ্যে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।"

দেখুন, 'সাধনার' সমালোচকের ভাষা, আর দেশবিখ্যাত 'গুপ্তকবির' 'সংবাদ প্রভাকরের' ভাষা। স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ নয় কি? পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহার উপরও বড় একটি মিষ্টকথা বলিয়া এ প্রসঙ্গের চরম করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা শুনিয়াছি, একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞব্যক্তি রাম বসুর 'বিরহ' শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি আমার টাকা থাকিত, রাম বসুকে লাখ্ টাকা দিতাম।"*

ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে যে ইতিবৃত্তটুকু প্রকাশ করিয়াছেন, আমরাও অবিকল তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—"নিধু বাবু ভিন্ন অপর গীতরচকদিগের মধ্যে গোঁজলা গুঁই, রাম বসু, হরু ঠাকুর, রাসু ও নৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী (নিতে বৈষ্ণব), কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার (কেষ্টামুচি), মহেশ কাণা প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা কবিওয়ালা নামে বিখ্যাত। বোধ হয় 'কবি' নামক গীতপ্রণালী ইহাঁদিগের হইতে প্রথম সৃষ্ট না হউক—গৌরবাস্পদ হইয়াছিল। কবিওয়ালাদের মধ্যে শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কেহই ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত কবিত্বশক্তি ছিল। কবির গানে দুই দল থাকে—এক দল গান গাহিয়া নিবৃত্ত হইলেই অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ গান বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করে এবং সেই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর গীত শ্রবণ করিয়া সভাসদেরা কাহার জয়—কাহার পরাজয় হইল, তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ইহাঁদের

---

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।

প্রতিদলেই একজন বা দুইজন করিয়া গীতরচক (বাঁধনদার) থাকেন; রাম বসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি ঐরূপ গীতরচক ছিলেন। গীতরচকেরা কেহই বিদ্যা বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না; কিন্তু আসরে বসিয়াই তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্তরূপ প্রত্যুত্তর গীত রচনা করিবার অলৌকিক শক্তি থাকায় ইহাঁদিগকে সকলেই যথেষ্ট সমাদর করিত। বিশেষতঃ, তাদৃশ স্বল্প সময়ের মধ্যে রচিত গীতেও অসাধারণ কৌশল ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ থাকিত, এজন্য তাৎকালিক বিজ্ঞলোকেরা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়েরা কবির গান শুনিতে বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। যাত্রার গানপ্রণালীও তৎকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকেরা কবি শুনিতে পাইলে কেহ যাত্রার নিকট বেঁসিতেন না। কবিতে ঐরূপ অনুরাগ হওয়ায়, উহার পরবর্ত্তী সময়েও পরাণ দাস, উদয় দাস, নীলমণি (নীলমণি পাটুনি), নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর. ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা, ভবানী বেণে, আণ্টুনি সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন কবিওয়ালা বিশেষ গৌরব সহকারেই কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। এখনও কবির গানের প্রথা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহাতে লোকের সেরূপ অনুরাগ নাই, সুতরাং সেরূপ ভাল গীতরচকও আর জন্মে না। মধ্যে কবির গানের অনুকরণেই কলিকাতার ধনি-সন্তানেরা 'হাফ্ আকড়াই' নামক গানপ্রণালীর আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারও অপ্রচলন হইয়াছে।"

এই 'কবির গানের' অপভ্রংশেই বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'তরজা' ও 'ঝুমুর' প্রভৃতির প্রচলন হয়। শেষ এই কবির গানেরই উৎকৃষ্ট সংস্করণ বোধ হয়—পাঁচালী।

স্বভাবের নিয়মবশে, কেমন একটির পর একটি তরঙ্গ উঠিয়া ভাষা-নদীর বেগ বৃদ্ধি করিয়াছে.—আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। অথবা মহাপ্রকৃতির খেলা ও বিশ্বরহস্যই এই;—বিন্দু বিন্দু বালুকণার সংযোগে প্রকাণ্ড পাহাড় হয়, আর ফোঁটা ফোঁটা বারির সমষ্টিতেই মহা-সাগরের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

'কবির গানের' পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী গীতরচকদিগের পরিচয় দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, আমরা কেবল মাত্র এ দলের অগ্রণী তিন জন

কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। সে তিন জন বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গসমাজে সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন। ১ম রাম বসু, ২য় হরু ঠাকুর, ৩য় রাসু ও নৃসিংহ। রাসু ও নৃসিংহ দুই ভাই—কবির দলে এক-যোগে গান বাঁধিয়া দিয়া তদানীন্তন সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 'কবির গানের'—একজন অতি উৎকৃষ্ট সংগ্রহকার—দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "লুপ্ত রত্নোদ্ধার" নাম দিয়া একখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয়, উৎসাহ অভাবে, তিনি এ রত্নের আর উদ্ধার করেন নাই। কাব্যামোদী পাঠককে আমরা কেদার বাবুর ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা দেখিবেন, 'কবির গান' নিতান্ত হেলাফেলার জিনিস নয়,—প্রকৃতই উহাতে যথেষ্ট কবিত্ব ও ভাবুকতা আছে,—বঙ্গসাহিত্যে উহার সরস ভাব ও কমনীয়তা নীরবে প্রবেশ করিয়া ভাষাকে বিলক্ষণ শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে।

"মনে রইল সই, মনের বাসনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারি বলি-বলি বলা হ'লো না॥
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে, নির্লজ্জা রমণী ব'লে হাসিত লোকে,
সখি, ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে, নারী জনম যেন আর করে না॥" **

রামবসুর এই 'বিরহ' এক সময়ে সর্ব্বত্র গীত হইত। তাঁহার অনেক গান লোকের মুখে মুখে ফিরিত। আর একটি শুনুন;—

"দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেয়ো না।
তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু কাল থাক' থাক' ব'লে ধ'রে রাখ্‌বো না॥
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভাল থাক' সেই ভাল, গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।
দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন,
কও কথা, একবার কও কথা, তোল ও বিধুবদন।

পিরীত ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে—তায় লজ্জা কি ?
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি,
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হ'ল বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলাম না।"

নিরাশ প্রণয়ের কি গভীর মর্ম্মভেদিনী উক্তি! রমণী-হৃদয়ের এ কাতরতা, ভালবাসার এ গভীরতা, যে কবি এমন সরল সহজ স্বাভাবিক ভাবে, আড়ম্বর-হীন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করা, আর ছাই-চাপা আগুনের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়া—সমান কথা। প্রাচীন কবিদের এই সব গান প্রকৃষ্ট প্রণালীতে সংগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধভাবে ছাপিলে এবং তাহা সুযোগ্য ও সমজদার ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বাজারে বাহির হইলে, বর্ত্তমান কালের অনেক 'কবি' আখ্যাধারী—শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী রুচি-বাগীসের মুখ শুকাইয়া যায়। 'সাধনার' সমালোচক—তথা রবীন্দ্র বাবু কি বলেন ?

উদ্ধৃত গানটিতে, নায়িকার নিরাশ-হৃদয়ের মর্ম্মকাতরতার সহিত একটু চাপা-শ্লেষও আছে। এটুকু বড় সুন্দর! রচনার কৌশল ইহারই নাম ;—'প্রণয় ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে, তায় লজ্জা কি, এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি।' অল্প কথায় কি সুন্দরভাবে হৃদয় পরিব্যক্ত হইয়াছে!—এই দুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়া, সুবিখ্যাত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'—রচয়িতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলেন,—"ইহা নায়িকার বিষম শ্লেষ-উক্তি। ইহার অপেক্ষা নায়ককে দু'ঘা মারা বরং ভাল।"

আমাদের স্থানাভাব ; তাই রাম বসুর সকল গানের পরিচয় দিতে পারিলাম না। তা দিবারও তেমন প্রয়োজনও নাই। কেননা, রসজ্ঞ পাঠক উপরের উদ্ধৃত ঐ দুইটি গানেই কবির ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। রামবসুর রচনানৈপুণ্য, ভাষার সজীবতা, লিপিকুশলতা কোনক্রমেই অস্বীকার করিবার যো নাই। নিম্নের এই গান গুলিতেও সে পরিচয় যথেষ্টরূপে পাওয়া যায়।

(১) 'এমন ভাব-রাখা ভাব কোথা শিখিলে,
সে ভাব কোথা হে আজ, যে ভাবে ভুলালে ॥'

(২) 'যৌবন জনমের মত যায়, সে ত আসা-পথ নাহি চায়। * * *

(৩) 'থাক প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয় থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর, তারে নিন্দা করি পাছে পতিনিন্দা হয়। আমি মরি সহচরি, করিনে সে ভয়॥ * * *

(৪) "এই খেদ তারে দেখে মরতে পেলেম না। আমায় চা'ক্ না চা'ক্, সদা সুখে থাক্, কেন দেখা দিয়ে একবার ফিরে গেল না॥"

(৫) "একে আমার এ যৌবনকাল, তাহে কাল বসন্ত এ'ল,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে 'আসি' বলে, সে হাসি দেখে, ভাসি নয়নের জলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন যায় ধরিতে, লজ্জা বলে ছি ছি ধ'রো না॥"

সূক্ষ্ম তুলি দিয়া দুই চারিটি রেখা টানিয়া যেমন দক্ষ চিত্রকর অতি অল্পেই এক বিরাট্ দৃশ্যের অবতারণা করেন, মানবহৃদয়ের দক্ষ-চিত্রকর,—স্বভাবের শিল্পী কবিও তেমনি, মানবহৃদয়ের অতি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শব্দ-চিত্রে, অতি সামান্য আয়াসে, সে ভাবের ছবি প্রকাশ করিয়া থাকেন। উদ্ধৃত চিত্রগুলিতে সম্ভোগের ভাব অল্পাধিক পরিমাণে ফুটিয়া বাহির হইতেছে বটে, কিন্তু, চিত্রগুলি কেমন সজীব ও স্বাভাবিক! কবির চিত্র যে সর্ব্বত্রই কামগন্ধ বর্জ্জিত হইবে, সর্ব্বত্রই যে তাহা নিষ্কাম প্রেমের উচ্চ আদর্শে ফুটিয়া উঠিবে, এমন আশা করিতে নাই। ভারতচন্দ্রের সমালোচনার সময় এ কথা আমরা বিশদভাবে বলিয়াছি। আদিরসপ্রধান কাব্য, কবিতা বা গান, আদিরসের ভিতর দিয়াই দেখিতে হয়,—করুণরসের বা অন্য কোন রসের তুলনায় তাহার সমালোচনা করিতে নাই। তাই কোন কোন আধুনিক কবি 'রামবসুর বিরহে' নিষ্কাম প্রেমের তত্ত্ব খুঁজিয়া থাকেন, আর তাহা পান বলিয়া প্রকারান্তরে কবির যশোপ্রভা মলিন করিতে প্রয়াসী হন। তাঁহাদের সে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আর পুঁথি বাড়াইব না। কিন্তু এরূপ প্রয়াসী হওয়া কি সঙ্গত? ছলনা করিয়া, ছিদ্রান্বেষী হইয়া, কূটকৌশল অবলম্বন করিয়া, ভাষার মার-পেঁচ লাগাইয়া,—দল বাঁধিয়া তুমি কতক্ষণ জয়ী হইবে? দল পাকাইয়া সমধর্ম্মাদের নিকট দিন কত বাহোবা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে দল থাকে

না,—সময়ের কষাঘাতে কে কোথায় ছিটকিয়া ছড়াইয়া পড়ে। ভগবানের রাজ্যে সত্যের মার্ কখনই নাই। হায় দল!

শ্রদ্ধাস্পদ রামনারায়ণ বাবু রামবসুর বিরহ-সঙ্গীতে আমাদের উদ্ধৃত ঐ শেষের গানটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য-প্রেম! সাধ্বীকুল-কামিনীদিগের লজ্জার কি মোহন চিত্র।"—এইবার 'সাধনার' সমালোচক তথা রবীন্দ্র বাবুর দল কি বলেন?—কবির গান কি সত্যই এমন হেয় জিনিস যে, "চার জোড়া ঢোল, চার খানা কাঁশি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চীৎকার—বিজন বিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিকক্ষণ টিকিতে পারেন না।"—সত্যই কি তাই? সমালোচক কি ইঙ্গিতে তদানীন্তন সমাজের কবির 'আসর' বর্ণনা করিয়া প্রকারান্তরে কবির গানের হীনত্ব প্রমাণ করিতেছেন না? করুন; কিন্তু উপরের উদ্ধৃত ঐ গানগুলি পাঠ করিয়া নিরপেক্ষ পাঠক ইহার বিচার করিবেন।—হায় রে যশোলিপ্সা!

রাম বসু মহাশয় ভদ্রবংশোদ্ভব, কুলীন কায়স্থ। কলিকাতার সন্নিকট সালিখা গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। কবির জন্ম ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ; দেহত্যাগ ১৮২৮।

রাম বসুর পর হরু ঠাকুর। হরুর আসল নাম—হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী। ব্রাহ্মণ বলিয়া ঠাকুর নামে তিনি অভিহিত হইতেন। ইংরেজী ১৭৩৯ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮১৪ সালে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়। রাম বসু অপেক্ষা ইনি বয়সে বড় ছিলেন। 'সমস্যা' পূরণে ইহাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ইহাঁর কোন পেশাদারী দল ছিল না, সখ্ করিয়া ইনি কবির দলে গান গাহিতেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ, কবিকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই প্ররোচনায় কবি দিনকতক একটি দল খুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সে দল ছাড়িয়া দেন। বোধ হয়, পেশাদারী দলে সম্মান থাকে না বলিয়া তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা। কেননা, একবার নবকৃষ্ণ হরু ঠাকুরের গানে সন্তুষ্ট হইয়া গুণের পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহাকে এক জোড়া শাল পুরস্কার দেন। অপমান বোধে, কবি সে শালজোড়া ঢুলির মাথায় ফেলিয়া দেন। রাজা অবশ্যই প্রথমে ইহাতে কুপিত হইলেন বটে, কিন্তু হরুর কবিজনোচিত শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে পরম সমাদর করিতে লাগিলেন। একবার রাজার বাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে বহু পণ্ডিতের সমাগম

হইয়াছে, রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমার এই সমস্যাটীর পূরণ করিয়া দিউন—'বঁড়শী বিধেঁছে যেন চাঁদে।' পণ্ডিতগণ ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর করিতে পারিলেন না; বিলম্ব দেখিয়া মহারাজ হরু ঠাকুরকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হরু ঠাকুর তখন গামোছা কাঁধে ফেলিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন. সেই অবস্থাতেই তিনি রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে সমস্যা পূরণ করিয়া দিতে বলিলেন। হরু ঠাকুর কাগজ কলম লইয়া সমস্যা পূরণ করিতে বসিলেন। তাঁহাকে অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না, তিনি সমস্যা পূরণ করিয়া দিলেন,—

'এক দিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি' ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥'*

এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এখনকার দিনে দেখিতে পাওয়া যায় কি? বস্তুতই হরু ঠাকুর 'স্বভাব কবি' ছিলেন। তাঁহার সখীসংবাদ প্রভৃতি গান এক সময়ে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত।

"ওগো চিনেছি, চিনেছি, চরণ দেখে, ঐ বটে সেই কালিয়ে।
চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হোয়ে।—
যে চরণ ভজিয়ে. ব্রজেতে আমায়, ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে॥"

উদ্ধৃত অংশটিতে কবি-হৃদয়ের কি গভীর ভক্তি ও প্রেম ফুটিয়া বাহির হইয়াছে! দেশের শোচনীয় দুর্ভাগ্য যে, এখনো এক শ্রেণীর লোক এ হেন কবির গানে অসভ্যতা দেখেন ও অশ্লীলতার গন্ধ পান।

ভক্ত কবির এ ভাবের আরো একটি গান শুনুন;—

"জলে জলে কিগো সখি! অপরূপ রূপ দেখি॥ দেখ সই নিরখি।
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়,
মায়া ক'রে ছায়ারূপে, সে কালা এসেছে কি?
আচম্বিতে আলো, কেন যমুনার জল, দেখ সখি কূলে থাকি কে করিল ছল,
তীরের ছায়া নীরে লেগে হ'লো বা এমন।
স্থগিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটী আঁখি॥

* পণ্ডিত ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত "বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য।"

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে। না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে॥
আজ সখি একি রূপ নিরখিলাম হায়! নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়॥
ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে, বলে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে হইবে সখি পাতকী॥
বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই ত নই। (ওগো প্রাণ সই)
নিরিখ নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই॥
কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে। শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে॥
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদ-বান্ধব। হৃদয়কমল কেন তা দেখে হবে সুখী॥'

উদ্ধৃত করিলাম এই দুইটি মাত্র গীত, এমন শত শত গীতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অলঙ্কৃত,—কবি-কুঞ্জ মুখরিত। শুধু কবিতার হিসাবে পাঠ করিলেও, ইহাতে যে কাব্য-সুধা লাভ হয়, আধুনিক কোন্ কবি—কোন্ গীতিকাব্যকার ইহা হইতে নির্ম্মল, পবিত্র, উচ্চাঙ্গের প্রেমকবিতা রচনা করেন? যা কিছু দেখি, তার ত অধিকাংশই এই সব স্বর্গীয় সঙ্গীতের এক কলা, আধ কলা! প্রাচীন গান ভাঙ্গিয়া, একটু পালিস করিয়াই ত, তাঁহাদের জারিজুরি! ভাবুন দেখি, উদ্ধৃত গীতিটি যখন সুর-তান-লয় সংযোগে—মহড়া-চিতেন-অন্তরায় যথাযথ নিয়মে গীত হয়, তখন ভক্ত ও ভাবুকের হৃদয় কি অমৃত-মদিরায় আচ্ছন্ন হইতে থাকে! কবিত্ব হিসাবেই বা ইহার মূল্য কত! কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী গোপিকা, যমুনার জলে প্রাণ-বল্লভের রূপ দেখিতেছেন; দেখিতে দেখিতে ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন,

'আজু সখি, একি রূপ, নিরখিলাম হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়॥'

কখন বা ভাবিতেছেন—

'তীরের ছায়া নীরে লেগে হ'লো বা এমন!'

ভক্ত ও ভাবুকের চোখ দিয়া ছবিটি দেখুন আর ভাবুন;—সেই নবনীরদ-বরণ শ্যামরূপ, সেই নীলবরণা যমুনা, সেই তীরস্থ বৃক্ষরাজির শ্যামস্নিগ্ধ ঘন ছায়া!—তিনই শ্যাম, তিনই সুন্দর। তাই প্রেমবিহ্বলা গোপিকার মনের চোখে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি জাগিয়াছে। তাই সেই শ্যামযমুনার শ্যামসলিলে ভক্ত হৃদয়ের ছবি দেখিতেছেন, আর দেখিতে দেখিতে ভাবে নিমগ্ন হইতে-

ছেন।—গীতি-কবিতার হিসাবে, এই একটি গানে দীন কবি হরু ঠাকুরের স্থান, আজ কালের কত ঠাকুরের কত উচ্চে,—বিজ্ঞ সুধীমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন,—এ সম্বন্ধে আমরা আর কিছু বলিব না।

যাঁহারা 'সাধনার' সমালোচকের ওকালতী করেন, তাঁহাদিগকে কেবল এই মাত্র বলি, বাহিরের চাকচিক্য—বালাখানা, আসাসোটা, জুড়ীগাড়ী, বা টাকার তোড়া দেখিয়া অন্ধ হইয়া, দরিদ্র কবিকে অবজ্ঞা করিও না,—তাহার দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া ঘৃণা করিও না,—তাহার ন্যায্যপ্রাপ্য সম্মান ও কাব্যকীর্ত্তি লোপ করিতে চেষ্টা পাইও না।—কেননা সেও ঈশ্বরের সন্তান; আকাশের নিম্নে ও এ বিপুল পৃথিবীতে তাহারও স্থান আছে! কালই তাহার সহায়; কালে তাহার কাব্য-কীর্ত্তি ফুটিবেই ফুটিবে, ভগবান্ তাহার সহায় হইবেন;—তা তুমি তাহাকে যতই পদদলিত করিতে চেষ্টা পাও। তাহাতে অধর্ম্ম ত আছে, মহাপাতকও হয়। কিন্তু অহংমদে এ কথা তুমি এখন মানিবে না; বলিবে, কবিওয়ালা বড়লোকের অনুগ্রহপ্রত্যাশী মাত্র, অশিক্ষিত, অসভ্য ইত্যাদি। তা যদি ঠিক হয়, ত তুমি সেই বড়লোকের হীন অনুকরণকারী মাত্র। দারিদ্র্যের উল্লেখ করিয়া অকারণ কবিকে অপদস্থ করা, অতি বড় মহাপাতক বলিয়া মনে করি। সত্য যা, তা প্রকাশ পাইবেই; তা তুমি যত বাধা দাও আর যা খুসী তাই বল।

উপরে রাম বসুর যে আমরা অত প্রশংসা করিয়া আসিয়াছি,—ভক্তি-প্রেমের সরল সুন্দর ভাব-অভিব্যক্তিতে, হরুঠাকুর সে রাম বসুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদের প্রাণের কথা। তা কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় হরুঠাকুরকে রাম বসুর মত অমন জোর 'সার্টিফিকেট' দিন আর নাই দিন।

এইবার রাসু-নৃসিংহের কথা।—রাসু ও নৃসিংহ দুই সহোদর। 'প্রভাকর-সম্পাদক' স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সন ১২৬১ সালে ১লা মাঘের প্রভাকরে রাসু-নৃসিংহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ইহাঁদের বিরচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেন। উক্ত উভয় সহোদরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, দুই জনের ভিতর এক ব্যক্তি সুকবি

ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাঁরা সখি-সংবাদ ও বিরহ-গান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট, অতিশয় শ্রুতিসুখকর ও সর্ব্ববিষয়েই যশোযোগ্য।"

কবিই কবির মর্য্যাদা বুঝেন। গুপ্ত মহাশয়ই সর্ব্বাগ্রে বহু চেষ্টায় বহু পরিশ্রমে এই সকল প্রাচীন কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও লুপ্তসঙ্গীত সংগৃহীত করেন—তাঁহার সেই উচ্চাশয় ও কবিজনোচিত সহৃদয়তা তাঁহারই যোগ্য।

ফরাসডাঙ্গার নিকট কোন পল্লীগ্রামে রাসু-নৃসিংহের বাস। ইহাঁরা কায়স্থ। উপাধি কি, জানা যায় নাই। ঠিক কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও নির্ণয় হয় নাই। কবিদ্বয় গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গুটিকত গান এখনো প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়া আছে। ইহাঁদের একটি সখি-সংবাদ শুনুন;—

"ইহাই ভাবি হে, গোবিন্দ! সঘনে। আঁখি হাসে, পরাণো পোড়ে আগুনে॥
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যেজিলে, কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে?
জগৎসংসার, ভুলাইতে পার, তোমার বঙ্কিম নয়নে।
(ওহে) কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে, তোমারে ভুলালে কি গুণে? * * *
শ্যাম! এই ভূমণ্ডলে, আধ গঙ্গাজলে, রাধাকৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন 'কুঁজীকৃষ্ণ' বোলে, ডাকিবে সকলে, ভুবন তরাবে দুজনে॥
শ্যাম! ত্যেজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি, যুবতী সকলি সহিল।
ভুজঙ্গ মাণিক, হ'রে নিল ভেক, মরমে এ দুঃখ রহিল॥
শ্যাম! প্রদীপের আলো, প্রকাশ পাইল, চন্দ্রমা লুকাল গগনে।
ওহে! গো-খুরের জল, জগৎ ব্যাপিল, সাগর শুকাল তপনে॥"

গানটির ভাব, ভঙ্গি, রচনার কৌশল, ভাষার গাঁথুনি—কেমন দেখুন দেখি! সে আজ কত কালের কথা,—বাঙ্গালার হয়ত দুই জন নিরক্ষর ব্যক্তি এই সাধা বীণায় ঝঙ্কার করিয়াছেন,—আর বাঙ্গালার বুধমণ্ডলী কত আগ্রহে, কত যত্নসহকারে, আজও তাহা কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন! তাই বলিতে হয়, ভাব শুধু পাণ্ডিত্যে আর আড়ম্বরে নহে,—ভাব মনে। যার মন বড়, সেই যথার্থ বড়লোক।

কবি ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাবুকতার আর একটু পরিচয় লউন ;—

"কহ সখি, কিছু প্রেমেরি কথা। ঘুচাও আমার মনের ব্যথা॥
করিলে শ্রবণ, হয় দিব্যজ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথা ?
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে, প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা॥
আমি রসিকের স্থান, পেয়েছি সন্ধান, তুমি নাকি জানো, প্রেম-বারতা।
কাপট্য ত্যেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, ইহার লাগিয়ে, এসেছি হেথা॥
হায় ! কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে, ভাগীরথী আনে ভারতভূমে॥
কোন্ প্রেমে হরি, ব'ধে ব্রজনারী, গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা॥"

ভাব ও ভাষার ঝঙ্কারে, চিত্রটি কত উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে ! আধুনিক সকল কবিই কি এইরূপ—কি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপ—প্রেমের কবিতা লিখিয়া থাকেন ? তবে তাঁহাদের এত বিরক্তি বা রাগ কেন ? হায় প্রাচীন-যুগ !

এমন শত শত অজ্ঞাত কবির সহস্র সহস্র গান আজ বিস্মৃতি-গর্ভে লীন। যাহাও অবশিষ্ট আছে, অনুশীলন অভাবে, উৎসাহ অভাবে তাহাও বুঝি লোপ পায়। কারণ, উপরে বিস্তর আবর্জ্জনা—মলা-মাটী পড়িতেছে, কষ্ট করিয়া কে আর এ সকল রত্ন সংগ্রহ করিবে ? তাই কালমাহাত্ম্যে, কাচ কাঞ্চনের দরে বিকাইতেছে ; আর কাঞ্চন কাচের স্থান পাইয়াছে। বিচার করিবে কে ? সে প্রবৃত্তিই বা কার ? কেননা, প্রায় সকলেই এখন আপন আপন অভিসন্ধি লইয়া ব্যস্ত। আপনাদের মুরুব্বির পানে চাহিয়া, পরস্পর মুখ শুঁকাশুঁকি করিবার কাল এখন পড়িয়াছে। অবশ্য 'কবির গান' যে একেবারে দোষশূন্য, নিষ্কলঙ্ক, এমন কথা বলিতেছি না—দোষ কোন্ বস্তুতে নাই ? কিন্তু অন্যের তিল প্রমাণ দোষ তাল প্রমাণ দোষে পরিণত করিয়া নিজের সতীপনা দেখানোটা কি ঠিক্ ?

'কবির গান' প্রসঙ্গে আমরা অনেক সময় কাটাইলাম। এই বার কথক-চূড়ামণি শ্রীধর ঠাকুরের বিষয় কিছু বলিব।

গানের যুগ—শ্রীধর কথক প্রভৃতি।

প্রণয় সঙ্গীতে নিধুর পরে শ্রীধরের নামই লইতে হয়। অনেক সময় আমার মনে হয়, নিধু ও শ্রীধর যেন গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম, আর মধ্যকার প্রণয়-গীতিকারগণ যেন সরস্বতীর ন্যায় বালির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িয়া আছেন,—তাঁহাদের সে তেজ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, কোন সাড়া-শব্দ নাই।

সন ১২২৩ সালে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে, সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ সুকবি শ্রীধর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় লালচাঁদ বিদ্যাভূষণও একজন খ্যাতনামা কথক ছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব ৺ রতনকৃষ্ণ শিরোমণিও একজন পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। পিতৃপুণ্যে পুণ্যবান্ শ্রীধর পিতা ও পিতামহের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্যে তাঁহার অধিকার জন্মে। সুতরাং একরূপ বালককালেই শ্রীধরের প্রতিভার উন্মেষ হয়। সেই প্রতিভা, কালে কিরূপ উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা তাঁহার অমৃতময়-অমর-সঙ্গীতে পরিদৃষ্ট।

তাঁহার কথকতা শিক্ষার প্রণালীও বড় চমৎকার। "কথকতা শিক্ষার কালে শ্রীধর কখন কোন বালকের হাতে একটি সন্দেশ দিয়া তাহা কাড়িয়া

লইতেন, আর দুইটি বিশাল চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে বালকের তখনকার সে ভাব তুলিয়া লইতেন। আবার কখন বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব গ্রহণের জন্য কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া, নির্নিমেষে তাঁহার রসনার গতি প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিতেন। সর্ব্ববিধ ভাবাভিব্যক্তির বিকাশ শিক্ষায় তাঁহার এমনই সাধনা ছিল। তাই তিনি আদর্শ কথক হইয়াছিলেন।" * মুরশিদাবাদে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে গিয়া ভাবী কথক-গুরুর এই ভাবে সাধনা আরম্ভ হয়। ভগবৎ-কৃপায়, কালে তিনি এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথক-গুরু ছিলেন,—বহরমপুর নিবাসী স্বর্গীয় কালীচরণ ভট্টাচার্য্য।*

সুঠাম সুন্দর সুকণ্ঠ শ্রীধর বালককাল হইতেই কবি। বালককালেই, সহাধ্যায়ীদিগকে উদ্দেশ করিয়া এক একটি গান রচনা করিতেন, আর তাহাই তাহাদিগকে শুনাইয়া মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় করিয়া তুলিতেন। একাধারে কবি ও কথক—তিনি দুই-ই।

শ্রীধরের অনেক গান অনেক কাল ধরিয়া নিধুর নামেই চলিয়া আসিতেছিল ; প্রাচীন সাহিত্যালোচনার ফলে এখন কিন্তু তাহা অনেকটা মীমাংসিত হইয়াছে। তবে এরূপ মীমাংসা যে সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, তাহার আশা নাই। কেননা, উভয়েই এক পথের পথিক, রচনায়ও প্রায় তুল্য মূল্য। প্রণয়-সঙ্গীতে বা টপ্পা-গানে, নিধু রাজা হইলেও, শ্রীধরের আসনও তাঁহার কাছাকাছি ;—কোন কোন গানে তিনি নিধুকেও যেন ছাড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কেননা,

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে ॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥"

——এই গানটি যদি সত্য সত্যই শ্রীধরের হয়, তবে এই এক গানেই তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

---

* শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত "বাঙ্গালীর গান।"

শ্রীধরের দ্বিতীয় গান—

"তবে কি সুখ হ'ত।
মন যারে ভালবাসে, সে যদি ভালবাসিত॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত॥
প্রেম-সাগরেরি জল, হ'তো যদি সুশীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল, তাহে যদি না থাকিত॥"

বলা বাহুল্য, এ গানটিও নিধুবাবুর বলিয়া এখনও অনেকের ধারণা; কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, এটিও না কি শ্রীধর-রচিত।

'বাঙ্গালীর গানের' সঙ্কলয়িতা লাহিড়ী মহাশয় বলেন, শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট তিনি শ্রীধরের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি নিজে দেখিয়া আসিয়াছেন এবং তাহা হইতে নিম্নের এই প্রসিদ্ধ গানটিও—যাহা এত দিন কোন অজ্ঞাত কবির রচিত বলিয়া প্রকাশ ছিল,—শ্রীধর-রচিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন;—

"সখি আমায় ধর ধর!
গুরু-নিতম্ব-হৃদি পয়োধর ভারে, ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি॥
ছিলাম অন্যমনে, বেণুরব শুনে, কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে,
উহু মরি মরি, বাজিছে চরণে, নব নব কুশাঙ্কুর॥
ঘোরা তিমিরা রজনী সজনি, কোথায় না জানি শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী, কাল হইল মোর;—
চাতকিনী যেমন ধায় বারিপানে, তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নব জলধরে না হেরে নয়নে, প্রাণ হ'তেছে অস্থির॥" * *

প্রাচীন কবিদিগের এই লুপ্তপ্রায় রত্নগুলির প্রকৃত অধিকারী কে, তাহা ঠিক্ ঠিক্ নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। যাহা হউক, এখন ত শ্রীধর রচিত বলিয়া সুযত্নে এ গুলির এখানে স্থান দিলাম, পরবর্ত্তী সাহিত্য-সমালোচক, পারেন যদি, ইহার একটা স্থির মীমাংসা করিবেন,—এই সকল গানের প্রকৃত রচয়িতা কে?

যাই হোক, শ্রীধরের নিম্নের উদ্ধৃত এই প্রণয়সঙ্গীত কয়টি পৃথিবীর যে কোন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া গৌরবান্বিত হইতে পারিবে ;—

(১) "আয়রে বিচ্ছেদ, রাখি তোরে, যতনে হৃদি মাঝারে।
জনমের মতন তোমায়, সে—সঁপে গেছে আমারে॥" * * *

(২) 'সখি, সে কি তা জানে। আমি যে কাতর অতি তাহারি বিরহ-বাণে॥
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি, পাশরিতে নারি সেই জনে ;—
দেহে মাত্র আছে প্রাণ, তাহারি ধ্যানে॥"

(৩) "নয়নের দোষ কেন। আঁখি কি মজাতে পারে, না হ'লে মন-মিলন॥"

(৪) "ঐ যায় যায়, ফিরে চায়, সজল নয়নে।
ফিরাও গো, ফিরাও গো ওরে, অমিয় বচনে॥
হেরি ওর অভিমান, দূরে গেল মোর মান,
অস্থির হ'তেছে প্রাণ প্রতি পদার্পণে॥"

আবার বলি, শ্রীধর-রচিত বলিয়া গানগুলির উদ্ধার করিলেও আমাদের মনে এখনও সন্দেহ রহিয়া গেল,—গানগুলি নিধুর কি না। বাল্যের সংস্কার এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাস একেবারে লয় করা দুঃসাধ্য। যাই হোক, নিধু ও শ্রীধর দুইজনেই ভাবরাজ্যের রাজা এবং বঙ্গের সারমিঞা ও তানসেন, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। সেই দুই স্বর্গগত মহাত্মার মুক্তাত্মার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। উপসংহারে চারিজন শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত-রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব মাত্র। এই পরিচয়টুকু দিলেই 'গানের যুগ' প্রস্তাব সমাপ্ত হয়।

যে কারণে হউক, এক শ্রেণীর লোকের নিকট এখনও এই চারিজন সঙ্গীত-রচয়িতার একটু নাম আছে। তাঁহাদের একজন খ্যাতনামা 'দেওয়ান মহাশয়' ওরফে রঘুনাথ রায়। বর্দ্ধমান-কাল্‌নার সন্নিকট চুপীগ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। পিতা ৺ব্রজকিশোর রায়। ১১৫৭ সালে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৩ সালের ১৯শে ভাদ্র ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্দ্ধমান রাজসংসারে ইহাঁরা পুরুষানুক্রমে দেওয়ানী

করিয়াছিলেন, তাই চুপীর 'দেওয়ান মহাশয়' বলিয়া রঘুনাথ বিখ্যাত। দেওয়ান মহাশয়ের একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

(ইমন কল্যাণ—একতালা)

"তব চরণ দু'খানি, অতি বিচিত্র তরণী, দুস্তর ভবার্ণবে হইতে পার।
মনন স্মরণ, এ তরণীবাহকগণ, শ্রীগুরুচরণ কর্ণধার ॥
একান্ত যে জন, ইহাতে করে দৃঢ়মন, অনায়াসে তারিণী, সে হইবে উদ্ধার ॥
ভবান্ধকূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন, কৃপা বিনে গতি নাই তার ॥"

দেওয়ান মহাশয়ের এ গানটিও পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতার পরিচায়ক ;—

"অবিদ্যা ঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার,
অহমিতি মমেতি নাদে গর্জ্জয়ে বারংবার ॥"

দেওয়ান রঘুনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেওয়ান নন্দকুমারেরও কয়েকটি গান এখনো চলিত আছে ;—

"ভুবন ভুলাইলি গো ভুবনমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণা-বাদ্য-নিনাদিনী ॥"

—ইতি শীর্ষক গান এখনো সময় সময় গীত হয়।

তৃতীয় রামদুলাল রায়। ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদের কুলউপাধি নন্দী ; ত্রিপুরার রাজসংসারে দেওয়ানী করিয়া ইনি রায় উপাধি পান। তৎপূর্ব্বে ইনি নোয়াখালীর কলেক্‌টার হেলিডে সাহেবের সেরেস্তাদার ছিলেন। এই দেওয়ান মহাশয়েরও একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

(বাহার—আড়া)

"মা, মনে যত আশা করি, নাহি পূর্ণ হয়।
বাণী তুল্য পাই বিদ্যা, শিবতুল্য হয় সিদ্ধা,
পিতামহ সম আয়ু, ধনেশের ধন হয় ॥
মা, মনে যত আশা করি, হয় না হয় করী করি,
কি করি, কি করি দয়াময় ॥
শ্রীরামদুলালে কয়, মানবে কি ইহা হয়,
দিচ্ছেন আত্ম-পরিচয়, মন মহাশয় ॥"

চতুর্থ—কালী মির্জ্জা ওরফে কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। ইহাঁর পিতার নাম—বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া ইহঁাদের বাসস্থান। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, মির্জ্জা মহাশয় সঙ্গীত বিদ্যার অনুরাগে, সঙ্গীতে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভের আশায়, সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে—কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে গমন করেন এবং ঐ সকল স্থানের অভিজ্ঞ কালোয়াতদিগের নিকট, বিশেষ যত্ন সহকারে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। দীর্ঘকাল পশ্চিমাঞ্চলে থাকায় এবং হিন্দুস্থানীদের মত বেশভূষা করিয়া ভ্রমণ করায়, তখনকার সমাজের বড়লোকেরা আদর করিয়া ইহঁাকে 'মির্জ্জা' আখ্যা দিয়াছিলেন, সেই হইতে 'কালী মির্জ্জা' বলিয়া ইনি খ্যাত। পরন্তু সদাচার সম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ইনি এবং সদালাপী ও অমায়িক ছিলেন। প্রথমে বর্দ্ধমান রাজসংসারে, তৎপরে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রয়ে ইনি প্রতিপালিত হন। কথিত আছে, এই সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায়, মির্জ্জা মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে এই গায়ক-কবির ৺কাশীলাভ হয়।

মির্জ্জা মহাশয়ের একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

(বাহার—তিওট)

"কিবা শোভা পায় পায়।
দেখ নানা বর্ণের ফুল ফুটেছে, শ্যামা মায়ের পায়॥
অমর হয়ে ভ্রমরে, মধুলোভে গুঞ্জরে, যে পদ যোগীশ্বরে ধ্যানে নাহি পায়।
আসিয়ে ঋতুরাজন, চামর করে ব্যজন, তাহে মলয়পবন চারিদিকে ধায়॥
কোকিল নূপুর হ'য়ে পঞ্চম গায়। পুলকে পূর্ণিত হোয়ে কালীর কৃপায়॥"

মির্জ্জা মহাশয়ের এ গানটিও এখনো স্থানে স্থানে গীত হয় ;—

(সুরট—মধ্যমান)

'শব পরে নাচে শ্যামা মগনা হ'য়ে। লাজেরে দিয়েছে লাজ এ কেমন মেয়ে॥
ভয়ঙ্করী অসি ধরা, শবের ভূষণ পরা, অধরে রুধির ধারা পড়িতেছে ব'য়ে॥'

গানটি যদি এই পর্য্যন্ত হয়—আর 'কলি' না থাকে, তাহা হইলে কালী-

ভক্ত মায়ের ছেলের মনে বড় আপশোষ থাকিবে। কেননা তিনি মাকে আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে দেখিতে চান,—মুণ্ডঅসি-ধরা হাত দুটি ছাড়া—মার সেই আর দু'খানি হাত—যে হাতে বর, আর যে হাতে 'অভয়' লইয়া, করুণ-দৃষ্টিতে মা মৃদু মৃদু হাসিতেছেন,—সেই দুইখানি পদ্মহস্তও দেখিতে অভিলাষী। আর চান দেখিতে তিনি—মা'র রাঙ্গা পা দু'খানি;—রক্তজবা ও বিল্বদল যে পদে শোভিত!—যে ত্রিলোকবাঞ্ছিত পদ বুকে লইয়া যোগীশ্বর সদাশিব যোগ-মগ্ন ধরাশায়ী;—সেই দেবদুর্লভ অভয়পাদপদ্ম দর্শন না করিলে যে ভক্তের মানসপদ্ম অপ্রস্ফুটিত রহিবে? সুতরাং ভক্তের চোখে উদ্ধৃত গীতটী অসম্পূর্ণ,—কেবলমাত্র মা'র ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে তিনি চা'ন না।

গানের যুগে এমন কত শত অজ্ঞাত কবি, কত সহস্র অজ্ঞাত গায়ক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জলবুদ্‌বুদের মত কালসাগরে মিলাইয়া গিয়াছেন, কে তাহার নির্ণয় করিবে? সেই জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা মহাজনগণ এবং তৎপরে রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত প্রমুখ শক্তি-উপাসক সিদ্ধ ও সাধকবর্গ সঙ্গীতসাধন-দ্বারা যে কত ভাবে কত উপায়ে ইষ্টারাধনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার ফলস্বরূপ সমুদ্রপ্রবাহের ন্যায় ভাবের প্রবাহ বঙ্গসমাজকে ওৎপ্রোত করিয়া ফেলিয়া—নূতন করিয়া গড়িয়াছিল, তাহার ঠিক্ ঠিক্ সংবাদ কে দিবে? তারপর নিধু ও শ্রীধরের প্রণয়সঙ্গীত এবং শত শত কবি-সম্প্রদায়ের 'কবির গান'—তাঁহাদের প্রদর্শিত 'সখের সঙ্গীত'—এ সমুদয়ের আমূল ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিবেনই বা কে? সেই সেই সঙ্গীতাবলী একত্র করিলে যে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়, তাহা ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়। কত লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি গান এ পর্য্যন্ত রচিত, গীত ও নীরবে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষার সেই সব গান বা কিরূপে প্রবেশলাভ করিল, তাহাও সুনিশ্চিত নির্ণয় করিবার যো নাই। সাহিত্যের এই যে ক্রমবিকাশ,—প্রাকৃতিক নিয়মে এই যে তাহার কখন উত্থান কখন পতন,—শত শত প্রত্নতত্ত্ববিদের জীবনব্যাপী পরিশ্রমেও তাহার মৌলিকতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইবে না,—আমাদের

সামর্থ্য কতটুকু! সকলেই ত একরকম অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতেছি? তা নয় কেউ বাতি লইয়া—আর নয় কেউ হাতাড়ি পাতাড়ি করিয়া! তবে যে মহাশক্তির শুভ ইচ্ছায় আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, সেই মহামায়ার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমরা এই কঠিন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি মাত্র। ফলাফল সেই জগদম্বার চরণে;—আমরা তাঁহার হুকুমে পরিচালিত হইয়া নিমিত্ত-স্বরূপ হইতেছি মাত্র। আমাদের ধারণা, সমালোচনা বা বক্তব্য নিজস্ব কিছুই নহে;—মা যেমন বলাইতেছেন, সেইরূপ বলিতেছি,—তিনি যেমন করাইতেছেন, সেই মতই করিতেছি—এইটুকু মাত্র। সহৃদয় পাঠক, এই কথা স্মরণ রাখিয়া এ গ্রন্থ পাঠ করিলে বাধিত হইব।

প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা একরূপ ফুরাইল। এইবার আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করিব, তাহা একরূপ সকলের চোখের উপর। ইংরেজ রাজত্বে—তথা 'ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য' যে অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে, অতীতের এই ছবিটি না দেখিলে, বর্ত্তমানের বিচার, পাঠকের পক্ষে সুবিধাকর হইবে না ভাবিয়া, আমরা প্রাচীন সাহিত্যের একরূপ মোটামুটী আলোচনা করিয়া গ্রন্থের পূর্ব্বভাগ সমাপ্ত করিলাম। গ্রন্থের উত্তরভাগ এই পূর্ব্বভাগের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইবে। তাহার ফল যেরূপ হইবে, আপনারাই তাহার বিচার করিবেন;—আমরা দেশের ও দশের—মাতৃভাষা বা মা'র সেবক মাত্র।

ইতি পূর্ব্বভাগ।

উত্তর ভাগ

-*•*-

মিশনরী ও 'মৃত্যুঞ্জয়ী' বাঙ্গালা।

ইংরেজ রাজত্বের সূচনার কিছুকাল পূর্ব্বে, বঙ্গে গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন হয়। আগে যাহা ছিল, তা না থাকারই মধ্যে। প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্য আর এখনকার বাঙ্গাসাহিত্য সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও, মধ্যে একটি সংযোগ বা সাঁকো আছে। সেই সাঁকো পার হইয়া 'ভিক্টোরিয়া-যুগে' আসিতে হয়। কিন্তু সেই সাঁকো পারের সময়টা এত কষ্টকর,—সে সময়কার গদ্যসাহিত্য এত অস্পষ্ট, ম্লান ও নিস্তেজ যে, তাহা অপেক্ষা প্রাচীন যুগের সেই পয়ারাদি ছন্দঃ এবং একাধিপত্যময় কবিতারাজ্য শতগুণে শ্লাঘনীয়। স্বর্গ মর্ত্ত্যে যতটা পার্থক্য, বুঝি তাহা অপেক্ষাও পার্থক্য,—এই দুই যুগে অনুভূত হয়। কিন্তু প্রকৃতির আশ্চর্য্য নিয়মে, ঈশ্বরের অপার করুণায়, ভিক্টোরিয়া-যুগে সেই গদ্য-সাহিত্য এমন অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল,—এমন শক্তিসম্পন্ন, সুস্পষ্ট ও সর্ব্বাবয়বপূর্ণ হইল,—যে, তাহা দেখিয়া বিদেশী—সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাষীও চমৎকৃত হইল;—দেশীয়ের ত কথাই নাই। কেন এমন হয়? কোন্ মন্ত্রশক্তিতে এমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটে? দার্শনিক বলিবেন, প্রাকৃতিক নিয়ম; ভগবদ্ভক্ত বলিবেন, ঈশ্বরের মহিমা। প্রকৃতই ঈশ্বরের

মহিমা বা দেবতার দান না হইলে, মানুষ আপন শক্তিতে কখনই এ অঘটন ঘটাইতে পারে না। যাঁহারা পুরুষকারের পোষকতা করেন, তাঁহারা ইহাতে মানবী শক্তির জয়ঘোষণা করিবেন সন্দেহ নাই। আমরা দৈববাদী,—আমরা ইহাতে সেই অদৃশ্য দৈবীশক্তিরই বিকাশ দেখিতে পাই। আর সেই শক্তিরই একটি অংশ—ভাগ্যবতী ব্রিটন-লক্ষ্মী—রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া। প্রকৃতি যাঁহাকে পূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বরী করিয়া ভূমণ্ডলে পাঠাইলেন, তাঁহার শান্তিপ্রদ শাসনসময়ে ত সকলই পূর্ণতালাভ করিবে? ভাষা যে একটা জাতির অস্তিত্বের নিদর্শন? বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গভাষা তাই সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী মাতার রাজত্বকালে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এ পরিপূর্ণতা অর্থে,—যে আধারে যতটুকু ধরে, ততটুকুর সমষ্টি। এক হিসাবে, মাতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গবাসীর সেই দৈবী শক্তি—ভাষার সেই প্রকৃষ্ট উন্নতি যেন ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। জুয়ার-গাঙ্গে যেন ধীরে ভাঁটা পড়িতেছে;-একটা যেন ঘোর প্রতারণাপূর্ণ ব্যবসাদারী বিজ্ঞাপনের যুগ এখন আসিয়াছে; যথাস্থানে আমরা এ সকল কথার আলোচনা করিব।

অথবা, কথাটা এ ভাবেও গ্রহণ করা যায় যে, গাড়ীর এঞ্জিন এত দ্রুত দৌড়িয়াছিল যে, এঞ্জিন খুলিয়া গেলেও গাড়ীর গতি (Motion) এখনো থামে নাই,—সে আপনা আপনিও যেন সেইরূপ দ্রুত চলিতেছে। স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি নিত্যনূতন সংবাদপত্র বা বিবিধ পুস্তক পুস্তিকাদির প্রচার দেখিয়া, আহ্লাদে আটখানা হইয়া ভাবিতেছে,—না জানি বাঙ্গালা সাহিত্যের কি সৌভাগ্যের যুগ!—এমনটি বুঝি আর হয় নাই, হইবেও না। কিন্তু যিনি পরিণাম দেখিতে জানেন,—দেশের ও জাতির অবস্থা,—সভাসমিতি না করিয়াও নির্জ্জনে ভাবিয়া থাকেন, তাঁহার মনে যেন দৃঢ়ধারণা হইতেছে,—বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বুঝি এই খানেই শেষ;—কেননা, বাঙ্গালী ধর্ম্মবল হারাইতেছে, আর পাশববলে মাতিতেছে। মাথার উপর কেহ নাই, সকলেই স্বেচ্ছাচারী ও স্ব স্ব প্রধান; তা জাতীয়তায় যেরূপ, সাহিত্যেও সেইরূপ—কেবল দোকানদারী, বাক্‌চাতুরী ও কূট কৌশল। এই কূট কৌশলে কেহ রাজা সাজিয়া নেতা বলিয়া মাথায় মুকুট পরিতেছেন,

আর কেহ বা অহংমদে মত্ত হইয়া গায়ের জোরে বঙ্গসাহিত্যের সিংহাসন গ্রহণ করিতেছেন। যে বাধা দিবে বা প্রতিবাদ করিবে, তারই বিপদ,—বেনামীতে তার চৌদ্দপুরুষান্ত করা, প্রাণে মারা, অথবা তার রুটী হরণের চেষ্টা—এই সবই হইয়া থাকে। দেশের অবস্থা এখন সাধারণতঃ এইরূপ। সরলতা ও আন্তরিকতা যেন দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে, ভাষায়ও তাই নানাবিধ আবর্জ্জনা প্রবেশ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, যাঁহারা প্রকৃতই ভাল লোক অথবা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহারা একরূপ সমাজসংস্রব ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনবাসী হইয়াছেন এবং সেই নির্জ্জনেই ইষ্টদেবতার নিকট আপন ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ নিবেদনের সহিত দেশের এই অধঃপতনের কথাও জ্ঞাপন করিতেছেন। যদি তাঁহাদেরই পুণ্যে এ দুর্দ্দিনের অবসান হয় ;—এই যা আশা ও সান্ত্বনা।

প্রাচীন ও নবীন যুগের সাহিত্যালোচনার কথাপ্রসঙ্গে দেশের কথাও একটু আসিয়া পড়িতেছে। না আসিয়া উপায় নাই বলিয়া আসিতেছে। কারণ যাহাদের লইয়া সাহিত্য, তাহাদের স্বরূপ-চিত্র একটু আধটু না দেখাইলে প্রস্তাবিত বিষয় পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইবে কেন ?

এখন যে কথা বলিতেছিলাম ;—ভিক্টোরিয়া-যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যের যে অবস্থা ছিল, তাহার নমুনা এখানে একটু দেখাইব। সেই সকল নমুনা দেখিলে মনে হয়,—ভাগ্যবতী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রিত্বফলে,—ইংলণ্ডের সর্ব্ববিধ বিজয়-শ্রীর সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষাও সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ,—প্রাকৃতিক পুণ্যপ্রভাব,—তৎসঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার সমধিক বিস্তার। তাহার ফলে বঙ্গসন্তান আপন জাতীয় অভাব উপলব্ধি করিয়া, জাতীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে কারী, মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি পাদরীসাহেব এবং কোন কোন সদাশয় সিভিলিয়ান্‌ও বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকাদি প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় বাইবেল প্রচারই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি, তৎসঙ্গেও যে, তাঁহারা বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য অবশ্যই তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীরামপুরে তাঁহারা প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত

করেন। * সেইখান হইতে প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ ছাপা হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতও সেই ছাপাখানা হইতে প্রথম ছাপা হইয়াছিল। পাদরী সাহেবদের বাঙ্গালার একটু সামান্য রকমের পরিচয় দিতেছি ;—

"এক বড় বিলেতে অনেক বেঙ্গের বসতি ছিল। তাহার ধারে কতকগুলি বালক হঠাৎ খাপরা খেলা খেলিতে লাগিল। আর জলে একজাই খাপরা-বৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে ক্ষীণ ও ভীত বেঙ্গেদের বড় দুঃখ হইল। শেষে সকল হইতে সাহসী এক বেঙ্গ বিল হইতে উপরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, হে প্রিয় বালকেরা! তোমরা এত ত্বরাতেই কেন আপন জাতির নিষ্ঠুর স্বভাব শিক্ষহ।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতেও অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখানেও কারী সাহেব বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে মিশাইয়া এক ব্যাকরণ ও এক অভিধান প্রস্তুত করেন। এই সময় রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' এবং পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে 'তোতাপাখীর ইতিহাস' নামে এক গ্রন্থ উর্দ্দু হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতা কে, তাহার স্থিরতা নাই। এই গ্রন্থের ভাষার একটু নমুনা দেখুন ;—

"পূর্ব্বকালে ধনবানদের মধ্যে আদমসুলতান নামে একজন ছিলেন। তাঁহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্য সামন্ত ছিল।"—ইত্যাদি।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসুর "লিপিমালা" এবং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "রাজাবলী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। লিপিমালার নমুনা,—

"তোমাদের মঙ্গল সমাচার অনেক দিবস পাই নাই। তাহাতেই ভাবিত আছি ; সমাচার বিশেষরূপ লিখিবা। চিরকাল হইল তোমার খুল্লতাত,

* এ সম্বন্ধে একটু মত-পার্থক্য আছে। "প্রচার" নামে একখানি খ্রীষ্টীয় মাসিক পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, "১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরেজ, হুগলী সহরে সর্ব্ব-প্রথমে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সার চার্ল্স্ উইল্‌কিন্‌স্ স্বহস্তে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা হরফ প্রস্তুত করেন। মিঃ হলহেড্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপেন। সেই ব্যাকরণ খানিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা পুস্তক। তৎপরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মিশনরীগণ বাইবেল মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন।"—প্রচার, ফেব্রুয়ারী, ১৯০১।

গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন হেতু সমাচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।”

“রাজাবলীর” নমুনা ;—

‘‘শকাদি পাহাড়ী রাজার অধর্ম্ম ব্যবহার শুনিয়া উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য সসৈন্তে দিল্লীতে আসিয়া শকাদিত্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে মারিয়া আপনি দিল্লীতে সম্রাট্ হইলেন।”—ইত্যাদি।

‘প্রতাপাদিত্য-চরিতের’ ভাষাটিও কিরূপ দেখুন ;—“ইহা ছাড়াইলে পুরীর আরম্ভ। পূবে সিংহদ্বার পুরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা—তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে, দক্ষিণভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহাদের সাতে সাতে আর অনেক অনেক পশুগণ।”—রামরাম বসু।

এই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের “বত্রিশ সিংহাসন” নামক গ্রন্থ রচিত হয়। “বত্রিশ সিংহাসনের” ভাষার একটু নমুনা দেখুন ;—

“এক দিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভা মধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন, ইতোমধ্যে এক দ্ররিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সন্মুখে উপস্থিত হইল. কথা কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন, যে লোক যাত্রা করিতে উপস্থিত হয়, তাহার মরণকালে যেমন শরীরের কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না, ইহারও সেই মত দেখিতেছি, অতএব বুঝিলাম. ইনি যাত্রা করিতে আসিয়াছেন, কহিতে পারেন না।”

কিন্তু উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ‘প্রবোধচন্দ্রিকার’ ‘উৎকট সাধু ভাষায়’ লিখিত বাঙ্গালার নমুনা দেখিলে সংস্কৃত টুলো-পণ্ডিত মহাশয়গণও বোধ হয় হার মানিবেন ;—“কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।”

দেখুন,—ইহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত,—দুয়ের কিছুই নয়।

ইহার অব্যবহিত পরে, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম এক জীবন-চরিত প্রকাশিত হয়। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ইহার লেখক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী তিনি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন।

'কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত্রের' রচনাপ্রণালী অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত এবং ইহার ভাষাও প্রাঞ্জল। একটু নমুনা দেখুন,—

"পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রমত প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের লোকদিগের কোন ব্যামোহ নাই ভৃত্যবর্গেরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কালক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই।"*

এইরূপে রামজয় তর্কালঙ্কারের "সাংখ্যভাষ্য সংগ্রহ," লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার-প্রণীত "মিতাক্ষরা দর্পণ", কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের "ন্যায়দর্শন" এবং পূর্ব্বোক্ত মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার "পুরুষপরীক্ষা" "হিতোপদেশ" প্রভৃতি গ্রন্থ,—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য ছিল। "পুরুষ-পরীক্ষা"র ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল বটে। একটু নমুনা দেখুন ;—

"বঞ্চক কহিতেছে, ভো রাজকুমার! আমি স্বাভাবিক লুব্ধ বণিক ; তোমার ধন লইয়া বাণিজ্যার্থে বৃহন্নৌকারোহণ করিয়া সাগর পারে গিয়াছিলাম। সেখানে ক্রীত বস্তু বিক্রয় করিয়া মূলধন হইতে এক শত গুণ লাভ পাইয়া তথা হইতে আসিতে সমুদ্রের তটের নিকট আমার বৃহত্তরণী মগ্ন হইল, তাহাতেই আমার সকল ধন নষ্ট হইল, এখন প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সে যাহা হউক আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তুমি আমার প্রাণদণ্ড কর।" †

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গদ্য সাহিত্যের এই নমুনা। ইহাকে দুই স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথম স্তর—মিশনরী বাঙ্গালা ; দ্বিতীয় স্তর—পণ্ডিতী বাঙ্গালা। অবশ্য বাঙ্গালা পদ্য, সে সময়, এই গদ্য অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট ছিল।

এক হিসাবে খাঁটি বাঙ্গালা পদ্যের এখন যেন কিছু অবনতি হইয়াছে।

* এইরূপ স্বর্গীয় রামকমল সেন মহাশয়ও, বাঙ্গালীর মধ্যে, সর্ব্বপ্রথমে, ইংরেজী ও বাঙ্গালা-ভাষায় মিলাইয়া একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন। তাঁহার অভিধান, এতদ্দেশীয় ইংরেজী পাঠার্থীর প্রথম অভিধান ছিল।

† পুরুষ পরীক্ষার নানারূপ পাঠান্তর আছে। এই গ্রন্থের লেখকও ভিন্ন ভিন্ন। ঠিক্ কোন্ খানি আদি গ্রন্থ, তাহাও নির্ণয় করিবার যো নাই।

ইংরেজীর অত্যধিক অনুকরণ-স্পৃহা ও কষ্ট-কল্পনাই, বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ। পয়ার-প্লাবিত বাঙ্গালা দেশে সেই স্বভাবকবি কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কবিতা—এখন একান্তই দুর্লভ। অধিক কি, প্রখ্যাতনামা 'গুপ্তকবি' ঈশ্বরচন্দ্রের সেই সহজ সরল রসাল রচনাও, এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। আমার বোধ হয়, কেবলমাত্র খাঁটী বাঙ্গালা-কবিতা লিখিবার জন্য, স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে হয় না। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবী এই সব মহাকবিদের কথাও ছাড়িয়া দিই,—গীতি-কাব্যকার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, এবং জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস—যে দেশের আদি বৈষ্ণবকবি; শ্রীজয়দেব যে দেশে ললিত মধুর ঝঙ্কারে 'ললিত লবঙ্গ-লতা' গান গাহিয়াছেন; ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ এবং সাধক কমলাকান্ত যে দেশে 'মা' নাম গাহিয়া আবালবৃদ্ধবনিতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন;—অধিক কি, সামান্য পাঁচালীগায়ক দাশরথি রায়ও যে দেশে, সাদা কথায় অতি সোজা-ভাষায় ভাবের লহরী ছুটাইয়াছেন,—সে দেশের লোকের কবিতা বা গান রচনার জন্য বিদেশীয় সাহিত্যের আদর্শগ্রহণ আবশ্যক হয় না। অপিচ, সেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ গ্রহণেই, যেন আমাদের খাঁটী বাঙ্গালা কবিতা, এক সোপান নিম্নে নামিয়া পড়িয়াছে।

তবে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য, বাঙ্গালা গদ্যের আদর্শ,—এখন বহু ইংরেজী সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। সাহিত্যের বিশালতা ও উদারতা হিসাবে,—হিন্দুর আদর্শমূলক সাহিত্য-গ্রন্থ—রামায়ণ ও মহাভারত যথেষ্ট বটে; কিন্তু বিষয়বৈচিত্র্যে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে ও বিভিন্ন স্বাধীন মৌলিকচিন্তা সংগ্রহ করিতে; ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষ সাহায্য আবশ্যক হইবে। সে হিসাবে, আরও অন্ততঃ শতবর্ষকাল, এই ভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের গতি চলিলে, সে আশা অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইতে পারে।

ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ অবস্থা ছিল, সংক্ষেপে আমরা তাহার একরূপ পরিচয় দিলাম। কিন্তু বলি নাই যে, আর এক মহাত্মা সে সময় নানা কার্য্যে অশ্রান্ত শ্রম করিয়াও বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা পাঠ করাইতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজ-বিষয়ে

তাঁহার সহিত আমাদের যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকিলেও এ কথা অম্লানবদনে বলিব, তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইনিও একজন পরিচালক। রাজা রামমোহন রায়কে আমি এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। উক্ত মহাত্মার "পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী," "বেদান্তের অনুবাদ," "কঠোপ-নিষদ," 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি গ্রন্থ সে সময়ে প্রধান বাঙ্গালা গ্রন্থ ছিল। রামমোহনের ভাষার একটু নমুনা দেখুন ;—

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমুদায়ে দুইশত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়"—ইত্যাদি।

রামমোহন রায়, কৃষ্ণবন্দ্যো প্রভৃতি

খ্যাতনামা বাঙ্গালীর মধ্যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালাগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে পাদরী কৃষ্ণ বন্দ্যো এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও কিছু দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বন্দ্যোর "ষড়্দর্শনসংগ্রহ" "বিদ্যা-কল্পদ্রুম" প্রভৃতি পুস্তক, এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্র তাহার নিদর্শন। ইঁহাদের ভাষার একটু নমুনা লউন ;—

"এতদ্দেশে প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক অনেক নরপতি ও বীর-দিগের দেবপুত্ররূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয়, পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল" ইত্যাদি।—কৃষ্ণ বন্দ্যো।

"বিবিধার্থ সংগ্রহে" ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন,—

"আমরা পল্লীবাসী জনের প্রতি অমর্ষান্বিত হইয়া দুর্ব্বল পরামর্শ পক্ষের উল্লেখ করিতেছি ; কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্রেরই রীতি হউক এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে।"—ইত্যাদি।

এখন কথা এই,—বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রকৃতকাল নির্ণয় করা অতি দুরূহ। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কাল হইতে

বাঙ্গালা গদ্যের উদ্ভব হয়; তৎপূর্ব্বে পয়ারাদি কবিতাই একমাত্র প্রচলিত ছিল। আবার কেহ বা বলেন, 'ত্রিপুরার রাজাবলী'ই প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক। কিন্তু এ কথার অকাট্য কোন প্রমাণ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে, বাঙ্গালা ভাষার একটু নমুনা পাইয়াছি। "বিদ্যাসাগর" রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার একখানি পুঁথির পাঠ উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—"এই পুঁথি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বের রচিত, এবং নরোত্তম দাস ইহার রচয়িতা। এ নরোত্তম দাস কে, তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পুঁথির নমুনা এই ;—

"তাহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িতা। বাহ্যজ্ঞান রহিত। তেঁহ নিত্য চৈতন্য। তাহাকে জানিব কেমনে। তেঁহ আপনাকে আপনি জানান। যে জন চেতন সেই চৈতন্য। অতএব স্বরূপ রূপ এক বস্তু হয়। বর্ত্তমান অনুমান এইরূপ।"——ইত্যাদি।

পাঠক দেখিবেন, এই উদ্ধৃত অংশটুকু ক্রিয়াবর্জ্জিত, পরন্তু অপেক্ষাকৃত সরস ও সুমিষ্ট। কিন্তু প্রকৃতই ইহা যদি তিন শত বৎসরের বাঙ্গালা হয়, তবে ইহাও একটা ভাবিবার কথা বটে। ফল কথা, লেখার ধাত বা নমুনা দেখিয়া, ভাষার স্তর-বিভাগ করা বড় কঠিন কাজ। কেবল অনুমানে ইহার উৎপত্তিকাল নির্ণয় হইতে পারে না। সেই জন্যই আমরা এই আনুমানিক 'সাহিত্যিক' খুঁটী-নাটীর তত পক্ষপাতী নহি। মোটামুটী সকলে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারেন,—পাদ্রী সাহেবদের তথা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা হইতে আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের চারিটি স্তর বা শ্রেণী হইয়াছে। "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম" নামক গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে সংক্ষেপে একবার আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গভাষার আদিম বা প্রথম স্তর,—ভাষা গ্রাম্যদোষদুষ্ট ও অতি অস্পষ্ট এবং ভাব নিতান্ত অপরিস্ফুট, নিস্তেজ ও ম্লান। দ্বিতীয় স্তর—সংস্কৃত ব্যাকরণের একাধিপত্য, সুতরাং অনেকস্থলে নিরর্থক শব্দাড়ম্বর ও তজ্জন্য ভাব জটিলতা। তৃতীয় স্তরেই বাঙ্গালীর সৌভাগ্যসূর্য্য অল্পে অল্পে দেখা দিল। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে কারণেই হউক, তাঁহার প্রতিভা-কিরণ দিগন্তপ্রসারী হইল না। তাঁহার

সেই প্রতিভার পূর্ণ অধিকারী হইলেন,—অন্য দুই মহাত্মা। মদনমোহনের আবির্ভাবের কালটি বঙ্গসাহিত্যের তৃতীয় স্তর। সেই স্তরের প্রধান নেতা,—মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত।

কিন্তু এ দুই মহাত্মার কথা কহিবার পূর্ব্বে, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারাদির সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা কিছু বলিতে হইতেছে।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের আদিম বাসস্থান—উড়িষ্যা প্রদেশ। নানা শাস্ত্রে ইনি পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইনি প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। অতঃপর কিছুদিনের জন্য তদানীন্তন সদর-দেওয়ানী আদালতের জজ-পণ্ডিতের পদেও বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবোধ-চন্দ্রিকা গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য রচিত হইয়াছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম মুদ্রণ হয়। এ গ্রন্থের ভাষা যতই কটমট হউক, প্রথম যুগের গদ্যগ্রন্থের লেখক বলিয়া, উৎকলী পণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেননা, শতাব্দী পূর্ব্বে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বিশেষ খাঁটী বঙ্গবাসী না হইয়াও যে তিনি সে সময়ে বঙ্গভাষায় গদ্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণবন্দ্যো অথবা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁর বাসস্থান কলিকাতায়। পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজের ছাত্র। ডিরোজিও সাহেব তখন হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। তাঁহার উপদেশ প্রভাবে কৃষ্ণমোহনের মতিগতি খ্রীষ্টধর্ম্মে আকৃষ্ট হইল, ফলে তিনি খৃষ্টান হইলেন। পঠদ্দশায় তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না, বিদ্যোৎসাহী স্বনামখ্যাত হেয়ার সাহেব কৃষ্ণমোহনের পুস্তকাদি বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতেন। ইংরেজী ১৮৩২ সালে কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পার্শী, লাটীন প্রভৃতি বহু ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার অনেকবার পরীক্ষক ছিলেন। বিদ্বজ্জন-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। ১৭৭৬ সালে তিনি ডি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হন। ৭২ বৎসর

বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। ব্রাহ্মণের ছেলে খৃষ্টান হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সিমলার হেদুয়া পুষ্করিণীর সম্মুখে যে গির্জ্জা, উহা কৃষ্ণ বন্দ্যোরই সংস্থাপিত। কৃষ্ণমোহনের এক মাসিকপত্র ছিল, তাহার নাম 'বিদ্যাকল্পদ্রুম,'। হিন্দুধর্ম্মের তথা পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদ থাকিলেও এক সময় বঙ্গভাষা কল্পদ্রুম দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এই পত্র প্রকাশিত হয়। তৎকালীন গভর্ণর জেনারল লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে 'কল্পদ্রুম' উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। সেই উৎসর্গ-পত্রের এক অংশ এইরূপ ;—

"বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থ বিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে ; কেননা অবিদ্যা ও ভ্রান্তির যে দুষ্ট শক্তি দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে, তাহা হইতে সাধারণের মন এ উপায়ে মুক্তি পাইতে পারে ; কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যাক্ষেত্র পরিমাণ জ্যোতিষাদি সকল শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তার পূর্ব্বক পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞান পূর্ব্ব খণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।"

শতাব্দী বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা মাসিকের অবস্থা এবং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, উদ্ধৃত অংশটুকু পড়িলে তাহা বুঝা যায়।

তৃতীয়,—রাজা রামমোহন রায়। এই মহাত্মার নাম জগদ্বিখ্যাত। কি স্বদেশে কি বিদেশে—ইহাঁর মান সর্ব্বত্রই। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শে যে সকল বড় কাজ করিতে পারিলে, মানুষ এ কালে মহৎ বলিয়া গণ্য হয়, রাজা রামমোহন প্রায় সে সমুদয় কাজ একাকীই সমাধা করিয়াছিলেন। তিনি 'একাই একশ' ছিলেন। সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে—সকল দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। বিধাতা সে শক্তিও তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছিলেন। বাল্যে হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, কিন্তু কৈশোর ও

যৌবনের মাঝামাঝি, এ অনুরাগ তাঁর লোপ পায়। ক্রমে প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্য সহকারে শাস্ত্র সমুদ্রমন্থন করিয়া তিনি বেদ হইতে হিন্দুর একেশ্বরবাদ প্রমাণ করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির সাহায্যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি করেন,—আদি ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। নব্যধর্ম্মের নবপ্রচারে তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমেই তাঁহার দলপুষ্ট হইল। যে সকল নব্যযুবক দলে দলে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিল, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিল; কিন্তু পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম হইতে চিরবর্জ্জিত হইল। মন্দের ভাল হইল এইটুকু,—খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের যে স্রোত তখন খরগতিতে বহিতেছিল, তাহা মন্দীভূত হইয়া আসিল।—ঘরের ছেলে একরূপ ঘরে রহিল,—তবে পাশ্চাত্যভাবে আচারভ্রষ্ট হইয়া।

ইংরেজী শিক্ষা ইহাঁর কিছু অধিক বয়সে হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহা শিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আশ্চর্য্য মেধার সহিত তাহা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। সে আয়ত্তের ফলে ইংরেজীতে একজন উৎকৃষ্ট লেখকরূপে গণ্য হইলেন। সংস্কৃত পারসী ভাষায় তৎপূর্ব্বেই তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত হিব্রু, লাটিন, গ্রীক্, ফরাসী প্রভৃতি দশটি প্রধান প্রধান ভাষায় রামমোহন অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

পারিবারিক শান্তিলাভ রামমোহনের ভাগ্যে ঘটে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। হিন্দু সমাজ হইতে, পিতার আশ্রয় হইতে, আত্মীয় স্বজন হইতে তিনি তাড়িত হইয়াছিলেন। সমাজসংস্কার ও স্বদেশসেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল, কিন্তু তাহা ঐ পাশ্চাত্যের আদর্শহিসাবে।

লর্ড বেন্টিঙ্ক তখন ভারতের শাসনকর্ত্তা। হিন্দুর সহমরণ প্রথালোপের তুমুল আন্দোলন রামমোহনই করেন; তাহার ফলে উহা উঠিয়া যায়।

রামমোহনের আদি বাসস্থান—হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রাধানগর গ্রাম। জন্ম ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ। পিতার নাম রামকান্ত রায়। রামকান্ত একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

রঙ্গপুরের কলেক্টরের নিকট রামমোহন প্রথমে কেরাণীগিরি করেন, পরে ঐ স্থানেই দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চাকরিতে তাঁহার

বিলক্ষণ আয় ছিল। ধনবল, অর্থবল ও বিদ্যাবল—তিন বলেই তিনি ভাগ্যবান্ হইয়া ছিলেন। ধর্ম্মে আমাদের সহিত তাঁহার মতবিরোধ থাকুক, একেশ্বরবাদে তিনি অকপট ছিলেন। আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত তিনি ঐ মত সমর্থন করেন,—হুজুগে পড়িয়া গা-ভাসান দেন নাই।

দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে তিনি রাজা উপাধি পান এবং তাঁহারই প্রসাদে তিনি বিলাত গমন করেন। এই ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা তাঁহার চিরদিনই ছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয় তিনিই প্রথম বিলাত যান। ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সেও কিছুদিনের জন্য গিয়াছিলেন, তথা হইতে আবার ইংলণ্ডে আসেন। বিলাতে গিয়াও রামমোহন আপন মত প্রচার করেন। সেখানকার বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, উদ্ভাবনী শক্তি, পাণ্ডিত্য, ভাষাজ্ঞান, যুক্তি তর্ক প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হন। এই বিলাতেই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার সমাধি হয়।

রামমোহনের তিন বিবাহ; শেষ বিবাহ কলিকাতা-ভবানীপুরে হইয়াছিল। সেই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র হয়—রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ। বাঙ্গালীর মধ্যে রমাপ্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম জজরূপে মনোনীত হন।

বিধাতা কোন্ সূত্রে কাহাকে দিয়া কোন্ কাজ করেন এবং তাহার ফল কি হয়, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। রামমোহন প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়া মাতৃভাষায় লেখনী চালনা করেন,—প্রতিবাদ স্বরূপ তদানীন্তন হিন্দুসমাজের পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন,—তাহার ফলে বাঙ্গালায় ভাল ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল,—গদ্য বঙ্গ-ভাষা ক্রমেই পরিপুষ্ট ও মার্জ্জিত হইয়া আসিল। রামমোহন সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, উত্তরে তদানীন্তন হিন্দুসমাজ হইতে 'পাষণ্ডদলন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া রামমোহনের উক্তির খণ্ডন করিতে লাগিল। এই বাদ প্রতিবাদের ফল—বাঙ্গালা গদ্যের ক্রমিক অনুশীলন ও উন্নতি।

হিন্দুর দৃষ্টিতে রামমোহনের যতই দোষ থাকুক,—রামমোহন যে একজন ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষ, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তিনি মনে যাহা সার ও

সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, যে কোন প্রকারে হউক, তাহা সমাধা করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ও পালীভাষা শিখিতে হইবে, ত তিব্বতে গিয়া দুই তিন বৎসর কাটাইলেন; উত্তমরূপ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে হইবে, ত ৩।৪ বৎসর কাশী থাকিয়া, অনন্যমনে উহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন যে কাজে তিনি লিপ্ত থাকিতেন, তন্ময় হইয়া তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন;—এরূপ প্রবল অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠায় ভক্তের ভগবান্ সহায় হইবেন, বিচিত্র কি? 'যাদৃশী ভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী' —এ মহাজন বাক্য রামমোহন আত্মজীবনে উজ্জ্বলভাবে দেখাইয়াছিলেন।

রামমোহন ভক্ত, রামমোহন ভাবুক, রামমোহন কবি;—কর্ম্মবহুল সংগ্রামময় জীবনে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশিয়া থাকিয়া, এ শক্তি লাভ করা বড় কম সুকৃতি নয়। 'নিরাকার ঈশ্বরসাধন', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরমব্রহ্মের আরাধন—তিনি জীবনে যেমন বুঝিয়াছিলেন, আমরণকাল তাহারই উদ্বোধন করিয়া যান,—তাহারই ফলে তদ্বিরচিত অত্যুৎকৃষ্ট কতকগুলি পারমার্থিক সঙ্গীত প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা গদ্যের আদি প্রবর্ত্তকও এক হিসাবে তিনি,—ভক্তিমূলক বৈরাগ্য-উদ্দীপক ব্রহ্মসঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথম রচয়িতাও তিনি। এক আধারে এত শক্তি,—এ যুগে আর দেখা গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিলাত গমনের সময় জাহাজে বসিয়া অশ্রান্তভাবে শাস্ত্রানুশীলন, শাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত-রচনা,—ভজন সাধন গান—এই করিয়াই তিনি সময় কাটাইতেন। কেবল দুগ্ধপান ও ফলমূল মিষ্টান্নাদি আহার করিয়া তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন, অখাদ্য কুখাদ্য—মাংসাদি ভক্ষণ তিনি করেন নাই।

'পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী', 'বেদান্তের অনুবাদ', 'কঠোপনিষদ', 'পথ্য প্রদান' প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া রামমোহন বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি করেন; কিন্তু সে হিসাবে তাঁহার নাম যত থাকুক আর না থাকুক, তাঁহার সাধনগীতি—ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে চিরবরেণ্য করিয়া রাখিবে। কালে হয়ত তাঁহার ধর্ম্মমতও লীন হইতে পারে; তাঁহার সমাজ সংস্কারাদির অস্তিত্বও না থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব স্বরূপ তাঁহার গানগুলি কেহ ভুলিতে

পারিবে না। বঙ্গভাষা-জননী তাঁহার ভক্ত-সন্তানের সঙ্গীতগুলি পাইয়াই সন্তুষ্ট। রামমোহনের কয়েকটি গানের নমুনা এই ;—

(১) "একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ।
কেন এত আশা তবে এত দ্বন্দ্ব কি কারণ॥"

(২) "অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য এ দেহ মন, জেনেও কি জান না॥"

(৩) "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে কথা কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥"

(৪) "আমায় কোথায় আনিলে।
আনিয়ে সাগর-মাঝে তরী ডুবালে॥"

—এই সকল গান,—ভক্ত ও ভাবুক-সমাজে চির-আদৃত।

উপস্থিত প্রস্তাবে আমরা কেবলমাত্র রামমোহনের সাহিত্যজীবন আলোচনা করিতে লেখনী ধারণ করিয়াছি; কিন্তু উক্ত মহাত্মার অশ্রান্ত কর্ম্মজীবনের বৈচিত্র্য স্মরণ করিলে অবাক্ হইতে হয়; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিলেও তাহার সমাপ্তি হয় না।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কলিকাতার সন্নিকট সুঁড়ায় ইহাঁদের পৈতৃক বাস। কুলীন কায়স্থ-সমাজে ইহাঁদের মান-মর্য্যাদা চিরদিন হইতেই আছে। পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। ১৭৪৩ শকের ৫ই ফাল্গুন শনিবার রাজেন্দ্রলালের জন্মদিন। বিদ্যার পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজকীয় বৃত্তি ও 'রাজা' উপাধি দিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেশপ্রসিদ্ধ। প্রত্নতত্ত্বে ইহাঁর অসাধারণ অধিকার। দেশ বিদেশে ইহাঁর নামও বিখ্যাত। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী তিন ভাষাতেই ইনি লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ১২৮ খানি গ্রন্থ ইনি লিখিয়াছেন। ইংরেজীতে ইহাঁর উড়িষ্যার ইতিবৃত্ত এবং সংস্কৃত ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থ, ইহাঁকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' মাসিক পত্র এবং 'রহস্যসন্দর্ভ', 'পত্রকৌমুদী', 'শিবজীর জীবনী', 'মিবারের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থেও ইহাঁর যশঃ আছে। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, পার্শী, উর্দ্দু এবং ইংরেজী ভাষা

ব্যতীত গ্রীক, লাটিন, ফরাসী এবং জর্ম্মাণ ভাষাতেও ইনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১২৯৮ সালের ১১ই শ্রাবণ ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইংরেজী ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালের বাঙ্গালা ভাষার নমুনা পূর্ব্বে কিছু দিয়াছি, উপসংহারেও তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মাইকেলের 'তিলোত্তমা কাব্যের' সমালোচনা তাহার নমুনা ;—

"পয়ারছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পনা-শক্তি শব্দাভাবে বহুদুর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বলভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয় এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা একবাক্যকে যতদুর ইচ্ছা ততদুর দীর্ঘ করিতে পারেন ; যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বাক্য শেষ করিতে পারেন, ও যে পরিমিত ছন্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয় তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন, কদাপি পাদপূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলতঃ দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড়। তাহার পরিত্যাগে কবিতা-কমনীয় অবয়ব হইতে পারে। তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়, সর্ব্বত্রই সুচারু রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে।"

মদনমোহন তর্কালঙ্কার। পণ্ডিত মদনমোহন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে মদনমোহনের শিক্ষা এবং কালে ঐ কলেজেই তাঁহার সাহিত্য অধ্যাপকের পদগ্রহণ। তিনি যেমন সুপুরুষ ও কবি ছিলেন, তেমনি সুরসিকও ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনে মদনমোহন একজন প্রধান অগ্রণী ছিলেন। তাহার ফলে, বেথুন সাহেব স্ত্রীশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেন,—সুপ্রতিষ্ঠিত বেথুন কলেজ মদনমোহনের চেষ্টার আংশিক ফল। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার দুই কন্যাকে এই মেয়ে-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

তাহার ফলে সমাজে তাঁহাকে বিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেশে ৬।৭ বৎসর কাল তাঁহাকে 'একঘ'রে' হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। ১২৬৪ সালে ২৭ ফাল্গুন বিসূচিকা রোগে মদনমোহনের দেহান্তর হয়।

সংস্কৃত কলেজ হইতে মদনমোহন মুর্শিদাবাদে জজ-পণ্ডিত হইয়া যান; ছয় বৎসর পরে ঐ স্থানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পান;—দুঃখের বিষয় এই কাজেই তাঁহার সাহিত্যজীবনের অবসান হয়।

রসতরঙ্গিণী, বাসবদত্তা, ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা গ্রন্থ মদনমোহনের রচিত। 'সর্ব্বশুভঙ্করী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা তাঁহারই যত্নে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধের ভাব, ভাষা, রচনাপ্রণালী নাকি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া তদানীন্তন সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা বলিয়াছিলেন,—"এরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালা রচনা তৎপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই।"

মদনমোহনের 'রসতরঙ্গিণী' কতকগুলি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ। সে অনুবাদে ভারতচন্দ্রের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে। দ্বিজরাজ হীন সাজ দিবসের ভাগে॥
ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ। দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টি মাত্রে সুখ॥
অতএব একেবারে বিজ্ঞ হওয়া ভার। দেখিয়া শুনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার॥"

অপিচ, কবির 'বাসবদত্তা'ও ভারতের ভাব ও ভাষা লইয়া রচিত বলিয়া মনে হয়;—

"কুটিল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী। কুণ্ডলী করিয়া যেন কাল কুণ্ডলিনী॥
রমণী স্বরূপ মণি সদা রক্ষা করে। তাঁর জোরে অপাঙ্গ ভঙ্গীর বিষে জারে॥"
—ইত্যাদি।

মদনমোহনের আর একটি মাধুর্য্যময়ী রচনার পরিচয় গ্রহণ করুন;—

"কালিয়মর্দ্দন, কংস-নিসূদন, কেশী মথন কংসারে।
খগপতি বাহন, খেচর পালন, খিন্নখলবলহারে॥
নূতন নীরদ, নীল কলেবর, নন্দ-নন্দন নরাকারে।
পতিতপাবন, পরম কারণ, পীত-পটু-পটধারে॥

বল্লভ-বালক, বিপিন বিহারক, বংশীবটতট তীরে।
ভুবন-ভূষণ, ভকতি ভাজন ভীরু-ভব-ভয়-তারে॥”

কবির এ সকল কবিতা ও পূর্ব্বোক্ত কাব্যগ্রন্থও কালে বিলুপ্ত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার শিশুশিক্ষার ৩য় ভাগের ‘ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার’ প্রভৃতি সন্দর্ভ এবং “পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল॥”—ইতিশীর্ষক শিশুকবিতা বঙ্গসাহিত্যে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিবে। শিশু ত শিশু,—অনেক শিশুর পিতার মনেও সেই শৈশবস্মৃতি জাগিয়া আছে এবং আজিও অনেকের তাহা কণ্ঠস্থও আছে। বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঠ্যপুস্তকের সমধিক প্রচলন প্রভাবে, মদনমোহন চাপা পড়িয়া গেলেন,—নচেৎ তাঁহার প্রতিভা ও রচনাশক্তি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত না।

যা হোক, সে বিধি-লিপি ও কবির অদৃষ্টের ফল বলিতে হইবে। ক্ষণ-জন্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত, গদ্যসাহিত্যের কাণ্ডারী হইলেন। যথাদিনে তাহাদের প্রতিভা-তরী বঙ্গীয় সাহিত্য-নদীতে ভাসিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে স্বভাবকবি দেশপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয়, বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গসমাজে প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার নবোদিত প্রতিভা-রবি অনেকের যশঃপ্রভা মলিন করিয়া দিল। সমগ্র দেশ—সমগ্র সমাজ গুপ্তকবির একান্ত অনুরক্ত ও ভক্ত হইয়া পড়িলেন,—ঈশ্বর গুপ্তের নামে তাঁহারা পাগল হইতেন। এমন সৌভাগ্য সকলের ঘটে না;—গুপ্তকবির প্রভাবে যেন সমস্ত দেশ তোলপাড় হইতে লাগিল।

তবে, অনন্ত সমুদ্রবক্ষে ইহাও একটি তরঙ্গ মাত্র। কালে এ তরঙ্গ থামিয়াছিল;—এখন আর নাই বলিলেই হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে—তথা বঙ্গসমাজে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব এক সময়ে যেরূপ ছিল, তেমনটি প্রায় দেখা যায় না। বালক-কাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কবি—স্বভাবকবি বলিয়াই তাঁহার প্রখ্যাতি। প্রবাদ এইরূপ, তিন বৎসর বয়সেই তাঁহার শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল,—'রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে ক'ল্‌কেতায় আছি।' বলা বাহুল্য, তখন কলিকাতা সহরের আব্‌-হাওয়া ভাল ছিল না, ড্রেণ নরদমা প্রভৃতি অতি অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধময় ছিল, তাহার ফলে মশা ও মাছির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইত। তাই বালক—সেই দুধের শিশু ঈশ্বর—কলিকাতা দেখিয়া, ঈশ্বর-দত্ত স্বাভাবিক শক্তিতে মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া বলিল,—'রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে ক'লকেতায় আছি।'

১২১৮ সালে ২৫ ফাল্গুন শুক্রবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত, ত্রিবেণীর পর-পারস্থ কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬৫ সালে ১০ই মাঘ ইহাঁর পরলোক ঘটে। কবির পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,—

"কলিকাতা যোড়াসাঁকোতে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহের আলয়। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে চাকরি করিতেন। * * দশবৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃবিয়োগের পর অধিকাংশ সময় তিনি

মাতুলালয়ে আসিয়া থাকিতেন। শুনা যায়, তৎকালে পড়া-শুনায় তিনি বড় অনাবিষ্ট ছিলেন। নামমাত্র পাঠশালায় যাওয়া;—দুষ্টামিতেই তাঁহার সময় কাটিত। বলিতে গেলে, শিক্ষা যাহাকে বলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই। ইংরাজী শিক্ষা ত হইলই না, বাঙ্গালাও নিজে পড়িয়া যাহা শিখিলেন, তাহাই একমাত্র সম্বল হইল। কিন্তু এই সম্বল লইয়াই অচিরকাল মধ্যে তিনি সুকবি ও সুলেখকরূপে পরিচিত হইলেন। যৌবনের প্রারম্ভে পাথুরিয়া ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মে। তাঁহাদেরই ভবনে তিনি অবসরকাল যাপন করিতেন। তাঁহাদেরই আশ্রয়ে, তাঁহাদেরই উৎসাহে, তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফূর্ত্তি হয়।"*

বারো বৎসর বয়স হইতেই ইনি কবির দলে গান রচনা করিয়া দিতেন। ভাবিয়া দেখুন, এ কি? লেখাপড়া ত নামমাত্র, কিন্তু এ অল্পবয়সে এ কবিত্বশক্তি আসিল কোথা হইতে? দৈবশক্তি কি ইহারই নাম নয়? পূর্ব্বজন্ম, প্রারব্ধ ও সংস্কার কি মানিতে হয় না? অবশ্য, ঈশ্বরচন্দ্রের স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ ছিল, তিনি একবার যাহা শুনিতেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যাইত। তাহা সত্ত্বেও ইহা দৈবকৃপা মনে করি।

যাই হোক, উক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে ১২৩৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করেন। উক্ত সালের ১৬ই মাঘ এই পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রভাকরে গুপ্তকবির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়। একাধারে গদ্য ও পদ্যময়ী বহু রচনা তাঁহার এই প্রভাকরে থাকিত। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য সকল বিষয়ে লেখনী চালনা করিবার সৌভাগ্য থাকিলেও ব্যঙ্গ ও শ্লেষকবিতায় ঈশ্বরচন্দ্রের সমধিক কৃতিত্ব ছিল। এ বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবিতায় হাস্যরসের সম্যক বিকাশ, এ যুগে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর। যাঁহার প্রভাবে প্রভা দেয় প্রভাকর॥"—ইতিশীর্ষক দ্ব্যর্থঘটিত কবিতা, কবির প্রতিভার উপযোগী

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

সন্দেহ নাই। এই 'প্রভাকর' ১২৩৯ সালে, যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের লোকান্তর গমনের সহিত উঠিয়া যায়। তারপর ১২৪৩ সালের ২৭ শে শ্রাবণ হইতে আবার প্রভাকরের প্রকাশ আরম্ভ হয়। এখন হইতে সপ্তাহে তিনবার এই পত্র বাহির হইতে লাগিল। ১২৪৬ সালে ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকর দৈনিক হইল। শেষ আবার ১২৬০ সাল হইতে প্রভাকর মাসিকে পরিণত হইল। দেশের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক তখন প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে দ্বিতীয়পত্র প্রকাশ আরম্ভ হয়। এই পত্রের সহিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের (গুড়গুড়ে ভট্চায্যির) 'রসরাজের' তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হইত। কিন্তু সে যুদ্ধের পূতিগন্ধময় গালাগালি ও অশ্লীল বর্ণনা সময় সময় অসহ্যকর হইয়া উঠিত। বিশেষ 'রসরাজ' এ বিষয়ে টেক্কা দিয়া যাইত। এখন যেমন কোন কোন বিশহাজারী পঁচিশহাজারী কাগজে মধ্যে মধ্যে খেঁউড় চলে ও পরকুৎসা প্রকাশ পায়, গুপ্তে ও গুড়গুড়েয় সেইরূপ—কখন বা তাহার অধিকও চলিত। মেছোহাটা ও তাড়ি-খানার রুচি সকল সময়েই সমান দেখিতে পাওয়া যায়।

'পাষণ্ডপীড়ন' উঠিয়া গেলে, ১২৫৪ সালে গুপ্তকবি "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি পত্রও প্রকাশ করেন। সুপ্রসিদ্ধ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণনগরের দ্বারকানাথ অধিকারী, এবং স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গুপ্তকবির শিষ্য। এক হিসাবে প্রভাকরেই ইহাঁদের প্রথম শিক্ষানবিশী হয়।

গদ্যে পদ্যে রাশি রাশি বিষয় ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য, চরিত্রচিত্র কোন বিষয় তাঁহার বাদ যাইত না। 'প্রবোধ প্রভাকর,' 'হিতপ্রভাকর,' 'বোধেন্দু বিকাশ' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও তাঁহার ছিল। 'কলিনাটক' নামে একখানি নাটকও কবি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী কৃতিত্ব এবং সাহিত্যের পুষ্টিকর খাদ্য—প্রাচীন কবিদের পদাবলী উদ্ধার ও তাঁহাদের জীবনবৃত্ত সঙ্কলন। এ বিষয়ে তিনি বিস্তর পরিশ্রম, সময়ক্ষেপ ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়া অনেক তথ্য তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। প্রকৃত কবিজনোচিত

সহৃদয়তাগুণে, প্রাণের অনুরাগে তিনি এ কাজটি করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই পুণ্যফলে আজ আমরা ঘরে বসিয়া, বিনা আয়াসে সেই সব রত্ন উপভোগ করিতে পারিতেছি। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়, কবির গ্রন্থাবলীতে লিখিয়াছেন ;—

"প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশ বর্ষকাল নানাস্থান পর্য্যটন এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন, (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মী-কান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্র সেকালের একজন সম্ভ্রান্ত মজ্‌লিসী লোক ছিলেন। মনও তাঁর দরাজ ছিল। তাঁহার খাইবার ও খাওয়াইবার পদ্ধতিও বড় চমৎকার ছিল। ঈশ্বরকৃপায় কবির অবস্থা সচ্ছল হইলে, তাঁহার বাসাতে একরূপ অন্নসত্র হইয়াছিল। পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় কুটুম্ব হইতে যে কোন লোক, দুটি খাইতে আসিলে, ফিরিত না,—সমাদরের সহিত আহার করিয়া যাইত ;—একরূপ অবারিত দ্বার। প্রাতে উনুন জ্বলিত, সে চুল্লী নির্ব্বাণ হইতে এক এক দিন অপরাহ্ণ হইয়া পড়িত। এ উদারতা, এ অন্নদান, ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরীয় সদ্‌বৃত্তির একটি পুণ্যলক্ষণ। আজকালের সম্ভ্রান্ত ও তথাকথিত 'শিক্ষিত সমাজ' মনে মনেই আত্মাভিমানে ফুলিয়া উঠেন ;— এরূপ অন্নদান ও অতিথিসেবা তাঁহারা ধারণাতেই আনিতে পারেন না ;—অথচ তাঁহারাই 'বড়লোক !'

ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিপ্রতিভা' সম্বন্ধে, বঙ্গের সর্ব্বজনমান্য, নব্যবঙ্গের গুরু, ভারত প্রসিদ্ধ স্বয়ং বঙ্কিমবাবু যাহা বলিয়াছিলেন, আমরাও এখানে সর্ব্বান্তঃ-করণে সেই উক্তির সমর্থন করিতেছি ;—

"ঈশ্বরগুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? * * * যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বরগুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা-সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিঠাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত তাহা * * নিজে উপভোগ করেন, অন্যকে উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটী কসিয়া দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান।

'মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে ভাঙ্গা মন আর গড়েনাকো।'

তোমরা সুন্দরিগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটী কাব্যরস বাহির করেন ;—

বধূর মধুর খনি, মুখ শতদল। সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছলছল॥"

কবির সর্ব্বজন-সমাদৃত শ্লেষব্যঙ্গময় কবিতায় হাস্যরসের কিরূপ জমাট ছিল, নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন।

"হিংসার উক্তি।"

(গৌরবিনী ছন্দ)

হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে—আজো এরা মরেনি।

কত সাজে সাজ্ ক'রে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনো এদের ঘরে—যম এসে ধরেনি ॥
এই সব জামা জোড়া, এই সব গাড়ী ঘোড়া,
এ সব টাকার তোড়া—চোরে কেন হরেনি ?
আরে, ওরা ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে বড় মান,
গোলাভরা আছে ধান লক্ষ্মী আজো সরেনি ॥
মর্ এটা যেন হাতি, দশ হাত বুকের ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি—জ্বরে কেন জ্বরেনি ?
হ্যাদে মাগী কালামুখী, ঠিক্ যেন কচি-খুকী,
পতিসুখে বড় সুখী—ঠেঁটী কেন পরেনি ?
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ী, প'রেছে সোণার চুড়ী,
বেঁকে চলে মেরে তুড়ি—ফুল তবু ঝরেনি !
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলি-পিঠে,
এখনো এদের ভিটে—ঘুঘু কেন চরেনি ॥"

উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলে সমাজের একটি জ্বলন্ত ও সজীব-চিত্র চোখের সাম্‌নে উদয় হয় না কি ? এরূপ জ্বলজ্বলে কাহিনী, ভাষার এমন জমাট্ গাঁথুনি, আজকালের কোন্ কবি, চেষ্টা করিয়াও দেখাইতে পারেন ? এমন চাবুক, সত্যের এমন কঠোর কষাঘাত, যে কবির ইচ্ছামাত্রে লেখনীমুখে আবির্ভাব হইত, তাঁহার শক্তি ও সৌভাগ্য অস্বীকার করা, শুধু ধৃষ্টতা নয়, বাতুলতাও বটে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, যে কারণেই হউক, গুপ্তকবির এ তেজস্বিনী প্রতিভা, ক্রমেই যেন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে ; তাঁহার এই স্বাভাবিক কবিতার উৎসমুখে যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর চাপা পড়িয়া যাইতেছে ;—কে জানে, কবির কোন্ অজ্ঞাত ভক্ত, সাধনাবলে, উত্তরসাধক গুরুর এই ভাবের উৎস আবার উন্মুক্ত করিতে পারিবেন কি না !

তাহাই ত মনে হয়। কেননা, তরঙ্গের পর তরঙ্গ ; এক ঢেউ যাইতেছে, আবার আর এক ঢেউ আসিতেছে। যে যায় সে আর ফিরে না বটে, কিন্তু তার সাধনার ফুল আবার ফিরে। কালের তরঙ্গে উর্ম্মিমালার সহিত নাচিতে

নাচিতে ফিরে। ফুলের বর্ণ একটু বিবর্ণ হয় বটে; কিন্তু দেখিলেই চেনা যায়। খাঁটী সোণা বহুকাল পাঁকে পোতা থাক্, মাজিতে ঘসিতেই তার জলুষ বাহির হয়—সোণার সোণাত্ব কোথা যাইবে? সোণা সোণাই থাকে, রাং হয় না।

উদ্ধৃত ঐ একটি মাত্র কবিতাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় ও মন বিলক্ষণ বুঝা যায়। ভাতের হাঁড়ীর ভাত একটি টিপিলেই বুঝা যায়,—সিদ্ধ হইয়াছে কি না। উত্তরে কূট তার্কিক বলিতে পারেন,—হাঁড়ী যদি 'একাশী' হইয়া পড়ে, ভাত যদি পাশ-চেলো হয়,—তবে সিদ্ধ হইয়াছে কি না জানা যাইবে কিরূপে? তদুত্তরে বলি, এই শ্রেণীর অতি-বুদ্ধিমান্ তাঁদের বুদ্ধির মাপ-কাঠী লইয়া গুপ্তকবির কবি-প্রতিভার মাপ মাপিতে থাকুন, আর আমরা সেই অবসরে সেই পুণ্যাত্মা কবির পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া ধন্য হই। ফলতঃ—

"কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র শক্তি স্তত্র সুদুর্ল্লভা"

ইতিশীর্ষক এই মহাজন-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভাগ্যবান্ কবি একাধারে এই বিধিদত্ত ধন—'কবিত্ব' ও 'শক্তি'—দুই লইয়া সংসারে আসিয়াছিলেন;—তুমি-আমি তাঁর যশোপ্রভা মলিন করিতে গিয়া, ব্যর্থচেষ্ট হইয়া উপহাসাস্পদ হইব মাত্র।

মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে, একরূপ অকালে, এই মহাকবি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

তারাশঙ্করের কাদম্বরী প্রভৃতি।

রাশঙ্করের কাদম্বরীর ভাষা আলোচনার পূর্ব্বে, আর তিনটি কবির একটু পরিচয় দিব। "রামরসায়ন" প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী মহাশয় ইহাঁদের একজন। সন ১১৯৩ সালে বর্দ্ধমান জেলার মাড়ো গ্রামে রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কিশোরীমোহন। ইহার অনেক স্থান কবিত্বপূর্ণ। গোস্বামী মহাশয়ের "রামায়ণ" গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই 'রামরসায়ন' ব্যতীত ইঁহার আরো কয়েকখানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। 'রাম-রসায়নের' একটু নমুনা দেখুন ;—

"আছে লজ্জা, আছে ভয়, আছে প্রীতি চিতে।
যাইতে না পারে দেবী, না পারে থাকিতে॥
যেন দেখি দিব্য মণি তরঙ্গিণী-পারে।
যাতে ইচ্ছা হয় কিন্তু শঙ্কায় না পারে॥"

গোস্বামী মহাশয়ের উপমা প্রয়োগও প্রশংসনীয় ;—

"নব জলধরগণে ঢাকিয়া অম্বর। তমোগুণে যেন পাপী জনার অন্তর॥
তড়িত প্রকাশ পায় কভু জলধরে। শ্মশান-বৈরাগ্য যেন বিষয়ি-অন্তরে॥
বনের অনল জলে করিল নির্ব্বাণ। ভবতাপ নাশে যেন ভক্তি-তত্ত্বজ্ঞান॥
কূটজ কেতকী যাতী হইল প্রকাশ। ভাবাবেশে যেন ভক্ত-বদনেতে হাস॥"

ঃর,—কৃষ্ণকোমল গোস্বামী। এই কবি এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তিনি একাধারে কবি ও কথক—দুই-ই। তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত কথকতায়, সঙ্গীতে ও ব্যাখ্যায়, এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ভক্তির তরঙ্গ বহিয়াছিল। এখনও তদঞ্চলে 'বড় গোঁসাই' নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি। একবার ইনি নিমাইসন্ন্যাসের পালা রচনা করিয়া স্বয়ং নিমাই সাজিয়া তাহার অভিনয় করেন। সে অভিনয় দর্শনে ভক্ত ও ভাবুকের চোখ দিয়া অশ্রান্ত অশ্রুপ্রবাহ বহিয়াছিল। ইহাঁর 'স্বপ্নবিলাস', 'বিচিত্র বিলাস', 'দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ এখনও বঙ্গসাহিত্যে আদৃত।

নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকট ভাজনঘাট গ্রামে কৃষ্ণকমলের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম মুরলীধর গোস্বামী। সন ১২১৭ সালে আষাঢ় মাসে, রথযাত্রার পুণ্যদিনে কৃষ্ণকমল জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১২৯৪ সালের ১২ই মাঘ চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। অহর্নিশ নামগুণগানে তিনি বিভোর থাকিতেন। ভক্তবংশে তাঁহার জন্ম; তাঁহার পিতৃদেবও একজন সংসার-বৈরাগী সাধক ছিলেন। সাত বৎসর বয়সে কৃষ্ণকমল তাঁহার পিতার সহিত ৺ বৃন্দাবনধামে গমন করেন; সেই খানেই তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ; শেষ নবদ্বীপের কোন টোলে তাহার সমাপ্তি।

বৃন্দাবনধামের শেঠপরিবারের এক অপুত্রক ধনী শেঠ, কৃষ্ণকমলকে দত্তক-পুত্র লইতে ইচ্ছা করায়, অর্থে বীতস্পৃহ কৃষ্ণকমলের ধর্ম্মভীরু পিতৃদেব, পুত্রকে লইয়া সরিয়া পড়িলেন,—একেবারে দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁর দিন চলা ভার, সংসারে অসচ্ছলতা সকল রকমে। কৃষ্ণকমল অর্থার্জ্জনে বাহির হইলেন। বরাবর ঢাকায় গেলেন। দুঃখে রোগে অনেক ঝড়ঝাপ্‌টা খাইবার পর ঐ ঢাকা সহরেই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী দেখা দিলেন; ভক্ত-পরিবারের অন্নকষ্ট ঘুচিল।

ইহাঁর একটি গানের প্রথম চরণটি এইরূপ ;—

"সখি! ধর ঝট, পীতপট, নিপট কপট শঠ,—লম্পট শিরোমণি যায়।
আসিয়ে নিকট, কোথা ঘুচাইবে শঙ্কট, বিকট বিরহ যে ঘটায়

বায়ুভরে আকাশে মেঘের দ্রুতগমন দেখিয়া কৃষ্ণোন্মাদিনী শ্রীরাধা এইরূপ বলিতেছেন। উক্তিটি বড় সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু পরের চরণ-

গুলি ইহা অপেক্ষাও অনুপ্রাসযুক্ত, সুতরাং কিছু একঘেয়ে রকমের। যাই হোক, এক শ্রেণীর লোক এখনও এই কবির অনুরাগী আছেন।

রাধামোহন সেন। কলিকাতা কাঁসারিপাড়ায় ইহাঁর জন্মস্থান; ইহাঁরা কায়স্থ। 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামে ইহাঁর একখানি পদ্যময় গ্রন্থ আছে; তাহাতে সঙ্গীত-বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বই নিহিত। ইনি নিজেও কবি ও সুগায়ক ছিলেন। ইহাঁর অনেক গান এক সময়ে কলিকাতার মজ্‌লিসে গীত হইত। সে গানের একটু নমুনা দেই;—

"হৃদয়-কাননে শ্যাম, ভ্রমে কেমনে সই! সুধায়ো মাধবে সখি, অতি গোপনে।
তাতে মন শিলাময়, বিরহ কণ্টকচয়, লাগে নাই কি সজনি, শ্যাম-চরণে॥
যে ছিল নয়ন বাসে, সে গেল বন-নিবাসে, আসিবে হৃদয় ত্যজি, কবে নয়নে॥"

ইহাঁর এই সকল সঙ্গীতের অনেকগুলি,—কলিকাতা সিমুলিয়ানিবাসী স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু গানের কথায় আমরা আর অধিক সময় ব্যয় করিতে পারিব না, এখন গদ্যসাহিত্যের যুগ,—গদ্যসাহিত্যের কথাই বলিব।

মিশনরী বাঙ্গালা ও মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালায় ভাঁটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই, তারাশঙ্করের কাল আসিল। সুপ্রসিদ্ধ "কাদম্বরীর" অনুবাদ এবং "রাসেলাসের" অনুবাদই ইহাঁর প্রধান গ্রন্থ। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কাঁচকুলী গ্রামে পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন জন্মগ্রহণ করেন।

তারাশঙ্করের এই কাদম্বরীর ভাষা এক সময়ে বিশেষ সমাদর লাভ করে,—বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ টুলো-পণ্ডিতগণ কাদম্বরীর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সমাস ও সন্ধি, উপমা ও অলঙ্কার-শিক্ষার্থীরা এক সময়ে এই কাদম্বরী হইতে বড় বড় এবং লম্বা লম্বা পদ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। 'কাদম্বরী যে ভাল পড়িতে পারিবে এবং উত্তমরূপ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবে, তারই ভাষাজ্ঞান হইয়াছে',—এক সময়ে অনেকেরই এইরূপ ধারণা ছিল। শৈশবের সেই অতীতস্মৃতি মনে জাগিলে এখন কত কথাই মনে উদিত হয়।

কিন্তু প্রকৃতির অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে কিছু দিন পরেই, ঠিক ইহার একটি বিপরীত স্রোত আসিল। দুই স্রোতে ধাকা লাগিল। বিষম সংঘর্ষণ,

প্রবল ধাক্কা। যাঁহারা 'কাদম্বরীর' ভাষা বাঙ্গালীর একমাত্র সম্বল ভাবিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতে ছিলেন, সহসা তাঁহাদের সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—কতকটা বিস্মিতের ন্যায় তাঁহারা দেখিলেন, বন্যার ন্যায় একটা প্রবল স্রোত বঙ্গসাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং জনসাধারণ দলে দলে সেই স্রোতোমুখে ধাবিত হইতেছে। পণ্ডিতগণও কিছুদিন উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিরূপে সে স্রোত রোধ করিবেন,—সে পক্ষে বিশেষ চেষ্টাও দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।—দেখিতে দেখিতে সেই স্রোত যেন জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল। গদ্য-বঙ্গসাহিত্যের এই স্রোত—'আলালী ভাষা।'

কালে এই 'আলালী ভাষার' অভিনব সংস্করণ হইয়াছিল,—'হুতোম'। দিন কতক এই হুতোম ও আলালী ভাষা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী সমাজ-গুলিকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল। সমাজের স্থূল চিত্রগুলি এবং গ্রাম্যভাবগুলি অঙ্কিত করিয়া দেখানই এই দুই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। চলিত কথাবার্ত্তার ভাষাতেই এই দুই গ্রন্থ রচিত। ভঙ্গি মনোজ্ঞ না হইলেও এক শ্রেণীর লোকের মুখরোচক বটে। প্রথমের রচয়িতা—টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারিচাঁদ মিত্র, দ্বিতীয়ের রচয়িতা—স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ।

কিন্তু এই চলিত বাঙ্গালা,—সাহিত্যে আধিপত্য স্থাপন করিবার পূর্ব্বে এবং কাদম্বরীর একরূপ মৌরাশি স্বত্ব বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ এ দুয়ের মাঝামাঝি সময়ে, নবীন গদ্য-সাহিত্যের যে জ্বলন্ত জ্যোতিঃ বঙ্গ-সাহিত্যাকাশে পরিদৃষ্ট হইল, ভিক্টোরিয়া-যুগে, সেই জ্যোতিই গদ্যসাহিত্যের আদর্শ নির্ণয় করিয়া দিল। অর্থাৎ খুব চলিতও নয়, আবার খুব সংস্কৃত-বহুলও নয়, এ দুয়ের মাঝামাঝি রসাল রচনা দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের পরিপুষ্টি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ জ্যোতির অধিকারী বঙ্গের দুইটি শক্তিশালী মহাত্মা। প্রথম, স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; দ্বিতীয়, অক্ষয়কুমার দত্ত। এক হিসাবে, ইহাঁরাই ভিক্টোরিয়া-যুগের গদ্যসাহিত্যের আদি নেতা।

কিন্তু এই দুই মহাত্মার কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, উপরোক্ত সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

তারাশঙ্করের কাদম্বরী বা রাসেলাসের ভাষা যে সর্ব্বত্রই সংস্কৃতবহুল বা

শব্দাড়ম্বরপূর্ণ, তাহা নহে। কোন কোন স্থল দিব্য প্রাঞ্জল ও শ্রুতি-সুখকর। কিন্তু শ্রুতিসুখকর হইলেও, তাহা 'কাণের ভিতর দিয়া' মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে না। তাহাতে যেন তেমন আঁট নাই। নমুনা দেখুন ;—

"অনন্তর নিঃশব্দ নিশীথ প্রভাবে দূর হইতে'হা হতোস্মি—হা দগ্ধোঽস্মি—হায় কি হইল–রে দুরাত্মন পাপকারিন্ পিশাচ মদন! কি কুকর্ম্ম করিলি—আঃ পাপীয়সি দুর্ব্বিনীতে মহাশ্বেতে! ইনি তোমার কি অপকার করিয়া ছিলেন—রে দুশ্চরিত্র চন্দ্রচণ্ডাল! এক্ষণে তুই কৃতকার্য্য হইলি—রে দক্ষিণানিল! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল—হা পুত্রবৎসল ভগবন্ শ্বেতকেতো! তোমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছ না? হে ধর্ম্ম! তোমাকে আর অতঃপর কে আশ্রয় করিবে? হে তপঃ! এত দিনের পর তুমি নিরাশ্রয় হইলে। সরস্বতি! তুমি বিধবা হইলে। সত্য! তুমি অনাথ হইলে। হায়! এত দিনের পর সুরলোক শূন্য হইল। সখে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি। চিরকাল একত্র ছিলাম, এক্ষণে সহায়-হীন, বান্ধববিহীন হইয়া কিরূপে এই দেহভার বহন করি। কি আশ্চর্য্য! আজন্ম পরিচিত ব্যক্তিকেও অপরিচিতের ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায়, পরিত্যাগ করিয়া গেলে?"—কাদম্বরী।

রাসেলাসের ভাষাও ইহা হইতে কোন অংশে হীন নহে, বরং এ অনুবাদে কিছু মিষ্টতা আছে,—পড়িতে পড়িতে রসের উদ্রেক হয় এবং মনে একটা ভাব জাগে। নমুনা দেখুন ;—

"বৃদ্ধ এইরূপ আহ্বানে উৎসাহিত হইয়া রাজকুমারের মনোগত ভাবের পরিবর্ত্তের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, "কুমার! তুমি কি নিমিত্ত প্রাসাদের সুখ সম্ভোগ ও আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থিতি কর ও লোকের সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া মৌনভাবে থাক?"

"রাসেলাস কহিলেন, "আমি আমোদ পরিত্যাগ করি, কারণ আমোদে আর আমোদ পাই না। আমি সর্ব্বদা দুঃখিত থাকি এবং আত্মদুঃখে অন্যের সুখ-শশধর মলিন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া নির্জ্জনে যাই ও একাকী অবস্থিতি করি।" বৃদ্ধ কহিলেন, "রাজকুমার! সুখের প্রাসাদে দুঃখের কথা তুমিই

এই প্রথম উল্লেখ করিলে। তুমি যে দুঃখের কথা কহিতেছ তাহা অমূলক। আবিসিনিয়ার সম্রাট্ যত সুখ-সামগ্রী প্রদান করিতে পারেন, সমুদায় এখানে আছে। এখানে পরিশ্রম ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিতে হয় না, অথচ তাহার ফল পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখ, এখানে কিছুরই অভাব নাই, যাহা চাও সমুদায় আছে। যদি প্রার্থনীয় বস্তুই না থাকিল তবে কিসের দুঃখ?"—রাসেলাস।

এই বাঙ্গালার পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগ। মধ্যে যাঁহারা অল্প স্বল্প পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের কথা বলিতে গেলে গ্রন্থের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। তাহাতে পাঠকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি, আমাদেরও হাড়ভাঙ্গা খাটুনি;—সুতরাং তারাশঙ্করের গদ্যের ভাষা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার

—*•*-

ভিক্টোরিয়া-যুগে, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের প্রধান সংস্কারক, আদি-গুরু ও আচার্য্যরূপে এই দুই মহাত্মা পূজা পাইবার যোগ্য। এতদিন বাঙ্গালা গদ্যের ভাষা যেরূপ ছিল, তাহা এক এক করিয়া সংক্ষেপে আমরা দেখাইয়াছি। সেই সব ভাষার নমুনা ও ভাবের অস্পষ্টতা দেখিয়া বুদ্ধিমান্ পাঠক বুঝিয়াছেন যে, তাহার ধার তেমন ছিল না,—সে সব লেখা যেন ভোঁতা। এক তারাশঙ্কর বাদে আর প্রায় সকলের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। তেজ, বেগ, উচ্ছ্বাস বা আবেগ যে ভাষাতে নাই, সে ভাষায়, চুম্বুকের আকর্ষণী শক্তির ন্যায়, অন্যের মন আকর্ষিত হইবে কিরূপে? সেই জন্য এতদিন বাঙ্গালা গদ্যের ভাষা থাকিয়াও যেন ছিল না। যা ছিল তাহাতে বিশেষ কাজ হইত না;—যেন চিড়ার ফলার—কোনরূপ আঁট নাই—ভ্যাং ভ্যাং করিতেছে। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বেশ বলিতেন;—"বাজারে কৃষাণেরা গরু কিনিতে যায়; তাহারা গরুর ল্যাজে হাত দিয়া গরু পরখ করে। যে গরু, ল্যাজে হাত দিবা মাত্র শুইয়া পড়ে, সে গরু তারা নেয় না; কিন্তু যে গরু ঐরূপ ল্যাজে হাত দিলেই তিড়িং-মিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠে, সেই গরুই তারা পছন্দ করে,—কেনে।" ভাষারও এইরূপ একটা তেজাল জীয়ন্ত ভাব থাকা দরকার, অল্প পড়িলেই মনে হইবে

যে, হাঁ, এতে প্রাণ আছে,—মরা ভাষা এ নয়। মিশনরী বাঙ্গালা, তথা মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালা—ঐ মরা ভাষা, তাহাতে তেজ, বেগ, উল্লাস, উচ্ছ্বাস কিছুই নাই,—প্রাণই নাই। সজীবতার যে লক্ষণ—হাসি, কান্না, আবেগ, উচ্ছ্বাস, চাঞ্চল্য, গতি, ভাব,—এ সব ওতে খুঁজিতে খুঁজিতে যদি এক আধটা মিলে। কিন্তু সাহিত্য পড়িতে বসিয়া, ভাষা শিক্ষা করিতে আসিয়া, কে অমন অবিচলিত ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত তাহা হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া এক আধটি ভাব আদি সংগ্রহ করিবে? ক্ষুধার্ত্ত বঙ্গবাসী প্রাণের এ ক্ষুধা বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিল; কিন্তু মানুষ মানুষের আত্মার ক্ষুধা কিরূপে মিটাইবে? তাই যিনি অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বভূতের আধার,—সেই প্রাণের প্রাণ জীবনবল্লভ,—জীবের সর্ব্ব অভাবের পূরণকর্ত্তা—দয়াময় শ্রীহরি—তাঁহার দুই বিশেষ চিহ্নিত সন্তান দ্বারা—লক্ষ লক্ষ সন্তানের ক্ষুধার অন্ন সংস্থান করিয়া দিলেন। সেই দুই ভাগ্যবান্ সন্তান—বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার।

বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার হয়ত আমাদের এই এমন ভাবের কথা মানিতেন না; তাঁহাদের শিষ্য শাখা বা ভক্তবৃন্দও হয়ত মানেন না;—তাহাতে ক্ষতি কি? সকলেরই সব কথা মানিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। মানিলেই যে মুস্কিল,—সব সাম্য, সব একাকার। সৃষ্টি-বৈষম্য না থাকিলে, মত-পার্থক্য না ঘটিলে, ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড চলিবে কি প্রকারে? এটুকু সেই জগৎ-কর্ত্তারই খেলা।—তাঁহার মায়ার সংসার ত মানাইয়া চালানো চাই? সকলেই যদি এক পথের পথিক হইল, এক পন্থাবলম্বী হইল, তাহা হইলে সৃষ্টি থাকে কিরূপে? তাই কেউ আস্তিক হইল, কেউ নাস্তিক হইল; কেউ দৈববাদী হইয়া নীরব রহিল; কেউ পুরুষকারের প্রাধান্য দিয়া—পুরুষকারের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সিংহবলে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল; ধূলামুঠা ধরিল সোনামুঠা হইল; যা ভাবিল, তাই করিল; কালে হয়ত মনে অহমিকা আসিল,—'শক্তি ও সৌভাগ্য ত আমারই হাতে,—ঈশ্বর আবার কে? থাকে থাকুন, পরকালে তাঁহার সহিত বুঝা-পড়া যাইবে; ইহকাল আমার করতলগত; এখানে কাজ করিতে আসিয়াছি, কাজ করিয়া যাই।'—বাস্! এইরূপ এবং আরো কতরূপ চিন্তা ও ভাব লইয়া এক দল কাজে লাগিল,—আর মাতৃরূপিণী মহাশক্তি—মায়ার রূপ লইয়া, অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন,—মায়ার কাজ কলে

চলিতে লাগিল। এইরূপই হয়; সৃষ্টির সকল কাজেই হয়; তুমি আমি মানিলেও হয়,—না মানিলেও হয়। সাহিত্যসেবাও সেই মায়িক সৃষ্টির একটি অঙ্গ।

এই অঙ্গের অঙ্গরাগ করিতে, এক থাকের লোক সেই মহামায়ারই নির্দেশানুসারে নানা ভাবের নানা রং ও সাজ-সরঞ্জমাদি লইয়া সাহিত্যের আসরে আগুয়ান হয়। কেহ বা অল্পেই আসর বেশ জমাইয়া বসে, আর কেহ বা ভাগ্যের ফলে—মার কৃপার অভাবে—মাথামুড় খুঁড়িয়াও কিছু করিতে পারে না,—হাততালি ও দূয়ো খাইয়া বিষণ্ণমনে কালযাপন করে, অথবা বিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট হয়।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার এই মাতৃরূপিণী মহাশক্তির হাতের দুটি যন্ত্র-পুত্তলী মাত্র; অলক্ষ্যে মা তাঁহাদের মানসঘটে থাকিয়া যে ভাবে নাচাইয়াছেন, ভাষাকে উপলক্ষ করিয়া, তাঁহারাও সেইভাবে নাচিয়াছেন মাত্র। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের যাহা আকাঙ্ক্ষিত ও অভাবের পরিপোষক, তাহা এই দুই মহাত্মার নিকট হইতেই প্রচুর পরিমাণেই আমরা পাইয়াছি। তজ্জন্য অক-পটে ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করি এবং তাঁহাদের ভাষায় তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া,—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি।

কাব্যে প্রাণ, কাব্যের আদর্শে কাব্যের মানুষ খুঁজিতে খুঁজিতে আয়ু শেষ হইয়া আসিল;—তাই প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ভিক্টোরিয়া-যুগের নবীন গদ্য-সাহিত্যের দুটি শক্তিশালী সাহিত্যিকের অতীত স্মৃতির জাগরণে—আদ্যাশক্তি মহামায়ার কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হইল। ব্রহ্মময়ী মা ভিন্ন আর কাহার কথা ভাবিব? ভাবিবারই বা আছে কে? প্রকৃতই মা ভিন্ন, মায়ের অদৃশ্যশক্তির সহায়তা ভিন্ন, মৃতকল্প বঙ্গভাষায় কে এমন শক্তি-সঞ্চার করিতে পারে? তাই মা তাঁর দুই বিশিষ্ট সন্তান দ্বারা এ কাজ করাই-লেন—মূলে সেই মূলাশক্তির অস্তিত্বই বিদ্যমান রহিল।

এই ভাবেই আমরা মধ্যে মধ্যে এ সাহিত্য-চিত্র দেখিতে ও আঁকিতে চেষ্টা পাইতেছি; নইলে এ নীরস, শুষ্ক ও জটিল বিষয়ে মন বসিবে কেন? পাঠকেরও ইহা পড়িতে ধৈর্য্য থাকিবে কেন? এক-ঘেয়ে লেখা কি কাহারও ভাল লাগে? আমাদের ত লাগেই না;—তাই এই এক-

প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে নানা রসের ভিয়ান করিতে হইতেছে। শুধু প্রত্নতত্ত্ব ও বিচার-বিতণ্ডা দেখিতে যাঁহারা অভিলাষী, সবিনয়ে ও অকপটভাবে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আমাদের এ আলোচ্য-গ্রন্থে সে তত্ত্ব তাঁহারা পাইবেন না। আমরা এ কাঠমায় রসভোগ করিতে আসিয়াছি, রসভোগ করিয়াই যাইব। নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বাগানে আম খাইতে আসিয়াছি, আম খাইয়াই যাই ; গাছে কত ডাল, কত পাতা, তাহা গণিয়া আম খাইতে গেলে সময় চলিয়া যায়,—আম খাওয়া আর হয় না।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম ;—ভিক্টোরিয়া-যুগে, গদ্য-সাহিত্যের আদিস্তরে মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রভাবই অধিক দেখিতে পাই ; তারপরে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। কিন্তু উক্ত দুই মহাত্মাকে গুরুপদে বরণ করিয়া, উদ্দেশে তাঁহাদের চরণে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি না দিলে, গুরু অমান্যের মহাপাতক স্পর্শিবে—তা হউন তিনি যত বড় মহারথ বা শক্তিশালী লেখক।

প্রকৃতই ভিক্টোরিয়া-যুগটাই উন্নতির যুগ ; শুধু বাঙ্গালা দেশ বা বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া নয়, মায়ের অধিকারভুক্ত সকল প্রদেশ, সকল ভূখণ্ডই ইহার সাক্ষিস্বরূপ। ইংলণ্ডের জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা সভ্যতা—সকলই এ পুণ্যবতী রমণীর রাজত্বকালে। ঊনবিংশ শতাব্দীটাই সর্ব্ববিধ উন্নতির আকর ; তা ইংলণ্ডেও যেমন, ভারতেও তেমনি। এখন বরং সে উন্নতি-স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। বস্তুতঃ আমরাও তাই অনেক ভাবিয়া, মঙ্গলাচরণস্বরূপ গ্রন্থের প্রারম্ভেই,—মা, মাতৃভাষা, ও জননী-ভিক্টোরিয়া এক বলিয়া বর্ণন করিয়াছি। এ তিনকে ভক্তির সহিত, নিষ্ঠার সহিত, অবশ্যকর্ত্তব্য বোধের সহিত সমান-দৃষ্টিতে না দেখিলে যে, কলমই চলে না ;—তা মাথামুণ্ড সমালোচনা করিব কি ?

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার হইতেই মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল হইল। মা হাসিলেন, মাতৃরূপিণী ভাষা হাঁফ ছাড়িলেন, করুণাময়ী জননী ভিক্টোরিয়াও সেই মূলাশক্তির প্রেরণায়,—বিদ্রোহ-বিপ্লব-অবসানে সেই অভয়বাণী ঘোষণা করিলেন—যাঁহার অমৃতময়ী কথা আমরা গ্রন্থারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনা করিয়াছি।

ফলতঃ, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার হইতেই যেন বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের একটা অস্তিত্ব হইল ; বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য যেন স্বতন্ত্র একটা সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হইল। এখন হইতে আর পাদ্রী সাহেবদের বাঙ্গালা এবং "তোতা-পাখীর ইতিহাস" শ্রেণীর বাঙ্গালা গ্রন্থের অধিক প্রচার হইল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া, প্রচলিত বঙ্গভাষাকে সরল, সরস এবং হৃদয়গ্রাহিণী করিতে চেষ্টা পাইলেন। অক্ষয়কুমার, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবর্ত্তিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া নবোদ্যমে, প্রগাঢ় পরিশ্রমে, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে বিবিধ ভাব ও চিন্তা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে একরূপ জীবন সমর্পণ করিলেন। তাহার ফলেই তাঁহার বহুগবেষণাপূর্ণ "ভারতবর্ষীয়-উপাসক সম্প্রদায়", "বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার", "চারুপাঠ", "ধর্ম্মনীতি" প্রভৃতি তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থসকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাঁহার লেখা, লোকে তত মন দিয়া পড়িল না।—বুঝিবার অক্ষমতা নিবন্ধনও বটে, আর ভাল না লাগিবার জন্যও বটে। কিন্তু যাই তাহার স্বাদ লোকে বুঝিল, যাই তাহার ভিতর লোকে একটু একটু প্রবেশ করিতে লাগিল, অমনি ধীরে ধীরে তাহাতে আকৃষ্ট হইল। অক্ষয়কুমারের চিন্তা ও ভাবুকতা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও ঈশ্বরনির্ভরতা—উত্তরজীবনে যাহাই হোক,—সাধারণতঃ বড়ই গভীর। তাই আপামর-সাধারণ শীঘ্রই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে নাই এবং আজিও বোধ হয় সম্যকরূপে পারে নাই। তবে সত্যের অনুরোধে এ কথাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অক্ষয়কুমারের ভাষা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার ন্যায় সরল প্রাঞ্জল মধুর ও মনোজ্ঞ নহে ;—পরন্তু সে ভাষা তেজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী। অক্ষয়কুমার ভাবে ও চিন্তায় মগ্ন ; ভাষার প্রাঞ্জলতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না ;—অথবা বিধাতা সে শক্তি তাঁহাকে অধিক দেন নাই। পরন্তু শব্দসম্পদে অক্ষয়কুমার বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ছিলেন এবং সেই শব্দ, প্রায় কোথাও নিরর্থক ব্যবহৃত হয় নাই। বিশেষ তাঁহার লেখার আর একটি বিশেষত্ব এই যে,—যে কোন লেখা হোক, তাহাতে তাঁহার স্বভাবসুলভ ধর্ম্ম, নীতি, পবিত্রতা এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বর-নির্ভরতার মহান্ ভাব পরিস্ফুট। তাঁহার লেখা একটু নিবিষ্ট মনে পড়িলেই মনে হয় যে,—তিনি সাহিত্যের জন্য

সাহিত্যের সেবা করিতেন; সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান করিতেন;—কোনপ্রকার সামাজিক, বৈষয়িক বা আর্থিক লাভ-লোকসানের খতিয়ান তিনি রাখিতেন না।—বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান বহু উচ্চে।

অক্ষয়কুমারের যে শক্তিটির একটু অভাব ছিল, ঈশ্বরেচ্ছায়, সেই শক্তির অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া, যে ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহ এই বার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহা হইতেই বঙ্গসাহিত্যের গঠন ও সংস্কার হইল। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, আমি এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। ভিক্টোরিয়া-যুগে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে,—বাঙ্গালীর গদ্যসাহিত্যের যে তিনি প্রধান পথপ্রদর্শক ও একরূপ আদি-গুরু,—তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

অক্ষয়কুমার যখন "তত্ত্ববোধিনীর" সম্পাদক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সময় অক্ষয়কুমারের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। সেই আলাপের ফলে, "তত্ত্ববোধিনী"তে তিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন। আদি-পর্ব্বের কিয়দংশ তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর মহানুভব কালী-প্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া, তিনি ইহাতে প্রতিনিবৃত্ত হন। পরন্তু, সাহিত্যে স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ উক্ত সিংহ মহোদয়ের আরব্ধকার্য্যেও মধ্যে মধ্যে তিনি সাহায্য করিতেন। ভাষার প্রাঞ্জলতায় অথচ বিশুদ্ধিরক্ষণে তিনি এমন সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন যে, স্বয়ং অক্ষয়কুমার দত্তও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আপন লেখা দেখিতে দিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার সরলতা ও মধুরতা,—তাঁহার প্রথম পুস্তকেই পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রথমে তিনি "বাসুদেব-চরিত" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষগণ, সে গ্রন্থে 'কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে' বিবেচনায়, গ্রন্থখানি পাঠ্যপুস্তকভুক্ত করিলেন না। পরন্তু, সে গ্রন্থের ভাষা ও ভাব এতই মনোহর যে, তাহাতেই স্বর্গীয় মহাত্মার সাহিত্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থেরই এক স্থানের একটু নমুনা এখানে উদ্ধৃত হইল;—

"অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্র

সময়ে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল বাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকর-গীতে ও কোকিলকলকলে আমোদিত হইল এবং শীতল সুগন্ধ মন্দ মন্দ গন্ধ বহিতে লাগিল।"—ইত্যাদি।

দেখুন দেখি, কি সুন্দর বাঙ্গালা! মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকার' বাঙ্গালা, কিংবা পাদ্রী সাহেবদের সেই অস্ফুট 'ফিরিঙ্গী-বাঙ্গালা',—অথবা বঙ্গানুবাদ "কাদম্বরীর" বাঙ্গালা, পক্ষান্তরে "তোতা পাখীর ইতিহাস" গ্রন্থের ন্যায় সেই গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট—সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়ার ছড়াছড়ি,—'এবং' 'ও' 'হইলেক' 'করিলেক' প্রভৃতির বাড়াবাড়িও ইহাতে নাই। বেশ একটি সরল, শুদ্ধ, সহজ, মধুর ভাব,—উদ্ধৃত ঐ কয়েক পংক্তিতেই উপলব্ধি হয়। এই জন্যই লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গালা ভাষার গুরু বলিয়া সম্মান করে। ফলতঃ, সংস্কৃত পণ্ডিত হইয়াও যে সেই সংস্কৃতপ্রধান সময়ে —তিনি এত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙ্গালা রচনা করিতে পারেন, তাহা দেখিয়া সে সময়ের অনেক লোক বিস্মিত হইতেন, আর কেহ কেহ তাঁহাকে ব্যঙ্গও করিতেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বেশ একটি রহস্যজনক দৃষ্টান্ত দ্বারা. বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—"এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে স্থানীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লিখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—'এ কি হ'য়েছে? এ যে বিদ্যেসাগরী বাঙ্গালা হ'য়েছে,—এ যে অনায়াসে বুঝা যায়'!" ফলতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের সেই একাধিপত্য কালে, এরূপ ভাবে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন করা, কম শক্তি ও সাহসের কাজ নয়।—প্রতিভাবান্ বিদ্যাসাগর সকল সময়ে—সকল অবস্থাতেই এক সোপান উচ্চে অবস্থিত। এই অপ্রকাশিত "বাসুদেব-চরিত" গ্রন্থে, ভাবী সাহিত্য-গুরুর যে সাহিত্য-বীজ উপ্ত হয়, কালে তাহাই অঙ্কুরিত ও কাণ্ডযুক্ত হইয়া,—"সীতার বনবাস" ও "শকুন্তলা"-রূপ মহাবৃক্ষে

পরিণত হইয়াছে। সেই বৃক্ষের স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়ায় বসিয়া, কত শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক বিশ্রামলাভ করিয়াছে; কত লক্ষ্যভ্রষ্ট পর্য্যটক সেই ছায়ায় শরীর জুড়াইয়া পথ চিনিয়া চলিয়াছে।—দেখিতে দেখিতে সেই মহাবৃক্ষের চারি-পার্শ্বে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিল;—"বিদ্যাসাগরী" ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্যে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতিভা ও মৌলিকতা অভাবে সে সকল গ্রন্থের অধিকাংশই এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়।

অনুবাদে অনেক সময় মূলের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় বটে; কিন্তু প্রতিভাবান্ ভাষাভিজ্ঞ লেখকের হস্তে পড়িলে সেই অনুবাদ অনেকাংশে মূলেরই ন্যায় সুখপাঠ্য হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণরূপ খাটে। তাঁহার শকুন্তলা ও সীতার বনবাস,—কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' ও ভবভূতির "উত্তররামচরিত" অবলম্বনে লিখিত হইলেও, ইহাতে মূলের অনেক সৌন্দর্য্য আছে। ইহা ব্যতীত মহাকবি সেক্সপিয়রের "Comedy of Errors" হইতে "ভ্রান্তিবিলাস" অনূদিত করিয়া তিনি তাঁহার ভাষাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি"ও একখানি উৎকৃষ্ট গদ্য-গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এক সময় বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠ্য ছিল।

"বিধবা-বিবাহ-বিচার" গ্রন্থে আমাদের মতপার্থক্য থাকিলেও, মুক্তকণ্ঠে বলিব, ইহাতে স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের হৃদয় সম্পূর্ণ পরিব্যক্ত হইয়াছে। এইখানিই তাঁহার সম্পূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ। আর উপক্রমণিকা ব্যাকরণ প্রস্তুত-প্রণালীতে তাঁহার যে কি অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যিনি সংস্কৃতশিক্ষার্থী না হইয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না। আবার সংবাদপত্র-পরিচালনেও বিদ্যাসাগরের অল্পশক্তি প্রকাশ পায় নাই। সুপ্রতিষ্ঠিত "সোমপ্রকাশের" প্রথম দশায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ইহার প্রধান কর্ণধারস্বরূপ ছিলেন। অনবসর বশতঃ, কিছুদিন পরে তিনি ইহার দায়িত্ব-ভার যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "সোমপ্রকাশের" সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনও মধ্যে মধ্যে তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সত্যের অনুরোধে এখানে একটি কথা বলিব;—কি অক্ষয়কুমার আর কি বিদ্যাসাগর—

মৌলিক রচনা ইহাঁদের অতি অল্প ;—অনুদিত গ্রন্থই বেশীর ভাগ। উপস্থিত প্রবন্ধে আমি কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্য-জীবনের আলোচনা করিতে অধিকারী; কিন্তু তাঁহার—সেই মহাত্মার সুদীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের যে বিচিত্র ইতিহাস আছে,—যে অপার্থিব দয়া, যে অতুলনীয় দানশীলতা এবং যে অত্যুচ্চ মহাপ্রাণতায় তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন,—ভিক্টোরিয়া-যুগে, পাশ্চাত্য আদর্শ হিসাবে, সমগ্র বাঙ্গালীর মধ্যে তত বড় লোক আর কেহ আছেন কি না, আমি জানি না। অবশ্য হিন্দুর দৃষ্টিতে, ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের আদর্শ অন্যরূপ। ভগবান্ লাভই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ;—তাঁহারা সংসার হইতে একরূপ নির্লিপ্ত।

এই সময়ে প্যারিচাঁদ মিত্র বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিলেন। তিনিই প্রথম পথ দেখাইলেন, কেবলমাত্র খাঁটী বাঙ্গালা লিখিয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা যাইতে পারে। প্যারিচাঁদ পথ দেখাইলেন মাত্র ; কিন্তু সে পথ সুন্দররূপে প্রস্তুত ও সুগম হইয়াছিল—প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা ;—ইহা বোধ হয় এখন অবিসংবাদী সত্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুমার্জ্জিত ও সরল এবং মধুর ও মনোজ্ঞ হইলেও, তদানীন্তন ইংরেজী নবিশদিগের তাহা মনে ধরিল না।—বিশেষ তাঁহারা বাঙ্গালায় সৌখীন পাঠ্য-গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। টেকচাঁদ ওরফে প্যারিচাঁদ—দেশের হাওয়া বুঝিয়া, চলিত কথায়, সাদা-মাটা ভাষায়, "আলালের ঘরের দুলাল" নামক উপকথা রচনা করিলেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা"ও সঙ্গে সঙ্গে আসর জমাইল ; এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাহা সাময়িক,—দিন কতকের জন্য। দিন কতক এই 'হুতোমের' সহিত আলালী' ভাষার বিলক্ষণ আদরও হইল। এমন কি, লোকে 'সাগরী' ভাষার পরিবর্ত্তে, এই 'আলালী' ভাষাই আগ্রহে পড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সেই 'আলালী' ভাষার উপরও কালের যবনিকা পড়িয়া গেল।

'আলালী' ভাষার নমুনা ;—

"শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই"—টক্ টক্—পটাঁস-পটাস, মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—

টিটকারি দিতেছে ও শালার গোরু চল্‌তে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গোরু দুটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছেকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলে গেল। সেই ছেকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুন্দার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংয়স টংয়স ডংয়স ডংয়স্ করিয়া চলিতেছে—পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোন ক্রমে চাল্ বেগ্‌ড়ায় না।"—ইত্যাদি।

কিন্তু অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার ছাঁচ,—এই আলালী ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উহা বিশুদ্ধ, গম্ভীর ও সমধিক প্রসাদ-গুণসম্পন্ন।

অক্ষয়কুমার কিছু অধিক পরিমাণে চিন্তাশীল ও দার্শনিক। তাই তাঁহার লেখাও কিছু অধিক চিন্তা ও দার্শনিকতাপূর্ণ। তাই সাধারণ পাঠক তাঁহাকে বড় বেশী আয়ত্ত করিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার বেশী ভক্ত হইবার কারণ এই, তিনি বড় মিষ্ট করিয়া করুণার সুরে—সমধিক সহৃদয়তার সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিতেন। তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয় 'সীতার বনবাস' এই করুণার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। সীতার বনবাস পাঠে অতি বড় পাষাণের হৃদয়ও আর্দ্র হয়। বিষয় গুণেও বটে, আর লেখার ভঙ্গীতেও বটে। যার প্রাণ যে সুরে বাঁধা, তার হৃদয় হইতে সেই সুরই খুলে ভাল। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর—করুণার চির উপাসক; তাই সেই উৎস হইতে যাহা বাহির হইত, তাহাই মিষ্ট, করুণ ও অধিক মনোজ্ঞ হইত,—তা সাহিত্যে কি আর বিধবাবিবাহরূপ সমাজ সংস্কারেই বা কি? অত্যধিক দয়ার নিকট ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষেধ বিধি সব ভাসিয়া যায়; তাই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর আর্ত্তের অশ্রুমোচনে, বিপন্ন অর্থীর সাহায্যদানে, নিরন্নের অন্নদানে, আশ্রয়হীনের আশ্রয়দানে,—সর্ব্বোপরি বালবিধবার পত্যন্তর গ্রহণে—মুক্তহস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন,—ষাইটটি বিধবাবিবাহের জন্য তাঁহার বিরাশী হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।—বিধবাবিবাহের সমর্থন করি না; কিন্তু কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ দয়ার দিক হইতে দেখিলে, বিদ্যাসাগরের সাত খুন মাপ করিতে হয়।

এমন পরার্থপর ত্যাগী ও কর্ম্মীপুরুষ, ইদানীং আর জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং যাহার হৃদয় এমন উন্নত, তাহার হৃদয়-প্রতিবিম্ব সাহিত্যেও কিরূপ উন্নত হইতে পারে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যায়। চিন্তা না করিয়া, অমনি শুধু শুধু পড়িয়া গেলেও তাঁহার ভাষার মিষ্টতায় প্রাণ আকৃষ্ট হয়।

গভীর দার্শনিক, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার,—তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত হইয়াও এ সৌভাগ্য সম্যকরূপে অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তথাপি বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট চিরঋণী। কেননা, তিনি যে অক্ষয় চিন্তারত্ন ও দুর্লভ ভাবসম্পদ বঙ্গসাহিত্যে দিয়া গিয়াছেন,—যে চারুপাঠ, বাহ্যবস্তু, এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনায় চিরদিন তাহার পুণ্যস্মৃতির পূজা করিলেও আমাদের ঋণ শোধ যাইবে না। দার্শনিকের ভাষা স্বাভাবিকই একটু কঠিন হয়, এবং সে ভাষার পাঠকও কম হইয়া থাকে। সে হিসাবে, অক্ষয়কুমারের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আজিও লোকে সমধিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করে এবং সাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত অপেক্ষা তাঁহার পাঠক ও ভক্ত অনেক অধিক। ইহার কারণ এই, চারুপাঠ প্রভৃতির ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলেও নীরস বা কটমট নয়,—পড়িলে ভাবের উদ্রেক হয় এবং প্রাণ ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়া থাকে। বাল্যের সেই —"পরের দুঃখমোচনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন"—চারুপাঠের সেই মধুর মনোহর উক্তি যেন এখনও আমাদের কাণে বাজিয়া আছে। বেশ স্মরণ আছে, পঠদ্দশায় এই 'চারুপাঠ' আমরা এমন মনোযোগের সহিত পড়িতাম যে, এখন কোন উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থও তেমন অনুরাগের সহিত পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। পড়িলেও, সত্য কথা বলিতে কি, বাল্যের সে অপূর্ব্ব ধারণার মত, এখন আর সে ধারণা হৃদয়ে তেমন গভীর রেখাপাত করিতেও সমর্থ হয় না। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, মহাত্মা অক্ষয়কুমার আমাদের হৃদয়ের উপর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিব, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার স্বাভাবিক মধুরতা, সরলতা ও আকর্ষণী শক্তি তাঁহা হইতে অনেক অধিক।

সেই আধিক্যে অক্ষয়কুমারের তুলনায় একটু কম চিন্তাশীল হইয়াও, তিনি বাঙ্গালাসাহিত্যে ও বঙ্গসমাজে, প্রবল প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

উভয়ের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা করিলে সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়,—অক্ষয়কুমার দার্শনিক, বিদ্যাসাগর কবি; অক্ষয়কুমার ভাবুক, বিদ্যাসাগর প্রেমিক; অক্ষয়কুমার তত্ত্বদর্শী; বিদ্যাসাগর সমাজবন্ধু; সমাজ ও সাহিত্যের নেতৃত্ব এইজন্য তাঁহারই অধিক প্রাপ্য। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ও হৃদয় একযোগে কাজ করিত। একাধারে হৃদয়-বল ও মস্তিষ্কের কার্য্য তাঁহাতেই দেখা যায়; কার্য্যক্ষেত্রও তাঁহার বিস্তৃত;—বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালা সমাজ এইজন্যই তাঁহার নিকট অধিক কৃতজ্ঞ।—সাহিত্যে ও শিক্ষায় সেই কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে অধিক বরণীয় ও পূজাস্পদ করিয়াছে;—নহিলে অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-প্রতিভা—সবটা জড়াইয়া ধরিলে বিদ্যাসাগর হইতে অধিক কম হইবে না,—প্রায় তুল্যমূল্য। বলিয়াছি ত—এক ভাষা; ঐ ভাষার সরসতা, লালিত্যে, ও করুণ কোমল ভাবেই তিনি বিদ্যাসাগর হইতে এক সোপান নিম্নে নামিয়া পড়িয়াছেন মাত্র।

নহিলে, উভয়েই দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সে মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন;—সে দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া গিয়াছেন,—সে দেবতার নির্ম্মাল্য, প্রসাদ ও ভোগ ভক্তবৃন্দকে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন; এখনও শতাব্দীকাল—কি তাহারও অধিক কাল ধরিয়া লোকে শ্রদ্ধার সহিত সে প্রসাদ গ্রহণ করিবে; গ্রহণে পবিত্র ও বিশুদ্ধ হইবে; নির্ম্মল চরিত্র ও ধর্ম্মবল লাভ করিয়া মাতৃপূজায় মনোনিবেশ করিবে—তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে বঙ্গভাষার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবে,—আর গুরুরূপে বাঙ্গালা-গদ্যের সেই আদি সংস্কারক—সেই অকপট উদার নিঃস্বার্থ নেতৃদ্বয়কে অন্তরে স্মরণ করিয়া লেখনী ধারণ করিবে। বক্তা বা লোকমতের পুষ্টিকর্ত্তা।—সাময়িক, অথবা কিছু কালের জন্য;—কিন্তু এরূপ শক্তিশালী সাহিত্যসেবীদের—দেহান্তের পরও কার্য্য চলিতে থাকে;—কেননা প্রতিভার বিনাশ নাই।

এখন অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের রচনার একটু আদর্শ উদ্ধৃত করিয়া

এবং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথার একটু আলোচনা করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

উভয়েই সমসাময়িক; উভয়েই দুঃখের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; বাল্যজীবন উভয়ের অতি কষ্টেই কাটিয়াছিল। ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগরের দুঃখময় বাল্যজীবন-কাহিনী সর্ব্বজন-বিদিত;—পঠদ্দশায় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, কাঠ চেলা করিয়া, বাট্‌না বাটিয়া, বাজার করিয়া, কোন দিন এক বেলা খাইয়া, কোন দিন বা এক দিনের ভাত দু'দিন আহার করিয়া, ভাবী লোকশিক্ষক, সাহিত্যগুরু, সমাজ-বন্ধু, দেশপূজ্য বিদ্যাসাগর লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, পিতা ও ভ্রাতাদের অভাব মোচন করিয়াছিলেন,—উত্তর-জীবনে প্রায় ক্রোরপতি হইয়া মুক্তহস্তে নিরন্নকে অন্ন দিতে দিতে—অর্থী ও অভাজনের অভাব পূরণ করিতে করিতে, সমস্ত ধন নিঃশেষ করিয়া গিয়াছিলেন,—এ সকল কথা এবং তাঁহার জীবনের আরও অনেক দয়া ও ত্যাগের কাহিনী দেশবাসীর মনে চিরজাগরূক আছে;—কিন্তু নীরব অক্ষয়কুমার, নীরব দার্শনিক, নীরব চিন্তাশীল, নীরব ঈশ্বরবিশ্বাসী, নীরব ধ্যানমগ্ন ভগবদ্ভক্ত, নীরব জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারী, নীরব সাহিত্য ও সমাজবন্ধু, নীরব সৃষ্টিসৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ উপাসক,—নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, আজীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, যে উৎকট পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নমনা হইয়া, শেষজীবন একরূপ জীবন্মৃত থাকিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে লীন হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সংগ্রামক্লিষ্ট দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনও সজ্জন সহৃদয়ের গভীর সহানুভূতি ও শোকের অশ্রু আনিয়া দেয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় দুঃখের পরাকাষ্ঠা সহিয়া বীরের মত দুঃখ জয় করিয়া, অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, নিজের ইচ্ছামত জলের ন্যায় তাহা আবার সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া, রাজার অধিক সম্মান পাইয়া, ইহজীবন সফল করিয়া গিয়াছেন;—আর চিরদুঃখী অক্ষয়কুমার, পরমুখাপেক্ষী অক্ষয়কুমার, দীনতার প্রতিমূর্ত্তি অক্ষয়কুমার—প্রাক্তনফলে—নির্দ্দিষ্ট অতি স্বল্প বেতনে—আজীবন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে খাটিতে, নীরবে তপ্তশ্বাস ফেলিয়া দিন গণিতে গণিতে, মনের শত সাধ মনে রাখিতে রাখিতে, অন্তিমে কাতরপ্রাণে সেই অনন্তের ক্রোড়ে লীন হইয়াছিলেন। তাঁহার মুক্তাত্মা অতি ঊর্দ্ধগতি

প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই ;—জন্মান্তরে তাঁহার শান্তি ও সুখসৌভাগ্য অনিবার্য্য ;—কিন্তু ইহজীবনে, সাহিত্যের সেই নীরব কর্ম্মযোগী—যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট ভোগ করিয়া গিয়াছেন,— তাহার কল্পনায়ও চোখে জল আসে। আট টাকা বেতনে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া কিছুদিন নর্ম্মাল স্কুলের পণ্ডিতী করিয়া, শেষ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া,—ইস্তক প্রুফ্ দেখা প্রবন্ধ লেখা হইতে ফরাসী জর্ম্মণ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা হইতে বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ ও জ্ঞানবিজ্ঞান অলোচনা করিতে করিতে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় নীরবে মাতৃভাষার সেবা করাই যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল,—কোনরূপ ধন্যবাদ লাভের বা মানযশঃ অর্থের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া যে মহতী প্রতিভা—"ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের" ন্যায় গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক অমূল্য গ্রন্থের আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারীর,—দুঃখ দৈন্যময় জীবনকথার স্মরণেও চোখে জল আসে।—হায়! যে মস্তিষ্ক হইতে তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় কাগজের—অমূল্য প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রবন্ধকারের—সেই মৌলিক মস্তিষ্কের মূল্য ছিল—মাসিক ৬০৲ টাকা! মাত্র ষাট টাকা বেতনে দরিদ্র অক্ষয়কুমার এই গুরুতর মানসিক পরিশ্রমে, জীবন গোঁয়াইতে গোঁয়াইতে, জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করিয়া গিয়াছেন। আর হয়ত সে সময়ে যে তাঁর জুতা ঝাড়িবারও যোগ্য ছিল না, সে হয়ত মাসিক ছয় শত টাকা—কি ছয় সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়া, দিব্য দুধে-ভাতে খাইয়া, গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া, হয়ত রাজপথের মলিনবেশী পথিক—দরিদ্র অক্ষয়কুমারকে, একরূপ চাপা দিতে দিতেই চলিয়া গিয়াছে!—হায় প্রাক্তন!

অথবা মনে হয়, এই দারিদ্র্যদুঃখের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, হৃদয়ে অপরাজিত ভক্তি ও একনিষ্ঠা লইয়া, বীরের মত নীরবে তিনি সাহিত্য-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। কেননা, সুখ ভোগে নয়,—ত্যাগে।

যাই হোক, বদ্ধজীব গৃহী আমরা; সাংসারিক অভাব বা নির্দ্দিষ্ট স্বল্প আয়ের মধুরতা—হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি;—তাই সেই ভিক্টোরিয়া-যুগের গদ্য-সাহিত্যের গুরুস্থানীয় সোনার অক্ষয়কুমারের এই আজীবন সংগ্রাম

আমাদের বুকে বড় বিষম বাজিয়াছে। অথবা, মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে কে প্রবেশ করিবে ;—হয়ত এই সামান্য আয়ে মহাত্মা অক্ষয়কুমার মনের সুখে থাকিয়া পরম শান্তিতে যে ঐশী তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে জীবন ধন্য করিয়া গিয়াছেন,—তাহার তুলনায় অর্থের সচ্ছলতা কতটুকু ? কেন না, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, কীর্ত্তি অবিনাশী।

কিন্তু শেষজীবনে অক্ষয়কুমার যে কঠিন কষ্টকর শিরোরোগের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সুদীর্ঘকাল জীবন্মৃতভাবে ছিলেন, সে দুঃখ সহজে ভুলিবার নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের সমবেত উপাসনা কালে,—তিনিও সে উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন,—সেই উপাসনার সময়ে সহসা সেই যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সেই কালমূর্চ্ছাই তাঁহার কাল শিরঃপীড়ার সূচনা করিল,—সে পীড়া আর আরোগ্য হইল না। আরোগ্য হওয়া দূরে থাক, তাহাতেই সেই প্রকৃতির নগ্নপ্রাণ শিশু সুদীর্ঘকাল যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে, নীরবে কাতর প্রাণে, মহাপ্রকৃতি মহাশক্তিরূপিণী মার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই, সেই কঠিন রোগশয্যায় থাকিয়াও সাহিত্যের নীরব কর্ম্মযোগী "উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ" পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। সাহিত্যের এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, অক্ষয়কুমারের মহান্ জীবনের উজ্জ্বল-প্রতিবিম্ব। জানি না, তাঁহার জীবন-চরিত লেখকেরা আমাদের এই কথাটা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন। কেননা, ঐ যে আকস্মিক মূর্চ্ছা ও তাহা হইতে কালান্তক শিরঃপীড়া, তাহা কি সেই মহাত্মার অত্যধিক মানসিক শ্রম ও পার্থিব ভোগের একান্ত অভাবের ফল নহে ? কে বলিবে যে, জ্ঞানার্জ্জন পিপাসার সহিত যদি তাঁহাকে সামান্য জীবিকার্জ্জনের হীনকষ্ট ভোগ করিতে না হইত, তাহা হইলে কত প্রফুল্লমনে, হাসি হাসিমুখে, দেশকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন ! কিন্তু নিয়তির ফল কে রোধ করিবে ? দীন অক্ষয়কুমার ঐ দীনভাবে—আজীবন দুঃখের বোঝা মাথায় বহিতে বহিতে দেহপাত করিলেন, আর আজ সেই অতীত বিষাদকাহিনী, বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিতে করিতে, তাঁহার দীন ভক্তবৃন্দ নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে। যাঁহার চারুপাঠের উদার উন্নত ধর্ম্মভাব পড়িয়া কতলোক মানুষ হইল,—কত গ্রন্থ রচনা করিল,—হয়ত তাহার নামের

ডঙ্কা কত রকমে বাজিয়া উঠিয়াছে,—আর তার গুরু—সেই বাঙ্গালা গদ্যের আদি-সংস্কারক—সাহিত্যের উন্নতিকল্পে—কি ভাবে কত কষ্টে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন,—তাহা স্মরণ করুন দেখি? সে স্মরণেও পুণ্য আছে।

এখন ত দেখি, সাহিত্যের অনেক অযোগ্য ব্যক্তিরও বিপুল ধুমধামে স্মৃতিসভা হয়। অমনি সেই সঙ্গে মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমারের ন্যায় শক্তিশালী সাহিত্য-সেবীদের স্মৃতিসম্মান প্রকাশ করাও ধর্ম্মসঙ্গত নয় কি? কিন্তু দূর হোক্,—সে সব মহাত্মা এখন স্তুতিনিন্দার অতীত রাজ্যে—শ্রীভগবানের চরণ সান্নিধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সে যোগি-জন-দুর্লভ শান্তিভঙ্গ করিয়া ফল কি? এ ঝুটার সংসারে ঝুটা মান লইয়া স্বার্থের আদান প্রদান হিসাবে—স্বার্থের মুকুরে পরস্পরের মুখ দেখিয়া যাহারা পরিতৃপ্ত হইতে চাহে, তাহারা আপন আপন কর্ম্মফলে তাহাই করিতে থাকুক;—আমাদের অক্ষয়কুমার সেই অক্ষয় অনন্তধামে থাকিয়া শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে—স্নেহদৃষ্টিতে দেখিয়া স্মিতমুখে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই প্রার্থনা।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত চুপীগ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত; মাতার নাম দয়াময়ী। ইহাঁরা বঙ্গজ কায়স্থ। অক্ষয়কুমারের পিতামাতার বহু সদ্‌গুণ ছিল। সেই সমস্ত গুণরাজি পুত্রেও বর্ত্তিয়াছিল;—অক্ষয়কুমার ধার্ম্মিক, শান্তস্বভাব ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। আয় সামান্য হইলেও তাহা হইতেও যথাসাধ্য—তিনি গোপনে দান করিতেন। বাল্যে, গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতেই বালক—চিন্তাশীল। পার্শী পাঠ করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে প্রশ্ন উঠিত,—'পৃথিবী কত বড়? এ পৃথিবীর কর্ত্তা কে? আকাশ কতদূর বিস্তৃত?'—এই সব গুরুতর দার্শনিক-তত্ত্বের বীজ সেই বালক-হৃদয়েই উপ্ত হয়। প্রথম দিনকতক খিদিরপুর মিশনরী স্কুলে, তৎপরে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিএণ্টেল সেমিনারীতে অক্ষয়কুমারের ইংরেজী পাঠ হয়। পাঠ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুতে বালকের স্কন্ধেই সংসার নির্ব্বাহের ভার পড়িল। পঠদ্দশাতেই অক্ষয়কুমারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট মেধা প্রকাশ পায়। অবস্থাবিপর্য্যয়ে অক্ষয়কুমার স্কুল ছাড়িলেন বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও তাঁহার পাঠের বিরতি ছিল না,—ভূগোল, খগোল,

গণিত, পদার্থবিদ্যা—এই সব বৈজ্ঞানিক বিষয় গভীর অনুরাগের সহিত তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের খুব প্রতিপত্তি; অক্ষয়কুমার, গুপ্তের 'প্রভাকরে' প্রথম বাঙ্গালা লেখা সুরু করিলেন। তাঁহার প্রথম চাকরি—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়। তথায় মাসিক বেতন আট টাকা, পরে চৌদ্দ টাকা হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৬৫ শকের ভাদ্র মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়; অক্ষয়কুমারের রচনাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তত্ত্ববোধিনীর কর্তৃপক্ষ, অক্ষয়কুমারকে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিলেন; মাহিনা হইল ষাইট টাকা। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত নর্ম্মাল স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। অবস্থার হীনতায়, অনিচ্ছার সহিত তাঁহার এ চাকরি গ্রহণ;—তথাপি সাহিত্যানুশীলনে—তথা তত্ত্ববোধিনীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে—তিনি একদিনও পরাঙ্মুখ হন নাই। ১৭৭৭ শকের আষাঢ় মাসে তাঁহার সেই বিষম শিরঃপীড়া হয়,—সেই পীড়াই তাঁহার কাল হইল;—১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ,—৬৬ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার অন্তর্গত বালি গ্রামে তিনি পরলোক গমন করেন। শেষ কয়েক বৎসর ঐ বালিতেই তাঁহার অতিবাহিত হয়। নিদারুণ শিরঃপীড়ার কষ্টে তাঁহার সেই উর্ব্বরমস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি হ্রাস হয়, মাথারও কিছু গোলমাল হয়। তিনি একরূপ জীবন্মৃত হইয়া থাকেন;—উপরে সে বিষাদ-কাহিনী বলিয়া আসিয়াছি। একটু সুখের কথা এই, এ সময়ে তাঁহার গ্রন্থের কিছু বাঁধা আয় হইয়াছিল, তাহাতেই একরূপ সুখে দুঃখে দিন কাটিয়া যায়।

এই গেল অক্ষয়কুমারের স্থূল জীবনী। কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম জীবনকথা যিনি জানিতে চান, তিনি তাঁহার হৃদয়ের ইতিহাস—তাঁহার সেই চিরমনোহর 'চারুপাঠ' (তিন ভাগ) 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার,' 'পদার্থবিদ্যা,' 'ধর্ম্মনীতি' এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-রূপ অমূল্য গ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করুন;—দেখিবেন, কি গভীর অনুরাগ, অধ্যবসায় ও গবেষণার সহিত সবটা মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তিনি লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। সাধক যেমন ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত তাঁহার ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করেন,—বাণীর চিরসেবক—ঐশী তত্ত্বের একনিষ্ঠ উপাসক

অক্ষয়কুমারও তেমনি ভাবে তাঁহার ভাষা-জননীর অঙ্গরাগের সহিত—চিন্তাও ভাবসম্পদরূপ সাজসজ্জা দ্বারা—মাতৃরূপিণী সাহিত্য-প্রতিমা মনের সাধে সাজাইয়া গিয়াছেন।—হইতে পারে সাজাইবার এদিক-ওদিক;—ভগবানের সৃষ্টির পর কোন্ কাজই বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়? কিন্তু তিনি যে দুর্লভ মণি-মাণিক্য ভাষার ভাণ্ডারে রাখিয়া গিয়াছেন, কালনিশ্বাসে তাহা ক্ষয় হইবার নহে;—বঙ্গভাষা ও বঙ্গভাষী চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার পরিশ্রম, গবেষণা, অনুসন্ধিৎসা ও অটল অধ্যবসায়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার গুণগান করিবে। অবশ্য অক্ষয়কুমারের সকল কথা, সকল মত অভ্রান্ত সত্য বলিয়া সকলে মানিবে না, আমরাও মানি না। কিন্তু তাঁহার লেখায় যে সরলতা ও আন্তরিকতা আছে, তাহা দেখিলে, কেহই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

বড় ক্ষোভে একটা কথা এখানে বলিব। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহোদয়ের মত অমন একজন বিচক্ষণ, সহৃদয় ও নিরপেক্ষ সমালোচক যে অক্ষয়কুমারের আন্তরিক ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। অন্য কেহ এরূপ—কি ইহা অপেক্ষাও অধিক কটাক্ষ করিলেও হয়ত আমরা কথাই কহিতাম না;—কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত মহান্ ব্যক্তি এরূপ করিয়াছেন বলিয়া, কথাটার এখানে উল্লেখ করিতে হইল। তিনি বলেন,—

"অক্ষয় বাবু সকল পুস্তকেই 'পরম কারুণিক' 'পরম পিতা' 'পরাৎপর পরমেশ্বর' 'অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা' প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভাল পদার্থ বটে, তাঁহাকে মনে করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তালটি পড়িলেই—পাতাটি নড়িলেই—পাখীটি উড়িলেই—অর্থাৎ সকল কার্য্যেই যদি লোককে ঈশ্বরের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের বোধে সে উপদেশ সফল হয় না। ঈশ্বর প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়—অমনতর খেলিবার বিষয় নহেন। আমরা জানি, ঘন ঘন উল্লিখিত 'অত্যাশ্চর্য্য' 'অনির্ব্বচনীয়াদি' শব্দের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে অনেক পাঠকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন—ঈশ্বরানুরাগ প্রকাশ করেন না?"*

* সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

কিন্তু কথাটা কি ঠিক ? এরূপ মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে, ন্যায়রত্ন মহাশয় কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার মত—অক্ষয়কুমারের লেখার ধাত বিচার করিয়াছেন ? যে, যে বিষয়ের চিন্তা করে, সে ত তারি সত্বা পায় ? ইহা ত অতি স্বাভাবিক। সত্বা না পাওয়াই একরূপ অস্বাভাবিক। কাচপোকা যখন আরসুল্লাকে ধরে, তখন আরসুল্লা বেচারা ভয়ে—শত্রুকে ভাবিতে ভাবিতেই কাচপোকা হইয়া যায়। ভয়ে যদি এতটা হইতে পারে, তবে ভক্তিতে মানুষ ভগবানের সত্বা সর্ব্ববস্তুর ভিতর দিয়া দেখিবে,—ইহার আর আশ্চর্য্য কি ? না দেখাই আশ্চর্য্য। পরমহংসদেব বলিতেন,—"যদি কেউ মুলো খায়, তো তার মুলোর ঢেঁকুরই ওঠে",—গোলাপের গন্ধ তার মুখে আসিবে কোথা হইতে ? ভগবদ্ভক্ত তত্বদর্শী অক্ষয়কুমার রাত দিন ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা করিতেন, তাহার ফলে তাঁর হৃদয়ের নিধি—ভাষার মুখেই পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে বিদ্রূপের বিষয় কি থাকিতে পারে ? তা ওরূপ বিদ্রূপ যাদের করা অভ্যাস, তারা শুধু অক্ষয়কুমারের কেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঁচিশ' লইয়াও করে, আর 'বিধবাবিবাহ বিচার' লইয়াও করে,—আরও অনেকরূপে করিয়া থাকে। শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বা কেন, প্রয়োজন হইলে, তাহারা স্বয়ং বেদব্যাসকে লইয়াও বিদ্রূপ করিয়া থাকে। এমন একটা স্থূল কথা ধরিয়া,—অত বড় একটা প্রতিভাশালী পণ্ডিত ও প্রবীণ সাহিত্যসেবীকে লইয়া,—এমনভাবে 'ন-কড়া ছ-কড়া' করা, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পক্ষে শোভন হয় নাই,—অন্ততঃ তাঁহার এই অপূর্ব্ব 'সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থখানির আর কোথাও এমন গাম্ভীর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। আমরা কিছু বিস্মিত হইয়াছি যে, অমন ধীরতা, সতর্কতা ও সংযমের সহিত গ্রন্থের আদ্যন্ত লেখনী চালনা করিয়া—এই স্থলে—মাত্র এই অংশটায় তিনি এমন অসামাল হইয়া পড়িলেন কেন ? কেন— কি বলিব ? তাঁর মনের কথা ভগবানই জানেন। কেননা, ন্যায়রত্ন মহাশয়ও ইহসংসারে নাই,—অক্ষয়কুমারও পরলোকগত ;—কে আমাদের অন্তর্নিহিত সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিবে ? ভগবান্ করুন, আমাদের ধারণা বা খট্‌কা যেন ভুলই হয়। কেননা, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ; তাঁহার প্রায় সকল মতের সহিত আমাদের মত মিলিয়া আসিতেছে। অধিক

কি, তাঁহার গ্রন্থ আদর্শস্বরূপ না পাইলে আমাদের এ গ্রন্থ—কিংবা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের এ শ্রেণীর গ্রন্থগুলি রচিত হইত কিনা তাহাই সন্দেহ। যাই হোক্, অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্যটি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আন্তরিক মত বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা বাধ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ মতে মত দিতে পারিলাম না।

তৃতীয় ভাগ 'চারুপাঠ' হইতে,—"শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ—অক্ষয়কুমারের রচনার আদর্শ-স্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়-জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষায় তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্ল যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোকসম্পন্ন সুচারু চিত্তপ্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।"

অক্ষয়কুমারের 'উপাসক সম্প্রদায়' যে কিরূপ উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু মাত্র পাঠ করিলেই বুঝা যায়। ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় এই অংশটি আছে ;—

'আর্য্যেরা কি শুভদিনে ও কি শুভক্ষণে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে পদার্পণ করিয়াছিলেন! ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরকালে যে অত্যুন্নত অতি দুর্লভ গৌরব-পদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে, তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারতভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ-বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটি অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের ইতিহাস এককালেই বর্ণন করিতেছে, এবং জাহ্নবী-জল-পবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রাসলিল সুস্নিগ্ধ

রবিকরের অতিবিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া
রাখিয়াছে, তাহারও আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারতরাজ্যে পতিত হয়।
আরোগ্যরূপ অমূল্য রত্নের আকরস্বরূপ যে আয়ুর্ব্বেদ শুভকর শাস্ত্র আবহমান
কাল স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় অসংখ্য লোকের রোগজীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে
আহ্লাদে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, এবং কোটি কোটি জনের
উৎপদ্যমান শোকসন্তাপ ও শঙ্কোন্মুখ বৈধব্য-বিপদের একান্ত প্রতিবিধান
করিয়া আসিয়াছে, ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ বিশেষের
শক্তিযোগে কখন কখন প্রভাবতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম
করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারতক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে
শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী যাবতীয় জাতি
বিজিত হইয়া পর্ব্বত ও গিরিগুহার আশ্রয় লইয়াছে, এবং সে দিনেও যে
শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ পুরুষেশ্বর শিখ জাতির হৃদয়চুল্লী হইতে উত্থিত
হইয়া অত্যদ্ভুত অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই
আর্য্যভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবল পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক
হস্তে হলযন্ত্র ও অপর হস্তে রণশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র-কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী
হইয়া উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহ-পালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষে
প্রবেশ করিতেছেন, ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়।
ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্রশাখা সমন্বিত সলিলপূর্ণ কলসা-
বলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক তাঁহা-
দিগকে প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃ-
পুরুষদিগের পদাম্বুজ রজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।”

অক্ষয়কুমারের ‘বাহ্যবস্তু’ কিরূপ চিন্তা ও ভাবুকতাপূর্ণ, নিম্নের এই কয়
ছত্র দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে ;—

‘ইহলোকে পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে
কার্য্য করিলে অবশ্যই ইষ্টলাভ হয়, এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া আশাবৃত্তি চালিত
ও চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু কেবল ইহকাল ও ভূমণ্ডল মাত্র আশার
বিষয় নহে। জিজীবিষা বৃত্তির সহিত তাহার সংযোগ হইলে শতবর্ষ
আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না। তখন এই শত বৎসরকে অতি অল্পকাল

হয়, এবং এ জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হয়। তখন মনে হয়, কালই আমার পরমায়ু, এবং অখিল সংসারই আমার, নিত্যধাম।" ইরূপ, তাঁহার 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার ফল। খের বিষয়, রচনা শিক্ষা ও ভাষাজ্ঞানের জন্য অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থ এখনও স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়া আসিতেছে,—বিশ্বদ্যের উচ্চ পরীক্ষায়ও মধ্যে মধ্যে ইহা নির্দ্দিষ্ট হয়। ভাষাজ্ঞানের ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিশিক্ষা যে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ হইতে প্রচুর পরিমাণে পারে, ইহা আমাদের ধ্রুববিশ্বাস। বিশেষ, তিনি সকলের অগ্রবর্ত্তী, সাগর মহাশয়েরও কিঞ্চিৎপূর্ব্বে তিনি কলম ধরিয়াছিলেন, সুতরাং এই ভিক্টোরিয়া-যুগের একরূপ আদি গদ্য-সংস্কারক;—সে হিসাবেও হার মর্য্যাদা-সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। তাই আশা হয়, হার এই সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি স্কুল-বোর্ড হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইবে না,—দর বালকবালিকা এবং স্ত্রী পুরুষ যেন আরও সুদীর্ঘকাল এই অমৃতের স্বাদ পায়,—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনা করি। অবশ্য ভাষার রলতা ও মধুরতা হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান অক্ষয়কুমারের উচ্চে। পক্ষান্তরে চিন্তা, গবেষণা ও সংগ্রহ হিসাবে অক্ষয়কুমারের প্রাধান্য বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেও অধিক,—ইহা আমাদের সরল বিশ্বাস।

এইবার সেই স্বনামধন্য, সর্ব্বজনবরেণ্য, জগৎবিখ্যাত, ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা।—বিদ্যাসাগর বলিতে বাঙ্গালার এক মাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বুঝায়। অন্য বিদ্যাসাগর কেহ থাকেন থাকুন, তাঁহাকে সবিশেষ পরিচয় দিয়া, তবে এ উপাধির মান বজায় রাখিতে হয়; কিন্তু মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে হয় না—কেননা, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহার মান—তাঁহার নাম—প্রায় সকলের চেয়ে বেশী। রাজা রামমোহন রায়, প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্র, ভগবদ্ভক্ত বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কেশবচন্দ্র,—এক এক বিষয়ে বাঙ্গালার প্রধান ব্যক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু মস্তিষ্কের সহিত হৃদয় ও মনের বল একাধারে থাকায়, এ ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহ আত্মজীবনে যে শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া গিয়াছেন, বুঝি সে অংশে তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। এক একবার আমাদের মনে হয়, বিদ্যাসাগর উপাধি

না হইয়া 'দয়ার সাগর' উপাধি যদি তাঁহার হইত, তাহা হইলে আর কোন কথাই থাকিত না ;—কেননা এমন দয়া, এমন ত্যাগ, এমন পরার্থপরতা—এ যুগে পাশ্চাত্য-আদর্শে-গঠিত বাঙ্গালীর মধ্যে দ্বিতীয় পরিদৃষ্ট হয় না।

কিন্তু হায়! এই সঙ্গে যদি সেই মহাত্মার ধর্ম্মমত ও ঈশ্বরবিশ্বাসের পরিচয়ও প্রকাশ পাইত! 'বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্ম্মের একনিষ্ঠ উপাসক ;—হিন্দুর দেব আরাধনা বা হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য তিনি এমন করিয়াছেন—তেমন করিয়াছেন,' —লোকে যদি এ কথা বলিবারও সুবিধা পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় আজ দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইত ; হিন্দু সত্যিকার হিন্দু হইত ;—পাশ্চাত্যভাবে ইহকালসর্ব্বস্ব হইয়া স্রোতে গা-ভাসান দিত না। কেননা তাঁর মত শক্তি-শালী, তেজস্বী, নির্ভীক, পরার্থপর ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য বা ঈশ্বর লাভের জন্য যে কাজ করিতেন বা যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, সমগ্র বাঙ্গালা দেশ—সমগ্র হিন্দুজাতি তাঁহার সেই মহান্ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত ;—শত চূড়ামণির সহস্র বক্তৃতা, শত ভূদেবের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য ত্যাগ বা দান—তাঁহার সেই মহান্ আদর্শের নিকট পঁহুছিতেই পারিত না,—ইহা আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা। কারণ বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব ও মান—রাজার ন্যায় হইয়াছিল ; তাঁহার একটু অঙ্গুলিহেলনে কিংবা ক্ষুদ্র একটি ইঙ্গিতে লোকে উঠ্‌ব'স করিত ;—কোনরূপ তর্কযুক্তি বা মীমাংসা—লোকের মনেই উঠিত না। 'হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এরূপ করিতে বলিতে-ছেন,—তখন ইহা অবশ্যই করণীয়'—এই ধারণা ও বিশ্বাসবশে—সহস্র সহস্র লোক তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিত,—বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টার ন্যায় হয়ত তাঁহাকে নিজে হাতে-কলমে কিছু করিতেও হইত না! এমন সময়, সুযোগ ও সৌভাগ্য উপস্থিত সত্ত্বেও যে সেই কর্ম্মবীর স্বজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বা ধর্ম্মের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত কিছুই করিয়া যান নাই—এ ক্ষোভ স্বভাবতঃই লোকের মনে উদিত হইতে পারে। অবশ্য কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তির এই ভাবের অনুযোগে, তিনি তাঁহার কোন কোন বন্ধুর নিকট বলিতেন যে, 'পরকালের বেতের ভয়ে' তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত বা ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা বলিতে নারাজ। অর্থাৎ পাছে লোকে বিদ্যাসাগরের মত-অনুসারে সাধন ভজন বা ইষ্টারাধনা করে, এবং সেই উপলক্ষে বিদ্যা-

সাগরকেই পরলোকে ঈশ্বরের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।—কথাটা মজ্‌লিসী-গল্পে—পাঁচ-ইয়ারে বসিয়া জমে ভাল বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত তেজস্বী ও নির্ভীক ব্যক্তির মুখে কি এমন কথা শোভা পায়? প্রকৃতই যদি এ বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ থাকিত এবং বিশ্বাস সুমেরুবৎ অটল রহিত, তবে সেই পুরুষসিংহ কি এমন একটা অতি প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয়ে উদাসীন থাকিতেন? বিশেষ সেই সময়, সেই কাল;—দলে দলে লোক বিধর্ম্মী হইতেছে; বেদবিহিত আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করিতেছে; সহস্র সহস্র লোক তাহারও অধিক স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়াসক্ত ও ঘোর বিলাসী হইয়া,—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উঠাইয়া দিয়া, সকল সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া, কেবল টাকা ও ভোগই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া—না ব্রাহ্ম, না খৃষ্টান, না মুসলমান—কিছুই না হইয়া নাস্তিকের অধিক কিম্ভূতকিমাকার সাজিয়া,—ধরার ভার বৃদ্ধি করিতেছে;—সেই দুর্দ্দিনে, মহাসমস্যাপূর্ণ সময়ে, বিদ্যাসাগরের ন্যায় ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষ ইহসংসারে বর্ত্তমান থাকিয়াও নীরব রহিলেন,—হিন্দুর প্রাণে কি ব্যথা লাগে না? 'বেতের ভয়ই' যদি একমাত্র কারণ হয়, তবে 'বিধবা বিবাহ' তিনি চালাইলেন কোন্ ভরসায়?—সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, কি বিশ্বাসে?—'বেতের ভয়' ত ইহাতেও আছে? তা আসল কথা ত তা নয়? মূলে ধর্ম্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরভক্তির গভীরতা তাঁর জীবনে তেমন ছিল না,—এইটিই যেন ঠিক মনে হয়। তাহা থাকিলে সেরূপ সরল শক্তিসম্পন্ন সত্য-সন্ধ ব্যক্তি সিংহবিক্রমে—প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়—ধর্ম্মধন রক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন,—যুদ্ধ করিতেন। বলিবে,—'তবে তাঁর অত দয়া আসিল কোথা হইতে?' কথাটার উত্তর দেওয়া একটু শক্ত। পরন্তু শক্ত হইলেও যখন কথাটা উঠিয়াছে, তখন গুরু-কৃপায়, গুরুর মুখের কথাতেই ইহার উত্তর দিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে মহা সৌভাগ্যের যোগ মনে করি,—পরম-হংসদেবের সহিত তাঁহার এক দিনের শুভ সম্মিলনে। 'অহেতুক কৃপাসিন্ধু' ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিদ্যাসাগরের বিবিধ সদ্‌গুণ ও মহত্ত্বের কথা শুনিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এক দিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। উভয়ের যথা-

বিহিত শিষ্টাচার ও সৌজন্যাদির পর কথায় কথায় ঠাকুর স্পষ্টই তাঁহাকে বলিলেন,—"অন্তরে সোণা আছে, এখনও খপর পাও নাই, একটু মাটী চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, তা হ'লে অন্য কাজ ক'মে যাবে।" এ কথাগুলি কি? ঠাকুর কি প্রকারান্তরে বিদ্যাসাগরকে বলিলেন না,—একবার আত্মদর্শন হইলে,—অমৃতের আস্বাদ পাইলে,—বাহিরের ঐ যে সব কাজ—(পরোপকার দয়া প্রভৃতি)—উহা কমিয়া যাইবে?

দয়াময় আবার বলিতেছেন,—"জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই (ঈশ্বর) ক'চ্ছেন;—যিনি চন্দ্র সূর্য্য ক'রেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্নেহ দিয়াছেন, যিনি মহতের ভিতর দয়া দিয়েছেন, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন",—তিনিই সব ক'চ্ছেন।—এমন স্পষ্ট ঈঙ্গিতের হেতু কি?

ঠাকুর আবার বলিলেন, "যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম্ম ক'মে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম্ম কমায়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম্ম কর্ত্তে দেয় না। পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়।"* এ সকল কথার অর্থ কি? একটু ভাবিয়া দেখিলে হয় না?

পরমহংসদেব তাঁর ভক্তদের মধ্যেও পুনঃ পুনঃ এ কথা বলিতেন যে, 'মনুষ্যজন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য—ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর লাভ।' ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিই সুতরাং সর্ব্বাগ্রে দরকার। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালও 'জগতের উপকার করা মানবজন্মের লক্ষ্য' বলায়, ঠাকুরের নিকট খুব ধমক খাইয়াছিলেন।—'জগৎটা কি এতটুকু যে, তুমি তার উপকার করিবে? 'আপনার উপকার আগে কর, অর্থাৎ অগ্রে তুমি নিজেই মানুষ হও'—এই তাঁর কথা ছিল। লৌকিক কর্ম্মকাণ্ডটাকেই তিনি তেমন প্রাধান্য দিতেন না, বলিতেন, উহা ধর্ম্মপথে প্রবিষ্ট হইবার আদি সোপান মাত্র, ও পথও বড় কঠিন,—বিশেষ এই কলিকালে। তবে নিষ্কামকর্ম্ম খুব ভাল বটে, উহাতে ঈশ্বর লাভ হয়। কলিতে কিন্তু তিনি ভক্তিরই প্রাধান্য দিতেন,—নারদীয় ভক্তি। বলিতেন, 'ঈশ্বর সম্মুখীন হইলে কি তুমি কতকগুলা ডিস্‌পেনসারি, হাঁস-পাতাল, স্কুল,—এই সব চাহিবে, না, তাঁর চরণে শুদ্ধা ভক্তি কামনা

করিবে? আগে স্ব-স্বরূপতে চিন, হৃদয়ে যিনি আছেন, সেই হৃদয়েশ্বরকে অর্চ্চনা কর, তাঁর পাদপদ্মে মতি রাখিয়া, সেই ভক্তিলাভ করিয়া, তবে সংসারে প্রবিষ্ট হও, নচেৎ বড় জড়াইয়া পড়িবে।'—অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসু হইয়া জানাইতেছি, পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে, ঠাকুরের এই ভাব ও উপদেশগুলি কি পরিমাণে ছিল?—কি ভাবে ইহার কার্য্য হইয়াছিল? বলিবে—'জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তাঁহার সেই উদার বিশ্বজনীন দয়া;—দয়ার বাড়া আর ধর্ম্ম কি?' অতি উত্তম। তা সেই দয়া তাঁর উত্তরজীবনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল? তিনি কি নানারূপে ঠকিয়া-ঠকিয়া, নানারূপে ঘা খাইয়া খাইয়া, মনুষ্যজীবনে কতকটা আস্থাহীন হইয়া পড়েন নাই? কতকটা মানবদ্বেষী (man-hater) হইয়া সমাজের সকল সংশ্রব একরূপ ত্যাগ করেন নাই? বলিতেন না কি,—'যাহাকে চিনি না, সেই ভদ্রলোক!'—এমন ভাবও কি কখন কখন প্রকাশ করিতেন না যে, 'কেন সে আমার নিন্দা করিবে কেন? আমি ত তার কোন উপকার করি নাই?"—মহাত্মার এরূপ উক্তির অর্থ কি? ঠিক ঠিক নিষ্কামভাবে কাজ করিলে, উত্তরজীবনে কি তাঁর এরূপ তিক্ততা, ঘৃণা ও অবসাদ আসিত? সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কার্য্য,—কামকাঞ্চনসংস্পৃষ্ট গৃহীর হয় না; কোথা হইতে একটু অহংভাব, একটু কর্ত্তৃত্ববোধ আসিয়া পড়ে। নারিকেল গাছের ডাল শুকাইয়া গাছ হইতে পড়িয়া গেলেও যেমন গাছের গায়ে তাহার এক একটা দাগ থাকিয়া যায়, জীবের আমিত্বও সেইরূপ একটা চিহ্নিত দাগ। কাজেই ঠিক নিষ্কামকর্ম্ম—গৃহীর ভাগ্যে হইয়া উঠে না। বলিবে, 'তবে সকলেই কি ডোর-কৌপীন লইয়া সন্ন্যাসী হইবে?' তা কেন, অগ্রে ভগবান্‌কে জানিয়া, তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি মাগিয়া, সংসার কর, তারপর যত ইচ্ছা জীবসেবা কর, পরোপকার কর, স্কুল হাঁসপাতাল পথ ঘাট কর, অহংভাবের উত্তাপ গায়ে লাগিবে না,—সকলই ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া তখন অনুভূত হইবে। সে অবস্থায় কি শান্তি, কতটা আত্মতৃপ্তি, ভাব দেখি? কাহারও উপর রাগ করা, কাহাকে ঘৃণা করা, কাহাকে শত্রু ভাবা, বা কাহাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখিয়া আত্মার প্রশান্তি নষ্ট করা,—এ সব বালাই আর আসিবে না। মনে

হইবে, 'আমি কে? সেই জগৎকর্ত্তা যেমন করাইতেছেন, তাঁহার হুকুমে আমি সেই মত করিতেছি মাত্র ;—আমার আবার কর্ত্তৃত্ব কি? তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।'—বাস্! আর অভিমান, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিদানের আশা, আরব্ধ কার্য্যে নিরাশা—এ সব উৎপাত জুটিয়া মন মলিন করিতে পারিবে না। শান্তি,—সফলতা বিফলতা, জয় পরাজয়,—সকল বিষয়েই বিমল শান্তি ও আনন্দ—হৃদয়ে বিরাজ করিবে।—এমন জীবন—এমন মধুময় প্রাণ লাভ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। অন্তর্য্যামী নরদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাই দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরকে—তাঁহার অত সদ্‌গুণ সত্ত্বেও অমন স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের নিকট একদিন বলিয়াও ছিলেন,—'কৈ, বিদ্যাসাগরকে দেখ্‌লেম, অন্তর্দৃষ্টি নাই; তা থাকলে অত কাজ জড়াইত না।'—বুঝুন, ব্যাপারখানা।

এ কথায় কেহ এমন না বুঝেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর আমাদের ভক্তির অভাব ; তাই এমন কথা লেখনীমুখে প্রকাশ পাইল। ভক্তি আছে কি না, তা ভগবান্‌ই জানেন ; তবে আমরা ভক্তির ভাণ করি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এইরূপ যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য আদর্শের হিসাবে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে, অত বড় মহাপ্রাণ মহাত্মা—কর্ম্মবীর পুরুষসিংহ—আমাদের চোখে দ্বিতীয় পরিদৃষ্ট হয় না। তবে আমরা কাহারও অন্ধ উপাসক বা স্তাবক নহি, মনে জ্ঞানে যেমনটি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, সরল মনে তাহাই প্রকাশ করিব ;—তাহাতে যা থাকে ভাগ্যে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত লেখকেরা, এমন স্পষ্টভাবে পরিষ্কার করিয়া, তাঁহার ধর্ম্মমত বা ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা কিছু আলোচনা করেন নাই বলিয়া, এই সাহিত্যপ্রসঙ্গে সেই ছক্ একটু দিতে হইল। আশা রহিল, উত্তর-কালে, চিন্তাশীল ভাবুকসমাজের দৃষ্টি, একদিন ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। বুঝিতেছি, এই প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য, উপস্থিত, অনেকের নিকট আমাদিগকে অপ্রিয় হইতে হইবে। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই ;—লোকপ্রিয় হইবার আশায়, লেখায় গোঁজামিল চালাইতে পারিলাম না।

সন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে, মেদিনীপুর

জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে, এই ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এই দিনটি, বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীর স্মরণীয় দিন হওয়া উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; মাতার নাম ভগবতী দেবী। সন ১২৯৮ সালে ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি ২টা ২৮ মিনিটের সময় বিদ্যাসাগরের স্বর্গলাভ হয়।

মাতৃভক্ত মহাত্মাদের সবটাই অলৌকিক। মাতৃভক্ত বলিয়াই তাঁহারা বড়লোক; অথবা বড়লোক বলিয়াই তাঁহারা মাতৃভক্ত। বিদ্যাসাগরের সেই অলৌকিক মাতৃভক্তি, উত্তরজীবনে তাঁহার মাতৃভাষার স্নেহময়ী পালনকর্ত্রী বলিয়া মনে করি। তাঁহার মাও যেমন করুণাময়ী, তাঁহার সাধনালব্ধ মাতৃ-ভাষাও তেমনি করুণাময়ী;—আর তিনি নিজেও তেমনি মাতৃভাবাপন্ন—স্নেহের আধার—করুণাময়। মা যেমন মূর্ত্তিমতী দয়া, বিদ্যাসাগরও তেমনি দয়ার মূর্ত্তিমান্ প্রতিনিধি। অমন কোমল হৃদয়, অমন করুণামাখা অন্তর, জীবে অত দয়া,—জন্ম জন্মের মহাতপস্যায় লাভ হয় সন্দেহ নাই। তপঃভ্রষ্ট বিদ্যাসাগর ইহজন্মে যেন দয়া ও দানের জন্যই সংসারে আসিয়াছিলেন এবং স্বদেশী বিদেশী সকলকে সেই শিক্ষা দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন।

গ্রামে পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে, বিদ্যাসাগর কলিকাতায় আনীত হন। তাঁহার দরিদ্র পিতার মাসিক আয় ছিল মাত্র আট টাকা! সেই কটি টাকা সম্বল করিয়া দরিদ্র ঠাকুরদাস, পুত্রকে কলিকাতায় আনিলেন; বিদ্যা-সাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। এইখান হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনের উন্নতির সূত্রপাত।

কঠোর শ্রমসহিষ্ণুতা ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সহিত বালক বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে—পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ১২৩৬ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ তিনি এইখানে ভর্ত্তি হন। প্রায় সকল পরীক্ষাতেই তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া উচ্চবৃত্তি পাইতে থাকেন। তাঁহার দরিদ্র পিতার সাংসারিক অসচ্ছলতা ঘুচিল। বালক দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহার পাঠ্যজীবন সমাপ্ত হইল। এই সংস্কৃত কলেজ হইতেই তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পাইলেন।

বিদ্যাসাগরের প্রথম চাকরিগ্রহণ—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, পরে সংস্কৃত

কলেজে। পঞ্চাশ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন তাঁহার হইয়াছিল। শেষ ঐ সংস্কৃত কলেজেই প্রধান অধ্যক্ষের পদে তিনি উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সঙ্গে ইংরেজী ও বাঙ্গালা স্কুল সমূহের সহকারী ইন্‌সপেক্‌টরের পদও তিনি পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত শিক্ষা-প্রণালীর এক সুন্দর রিপোর্ট লিখিয়া, রিপোর্টে প্রকারান্তরে সংস্কৃত গ্রন্থা-বলীর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার উচ্চ প্রতিষ্ঠা; সেই প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁহার এই অভাবনীয় উন্নতি। কিন্তু এ চাকরি তাঁহার অধিকদিন রহিল না; সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন ডিরেক্‌টর গর্ডন সাহেবের সহিত তাঁহার মনোবাদ হওয়ার ফলে, এক কথায় তিনি সেই পাঁচশত টাকা বেতনের উচ্চপদ ত্যাগ করিলেন। কলেজের ছাত্রগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবে, ডিরেক্‌টরের সহিত একমত হইতে না পারায়, তেজস্বী বিদ্যাসাগরের এই চাকরিত্যাগ। সকল অবস্থাতেই স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর—সকলের এক সোপান উচ্চে। বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বুঝাইলেন, একটু মিলিয়া মিশিয়া থাকিয়া কাজটা বজায় রাখিতে বলিলেন,—'অবস্থাবিপর্য্যয়ে কখন কি হয় বলা যায় না' ইত্যাদি সাংসারিক নীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যৎ ভাবিতেও একটু পরামর্শ দিলেন,—কিন্তু সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষসিংহ অচল অটল; গম্ভীরস্বরে এই ভাবে উত্তর দিলেন,—'বামুনের ছেলে, ছেলেবেলা থেকে সকল কষ্টেই অভ্যস্ত আছি,—পাঁচশত কি—মাসিক পাঁচ টাকাতেও আমি দিন চালাইতে পারিব। এক সন্ধ্যা খাইলেও আমার কষ্ট নাই। আমার বাবা যখন তাঁর সেই সামান্য আয়ে আমাদের এই এতগুলিকে মানুষ করিতে পারিয়াছেন, তখন আমি এই জুয়ান বয়সে তাঁহার সেই পাঠ বজায় রাখিতে পারিব না? তবে আর এ মাথামুণ্ড লেখাপড়া শেখার ফল কি হইল? না, যখন মন ভাঙ্গিয়াছে, তখন আর ও কাজে আমি নই, পাঁচ শ ছেড়ে হাজার 'দিলেও নই।' তেজস্বী ত্যাগীর এই প্রতিজ্ঞায়, এই পুরুষোচিত দৃঢ়তায়,—দৈব সহায় হইলেন। তাঁহার অদৃষ্টের গতি ফিরিল। অদৃষ্ট-বিধাতা তাঁহাকে আর এক উচ্চপথে আনিলেন। দেশের সেবায়, দশের কাজে তাঁহাকে বরণ করিলেন। আহার ঔষধ তাঁহাকে দুইই দিলেন। একাধারে সাহিত্যসেবা, সমাজসেবা, সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যে বিদ্যাসাগরের সেই মহতী

প্রতিভা নিয়োজিত হইল। ১২৬৫ সালের ১৯শে কার্ত্তিক এই শুভসংযোগ ঘটিল।

বিদ্যাসাগর চাকরিও ত্যাগ করিলেন, আর তাঁহার অনুপম গ্রন্থগুলিও একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সে সকল গ্রন্থের সকলগুলিই স্কুলপাঠ্য হইল,—গ্রন্থের আয় তাঁহার নিজের অভাব ছাড়াইয়া অনেকের অনেক অভাব মোচন করিতে লাগিল। ঈশ্বরজানিত মহাত্মারা একাকী খাইতে পরিতে সংসারে আসেন না,—পাঁচজনকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়া টাকার 'হরিনুট' দিয়া চলিয়া যান—সঞ্চয় তাঁহাদের কোষ্ঠীতে নাই। ভাগ্যবান্ বিদ্যাসাগর অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জলের মত অকাতরে তাহা পরসেবায় ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। দুর্ভিক্ষে, অন্নসত্রে, হাসপাতালে, স্কুলপাঠশালে, বিপন্নের বিপদুদ্ধারে, তাঁহার সেই অগণিত অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার সেই অক্ষয়পুণ্যের বুঝি তুলনা নাই। তাঁহার সুবিখ্যাত 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী' ও গ্রন্থের আয় যে কত ছিল, তাহার হিসাব নাই।

রাজার মত সম্ভ্রম, দেশজোড়া নাম ও মান, সর্ব্বত্র খাতির ও প্রতিপত্তি—ভাগ্যবান্ লোকশিক্ষক বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি এইবার দেশের ছেলেদের প্রতি পড়িল। দেশীয় ছাত্রগণ অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে দেশীয় ভাবে দেশীয় লোকের স্কুলে ইংরেজী পাঠ করে, এই শুভ ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে বলবতী হইল; তাহার ফলে তাঁহার সুবিখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কলেজ—'মেট্রোপলিটনের' প্রতিষ্ঠা। ইংরেজী ১৮৬৪ সালে তাঁহার এ শুভকার্য্য সংঘটিত হয়।

বিধবাবিবাহে তাঁহার সহিত আমাদের মতের অনৈক্য থাক্,—প্রধানতঃ দয়ার বশে সেই দয়ার্দ্রহৃদয় মহাত্মা যে এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ তাঁহারই আন্তরিক যত্নের ফলে, ১২৬৩ সালের ১২ই শ্রাবণ, ইহা রাজ-আইনের অন্তর্ভূত হয়। এই বিধবাবিবাহের আবেদন-পত্রে এক সহস্র লোকের স্বাক্ষর ছিল। হিন্দুসমাজের তদানীন্তন নেতৃ-স্থানীয় মাননীয় রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ৩৬৭৬৩ জনের স্বাক্ষর ইহার প্রতিকূল আবেদনপত্রে ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর-দলেরই জয় হইল। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজকর্তৃক এজন্য বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইতে

হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ও এইরূপ—কি ইহা অপেক্ষাও অধিকরূপ লাঞ্ছনাভোগ করিয়া গিয়াছিলেন।

এ হেন বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবন কিন্তু তেমন শান্তিপ্রদ ও সুশৃঙ্খল ছিল না। সে সব কথা সবিশেষ উল্লেখের এখনও ঠিক সময় আসে নাই। কেবলমাত্র একটা কথা বলিব। এক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়িত, তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন। সে সময় তাঁহার 'সংস্কৃত প্রেস' ছাপাখানা লইয়া বুঝি তাঁর ভ্রাতাদের সহিত কি একটু মনান্তরের স্থচনা হইয়াছে। সেই কথার উল্লেখ করিয়া স্নেহপ্রবণ কোমল-হৃদয় বিদ্যাসাগর অতি কাতরভাবে গদগদস্বরে তাঁহার এক বন্ধুকে এই মর্ম্মে বলিলেন, "দেখ, কথামালায় আমি যে সেই 'অশ্ব ও বৃদ্ধের' গল্প লিখিয়া-ছিলাম,—জীবনক্ষেত্রে দেখিতেছি, আমি নিজেই সেই বৃদ্ধ—এত ত্যাগ-স্বীকার করিয়াও আমি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না।"—মহাত্মার এই খেদবাণী যখন প্রথম পড়ি, তখন আমাদের চোখে জল আসিয়াছিল। যে মহাত্মার জীবনব্যাপী কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতা, প্রতিকূল ঘটনার সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, নিঃস্বার্থ দয়ায়—কত সহস্র সহস্র লোক তাঁহার উপাসক ও ভক্ত, সেই মহৎ জীবনেরও এই মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা—সে হিসাবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা,—আমাদের আক্ষেপ ও মর্ম্মব্যথা কত টুকু? সেই দিন হইতেই যেন মনে স্পষ্টই জাগরূক হইল,—এক ভগবৎ-পাদপদ্ম আশ্রয় ভিন্ন, মানবের নির্ম্মলা শান্তি আর কিছুতেই আসিতে পারে না। লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া, পরদুঃখমোচনে যিনি নিঃস্বার্থভাবে তাহা ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন,—নিজের ভোগবিলাসের মধ্যে—প্রায় এক-বেলা দুটি আহার, থান কাপড়, চটী জুতা, থেলো হুঁকা—অথবা এমনি ব্যয়-সাধ্য আয়োজন,—তাঁহার মত লোকের সহিতও সামান্য একটা ছাপাখানার স্বত্বস্বামিত্বের খুটনাটী লইয়া ভ্রাতাদের সহিত মনোবাদ! হায় নিষ্ঠুর জ্ঞাতিবিরোধ! তুমি এই সোণার ভারত ছারখার করিতেছ! কত কাল হইতে যে তোমার এই অমোঘ প্রভাব, তা তুমিই জানো। সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগ হইতেই ত তোমার এ অলঙ্ঘ্য আধিপত্য দেখিতে পাই! কোথায় রামের রাজ্যাভিষেক, কোথায় তাঁর জটাবল্কল পরিয়া বনগমন।

আর কুরুক্ষেত্রের রণ,—তার ত কথাই ন লের মূলেই এই জ্ঞাতি-হিংসারই পূর্ণ প্রভাব। তাই একবার আমার মনে হয়, ইংরেজের প্রথায় আমাদের গৃহজীবন আরম্ভ করিলে কি হয়? সে ইংরেজী প্রথায় সংসার-ধর্ম্মে, আর সহস্র দোষ বা অভাব অসুবিধা থাক্‌,—এ বালাই নাই। এ ভীষণ জ্ঞাতিবিরোধিতা নাই। এ মর্ম্মচ্ছেদকর কষ্ট,—বিধাতার নিষ্ঠুর অভিসম্পাৎ নাই। অথবা, সে প্রথায়, ইহা ঘটিবার অবসরই পায় না।—একবার ঈশ্বরের এ শাপমোচনের চেষ্টা দেখিলে হয় না?—ঐ রাজার জাতির গৃহ-জীবনের আদর্শ লইয়া?

সখের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা সখ্‌ ছিল—বইয়ের সখ্‌। রাজ্যের যেথায় যে ভাল বই খানি পাইতেন, যত টাকায় হোক তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, আবার এক টাকার বই হয়ত দু'টাকা দিয়া বাঁধাইতেন, আল্‌মারিতে সাজাইতেন, আর প্রফুল্লমনে তাহা নাড়িতেন চাড়িতেন, গুছাইতেন; সে সজ্জিত আল্‌মারি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। একজন বড়মানুষ লোক একবার তাঁর এই লাইব্রেরী দেখিতে যান। দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হন। কিন্তু বলেন, "মশাই, একটা বড় রহস্য দেখিতেছি,—আপনার বইয়ের চেয়ে বই বাঁধানোর খরচা বেশী দেখিতেছি—কেন এমন মশাই?" উত্তরে পরিহাসপটু মহাত্মা বলিলেন, "তুমি এই এত টাকা দামের শালখানা গায়ে দিয়ে এসেছ কেন? শীত নিবারণই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে ত একখানা মোটা কম্বল গায়ে দিলেও চলিত!" বলা বাহুল্য, তখন শীতকাল। উত্তর শুনিয়া লোকটি কিছু অপ্রতিভ হইলেন।

আবার এদিকে ত এত দান ও সদাব্রত, কিন্তু সেই সঙ্গে মহাত্মার মিত-ব্যয়িতারও একটা সংবাদ শুনুন। একদিন অন্দর হইতে তিনি আসিতেছেন, দেখিতে পাইলেন, একটি পরিচারিকা বাট্‌না বাটিয়া শিল ধুইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু তখনও সেই শিলে কিছু বাট্‌না ছিল। তাহা দেখিয়া তিনি সেই পরিচারিকাকে বলিলেন, "ওরে, এর মধ্যে শিলটা ধুলি কেন? ওতে যে এখনো বাট্‌না রোয়েছে? ও-টুকু ত কাউকে দিতে পার্‌তিস্‌?" পরিচারিকা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "বাবার ত দেখি—রাজারাজ্‌ড়ার মত দান খয়রাৎ, আবার এদিকে কোথায় একটু বাট্‌না শিলে পোড়ে আছে,

তাতেও ওঁর দৃষ্টি প'ড়েছে।' "আমি তা বোল্‌চিনে রে, বাটনাটুকু তুই নষ্ট কর্‌লি কেন?—কাউকে ত দিতে পার্‌তিস?"—বুঝুন, পরদুঃখকাতর হৃদয়ে, অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও কি তীক্ষ্ণদৃষ্টি!

আর একটি সমবেদনার স্বর্গীয় ছবি দেখুন। একদিন এক দ্বারবান কোথা হইতে একখানি পত্র লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল; তিনি তখন উপরে ছিলেন বলিয়া দিতে পারে নাই; বোধ হয় তাঁহার হাতে দিয়া জবাব লইয়া যাইবে বলিয়া চাকরদের দিয়া ঐ চিঠি পাঠায় নাই। তখন গ্রীষ্মকাল, প্রখর রৌদ্র। দ্বারবান ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া নীচের একখানি বেঞ্চে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মহাত্মা সেই সময় নিম্নে নামিয়া আসিয়া তাহা দেখিলেন। স্ব-নামে লিখিত চিঠিখানি দেখিয়া পাঠ করিলেন। নিদ্রিত দ্বারবানকে আর জাগাইলেন না। না জাগাইয়া হস্তস্থিত পাখা দিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার একটি বন্ধু সেখানে আসিয়া এ দৃশ্য দেখিলেন। একটু কৌতুহলী হইয়া বলিলেন, "একি! আপনি নিজে একে বাতাস ক'চ্ছেন?" "কেন, দোষ কি? ইহাতে হইয়াছে কি বল? দেখিতেছি, এর গলায় পৈতা;—বোধ হয় তেওয়ারী ব্রাহ্মণ; মাহিনাও বোধ হয় সাত আট টাকা। জাত্যংশে ছোট নয়। আমার বাবাও ত একদিন এই মাহিনা পাইয়া আমাদিগকে মানুষ করিয়া গিয়াছেন।" উত্তর শুনিয়া বন্ধু চমকিত হইলেন। বুঝিলেন, মহত্ত্ব ও সমবেদনা কাহাকে বলে!

এমন শত শত বিষয়ে, মহাত্মা বিদ্যাসাগরের হৃদয় ও মন কি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট, ভাবিলেও চ'খে জল আসে। আর একদিন তিনি এক দরিদ্র ও নিরাশ্রয়—রাজপথে পতিত—কলেরা রোগগ্রস্ত ঝাঁকা-মুটেকে নিজের বুকে তুলিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন এবং ঔষধ ও পথ্য দিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।—এ গ্রন্থে প্রধানতঃ আমরা মহাত্মা বিদ্যাসাগরের সাহিত্যজীবন আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নচেৎ তাঁহার এই দেবোপম দয়ার্দ্র জীবনের এরূপ এবং আরো অনেকরূপ অপূর্ব্ব চরিতকথাও লিখিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচিত হয়। উপস্থিত কেবলমাত্র তাঁহার মাতৃভক্তির একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমরা তাঁহার গ্রন্থালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

একবার তাঁহার বীরসিংহের বাটীতে কা'র বিবাহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃদেবী বলিয়া দিয়াছিলেন, 'এ বিবাহে তোকে আসিতে হ'বে। হাজার কর্ম্ম থাক্, আসিস্—না হ'লে আমি মনে ব্যথা পাব।' মাতৃভক্ত মহাত্মা 'আচ্ছা মা' বলিয়া মাতৃবাক্য পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি চাক্‌রিতে আছেন। তা হোক চাকরি, যখন মাকে কথা দিয়াছেন, তখন যেরূপে হোক, বিবাহের দিন তাঁহাকে বাটী পঁহুছিতেই হইবে। অনেক পীড়াপীড়িতে ছুটী মঞ্জুর করিয়া—এমন কি ছুটী না পাইলে হয়ত তিনি কাজে ইস্তফা দিতেন—এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্তে ছুটী লইয়া,—তিনি দেশে রওনা হইলেন। তাঁহার বাটীর অল্প দুরেই দামোদর নদ। নৌকা করিয়া সেই দামোদর পার হইতে হয়। খেয়াঘাটে গিয়া দেখিলেন, পারের নৌকা নাই। তখন রাত্রিকাল। আকাশে একটু দুর্য্যোগ হইয়াছিল। দামোদরে তখন বড় খরস্রোত। নৌকা নাই অথচ সেই খরস্রোত দামোদর পার হইতেই হইবে, কেন না বিবাহের সময় নিকটবর্ত্তী। অনন্যো-পায় হইয়া বিদ্যাসাগর ভাবিতে লাগিলেন,—'কিরূপে এই দুরন্ত দামোদর পার হই।' কিন্তু বৃথা ভাবনায় ত ফল নাই, কেবল সময় নষ্ট হইতেছে মাত্র। অথচ পারে তাঁহাকে যাইতেই হইবে, কেন না মাতৃআজ্ঞা, আর তিনি নিজেও মার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অমনি মাতৃমূর্ত্তি মনে পড়িল। মাতৃভক্ত মহাত্মা মা'র শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিলেন। বুকে অসীম সাহস ও সিংহবল আসিল। অকুতোভয়, নির্ভীক বিদ্যাসাগর সেই দুর্য্যোগময়ী রজনীতে চঞ্চল-হৃদয়ে, একাকী সেই নির্জ্জন দামোদর তীরে দাঁড়াইয়া। কিরূপে পার হইব এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন,—আর ভাবিলেন না। অথবা ভাবিলেন, তাঁর ইহ-জগতের প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরী মার পা দু'খানি।—ভাবিতে ভাবিতে 'জয় মা' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন।—দামোদরের সেই প্রবল তরঙ্গ মাতৃভক্তের গতিরোধ করিতে পারিল না—সন্তরণপটু বলশালী বিদ্যাসাগর অল্প-আয়াসে পারে গিয়া উঠিলেন,—প্রান্তর পার হইয়া সেই আর্দ্রবস্ত্রে হাসিতে হাসিতে বাটীর দ্বারদেশে পঁহুছিলেন; সেই খান হইতে আনন্দে ডাকিতে ডাকিতে গৃহ-প্রবেশ করিলেন,—'মা! মা! আমি এসেছি।'—'বাবা, বাবা, তুই এমনি অবস্থায়—একি!" মাতাপুত্রের সেই স্নেহভক্তির অশ্রুজলে ও

গদগদ সম্ভাষণে—দামোদর পারের বিভীষিকা বা কষ্ট—স্বর্গসুখে পরিণত হইল। এমন অনুপম মাতৃভক্তি যাঁহার হৃদয়ে, তিনি জগৎ-বরেণ্য ও ঈশ্বরজানিত মহাত্মা হইবেন না ত কি—তুমি আমি হইব?

এইবার মাতৃভক্ত মহাত্মার মাতৃভাষা আলেচনার কথা। এমন স্নেহ-প্রবণ দয়ার্দ্র হৃদয় যাঁর, তাঁর ভাষাও কেমন হইতে পারে, তাহাও কি আবার খুলিয়া বলিতে হয়? আশা করি, আমাদের এ 'শাদার পিঠে কালি' দিবার পূর্ব্বেই, সহৃদয় পাঠক তাহা কল্পনার নেত্রে অবলোকন করিয়াছেন। অথবা বিদ্যাসাগরের ভাষা, এ বাঙ্গালায় না পড়িয়াছে কে? এমন বাঙ্গালী ত দেখিতে পাই না। এ প্রস্তাবের পূর্ব্ব প্রস্তাব হইতে আমরা বিদ্যাসাগরের ভাষা আলোচনা করিয়া আসিতেছি;—তাঁহার মহনীয় চরিতকথার অমৃতাস্বাদের লোভ একেবারে সংবরণ করিতে না পারিয়া এতক্ষণ দু'একটা অবান্তর কথা বলিতেছিলাম মাত্র। পরন্তু এরূপ আলোচনারও এ ক্ষেত্রে একটু প্রয়োজন আছে, বিজ্ঞপাঠক মাত্রেই তাহার অনুমোদন করিবেন।

তারাশঙ্করের 'কাদম্বরীর' 'ভাষার পর হইতে বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রাদুর্ভাব, তাহা বলিয়াছি। বলিয়াছি যে, অক্ষয়কুমার—চিন্তা ও ভাবুকতায় সৌভাগ্যশালী হইলেও, ভাষার সরসতায় ও কমনীয়তায় তিনি বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ নন, এ অংশে তিনি বিদ্যাসাগরের এক সোপান নিম্নে অবস্থিত। এখন, বিদ্যাসাগরের সেই কমনীয় ভাষার পূর্ণবিকাশ—তাঁহার প্রায় সকল গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইস্তক তাঁহার সেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থিতির সময়ে তাঁহার সেই প্রথম যৌবনের 'বাসুদেব-চরিত' হইতে—পরিণত বয়সে লিখিত বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি প্রায় সকল গ্রন্থেই এই ভাষার সরলতা, মধুরতা ও কমনীয়তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ তাঁহার করুণরসের মূর্ত্তিমতী ছবি—সীতার বনবাস এ বিষয়ে অতুল্য। সেই সীতাচরিতের শেষদৃশ্যটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল;—

"রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি, স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া, সীতা, লব, কুশ ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যবহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম

হইল। অতি কষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগ-সংবরণে সমর্থ হইলেন; এবং না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি আসন-পরিগ্রহ না করিয়াই, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাদেশীয় নৃপতিগণ, কোশলরাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌর জনপদগণ সমবেত হইয়াছ, তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে চঞ্চলচিত্ত হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমি তোমাদের সকলকে এই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে তোমরা প্রশস্তমনে অনুমোদন প্রদর্শন কর; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারিণী, তদ্বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।"

সাধু সুষ্ঠ ভাষায় এরূপ—ভাবের গাঢ়তা ও রচনার প্রাঞ্জলতা, ভিক্টোরিয়া-যুগের পূর্ব্বে পরিদৃষ্ট হয় নাই। গম্ভীর বিষয়ে লেখনী পরিচালিত করিতে হইলে, এখনও এই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষাকে অনেক স্থলে অবলম্বন করিতে হয়। তবে যিনি প্রতিভাবান্, অথবা কোন নূতন ভাবে জীবনকে গঠন করিয়াছেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি কাহারও ভাষা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করেন না,—তিনি নিজেই নিজের আদর্শ। তাঁহার রচনাভঙ্গির আদ্যন্তই তাঁহার নিজস্ব। সেরূপ নিজস্ব সকলেরই একটু থাকা উচিত,—নচেৎ ভাষার বৈচিত্র্য বা ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না।

এক দিকে এই সীতার বনবাস, আর এক দিকে বেতালপঁচিশ; মধ্যে শকুন্তলা, সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, বিধবাবিবাহ-বিচার প্রভৃতি এবং শিশুপাঠ্য আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী, কথামালা, বোধোদয় আদি নীতি-পুস্তক—সকল গ্রন্থের ভাষাই এক ছাঁচে ঢালা,—সুস্পষ্ট, সরল, শুদ্ধ ও সমধিক প্রসাদগুণ সম্পন্ন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' হইতে এক স্থান একটু উদ্ধৃত করিলাম;—

"যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয়পয়োধিজলে লীন হইলে, মীনরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন; যিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ

করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন; যিনি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখরকুলিশ প্রহার-দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন; যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন;"—* * *

পাঠক দেখিবেন, বঙ্গসাহিত্য-গুরু বিদ্যাসাগরের গুরুগম্ভীর রচনার কেমন অভিনব ভঙ্গি! মিশনরী বাঙ্গালা, মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালা—এমন কি, 'কাদম্বরীর' বাঙ্গালা—কি ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে? তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিব, এখনও ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থ-পাঠের প্রচলন হইল না। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট মান্য করিয়া চলিলেও এবং তাঁহার লেখা অতি উত্তম বলিলেও, সাধ করিয়া, অধ্যয়নের হিসাবে, কেহ তাহা পড়িতেন কিনা সন্দেহ। বড় জোর তাঁহার বিধবা-বিবাহের যুক্তি দেখিতে অথবা বহুবিবাহের অযৌক্তিকতা দেখিতে বইগুলি নাড়াচাড়া করিতেন—ভাষাশিক্ষার জন্য বা রচনার আদর্শগ্রহণ হিসাবে উহা অধ্যয়ন করিতেন না। কথিত 'শিক্ষিত' বাঙ্গালী তখনও বাঙ্গালা লেখা বা বাঙ্গালা পড়া অপমানকর বোধ করিতেন। তবে স্কুলের ছেলেদের বাঙ্গালা পড়াইতে হইলে—অক্ষয়কুমার বা বিদ্যাসাগর বৈ আর গতি নাই, সেই হিসাবে তাঁহারা স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের যা একটু খোঁজ-খবর রাখিতেন—এই মাত্র। যা হোক, এই দুই প্রতিভাবান্ সাহিত্যসেবীর বাঙ্গালা রচনা হইতে যে বাঙ্গালীর ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল,—তাহাদের জাতীয় জীবন যে তাহারা একটু একটু দেখিতে শিখিল, সে বিষয় সন্দেহ নাই। কেন না, তখন দেশে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রভাবও ধীরে ধীরে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। দেশ দেশান্তরের সংবাদ পড়িবার লোভে ও রাজা প্রজার সম্বন্ধ ও অধিকার বুঝিবার আশায়,—জনসাধারণের মধ্যে একটু একটু করিয়া বাঙ্গালা পাঠের প্রচলন হইতেছে। ঠিক এই সময়ে প্যারিচাঁদের আবির্ভাব।

প্যারিচাঁদ, কালীপ্রসন্ন ও ভূদেব।

প্যারিচাঁদ মিত্র অথবা টেকচাঁদ ঠাকুরের জন্মস্থান— কলিকাতা নিমতলা। সন ১২২১ সালে ইহাঁর জন্ম। পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ইনি প্রথমে ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান ছিলেন, শেষে লাইব্রেরীয়ান ও সেক্রেটারীর পদ পান। এখান হইতেই ইহাঁর মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ। তাহার ফলে—'আলালের ঘরের দুলাল' 'অভেদী', 'রামারঞ্জিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন। সরকারী কার্য্য ইনি স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। ১২৯০ সালে ইনি পরলোকগমন করেন।

'আলালী' ভাষার পরিচয় ও তাহার একটু নমুনা ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। সঙ্গীতেও প্যারিচাঁদের অনুরাগ ছিল। ইহাঁর পিতার আবার এ গুণটি বিশেষ ছিল। কয়েকটি সাধনসঙ্গীতে প্যারিচাঁদের উচ্চ ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বিপদ কে বলে বিপদ। বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ।"

এই অংশটুকুই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্যারিচাঁদ সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিম বাবু যাহা বলিয়াছেন, আমাদের মতও প্রায় সেইরূপ। 'প্রায়' বলিবার একটু কারণ আছে, পরে বলিতেছি। প্যারিচাঁদ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বলেন ;—

"যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বঙ্গভাষার চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না, সন্দেহ। উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে যাহা দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে;—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না।"

কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে, বঙ্কিমবাবুর এই সমালোচনারও একটু সমালোচনা করিতে হইল। 'পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্ট' বলিয়া যে তিনি বঙ্গভাষার আচার্য্যস্থানীয় মহাত্মাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, এটিতে আমরা নই,—এরূপ অবজ্ঞাসূচক কটাক্ষের পোষকতা ত করিই না, অধিকন্তু ইহার ঘোর বিরোধী। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারপ্রমুখ সাহিত্য-রথীদের বাঙ্গালা ভাষা যে উপেক্ষার জিনিস নয়,—পরন্তু তাহা বিশেষরূপে উপভোগ্য, পূর্ব্বপ্রস্তাবে বিশদভাবে তাহা বলিয়াছি। সুতরাং বঙ্কিমবাবুর ওরূপ কটাক্ষ আমাদের নিকট কিছু কষ্টকর বোধ হয়। এমনও মনে হয়, মিশনরী বাঙ্গালা ও মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালার জীর্ণ কঙ্কাল লইয়া তাঁহারা যে অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন হয় না। অমন দেব-আশীর্ব্বাদে কটাক্ষ বা অবজ্ঞা করিতে নাই। বঙ্কিম বাবুর পরম ভক্ত হইয়াও, সত্যের অনুরোধে, উপস্থিত আমরা এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। প্রথম যৌবনে, উঠ্‌তি বয়সে এ মত আমাদের ছিল না বটে, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় এখন সে মত বদ্‌লাইয়াছে। এখন বুঝিয়াছি পূর্ব্বপুরুষদের দান বা সম্পত্তি যতই সামান্য হউক,—তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবেই ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যায়। হই না কেন আমরা যত বড়ই কীর্ত্তিমান্‌,—থাকুক না কেন আমাদের যত অসীম শক্তি সামর্থ্য,—তবুও পূর্ব্বপুরুষদের কিছু-না-কিছু ভাব আমাদের মধ্যে আছে ;—এই টুকু বুঝিয়া আমাদের চলা উচিত। তাহা হইলে আর বেতালে পা পড়ে না —বেফাস কথা মুখে বাহির হইয়া প্রকৃত গুণজ্ঞ লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয় না। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার ত মাথার মণি,—তারাশঙ্কর, মৃত্যুঞ্জয়, মিশনরী সাহেব সম্প্রদায়,—ইহাঁরা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাজন। কেননা, ইহাঁরাই এক দিন বাঙ্গালা ভাষা রাখিয়াছিলেন। অধিক কি, যে বটতলার নামে লোকে নাসিকা কুঞ্চিত করে, সে বটতলার নিকটও আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যেহেতু, এই বটতলাই এতকাল কীর্ত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলীর অনুপম আদর্শ নরোত্তম দাসের 'প্রার্থনা' প্রভৃতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং উপেক্ষা ত আমরা কাহাকেই করি না,—বরং ছাই দেখিলেও খুঁজি,—যদি তাহার ভিতর কোন 'লুকান রত্ন' থাকে।

প্যারিচাঁদের পর স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কথা মনে হয়। তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচা' সাময়িক নক্‌সা হইলেও, তাহাতে তদানীন্তন সমাজের কথা, সহরের অনেক গুহ্যকাহিনী বর্ণিত আছে। তাহাতেও এক শ্রেণীর লোকের চক্ষু ফুটিতে পারে। কিন্তু সিংহ মহোদয়ের নাম সেজন্য নয়, তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি—মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। এই অষ্টাদশপর্ব্ব বঙ্গানুবাদ মহাভারতই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বিস্তর অর্থ ব্যয়ে ও বহু পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি এই অসাধ্যসাধন করিয়া বঙ্গের ভূস্বামীবৃন্দের আদর্শস্থানীয় হইয়া গিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বিতরণ করেন বটে, কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের ভারতই সমধিক প্রসিদ্ধ ; ভাষার প্রাঞ্জলতাও এই গ্রন্থের অধিক।

কালীপ্রসন্ন ভাষা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক। যাহা এক্ষণে

থিয়েটারের নাটকে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—গিরিশী ছন্দ বলিয়া সাধারণতঃ যাহার প্রচার,—স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় যাঁহার আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা এই সিংহ মহাশয়েরই প্রবর্ত্তিত। কিন্তু তাহা ঐ প্রবর্ত্তন মাত্র;—ইহার সাধনা ও সিদ্ধি রাজকৃষ্ণ বাবু ও গিরিশ বাবু দ্বারাই হইয়াছে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ভাঙ্গা নয়, তাহা পুরাপূরি চৌদ্দ অক্ষরে। চৌদ্দ অক্ষরে উহার এক একটি ছত্র—অবশ্য পরছত্রে—কি তাহারও পর-ছত্রে প্রয়োজনমত টান্ থাকে। টান্ থাক, তাহা কিন্তু ভাঙ্গা নয়,—পাঠের পক্ষে সুবিধাকর। সিংহ মহোদয়ের প্রবর্ত্তিত—তথা রাজকৃষ্ণ-গিরিশ-পরিপুষ্ট ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর বা 'ইচ্ছাবতী ছন্দ' - থিয়েটারের নাটকেই সাজে, অভিনয়েই তাহার বাহার খুলে, পড়িতে ভাল লাগে না। সেই জন্যই বোধ হয়, গিরিশ বাবুর অমন কবিত্বপূর্ণ—চিন্তা ও সদ্ভাবপূর্ণ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক—বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে দক্ষতার সহিত অভিনীত হইলেও থিয়েটার-ভক্ত ভিন্ন সাধারণ পাঠকসমাজে তেমন নাম পায় নাই, তেমন আগ্রহ সহকারে লোকে উহা পড়ে না। ইহা অবশ্যই দুঃখের কথা, সন্দেহ নাই। এ কথা বোধ হয় গিরিশবাবুও জানেন। সিংহ মহোদয়ের সেই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের নমুনাটুকু এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসের রঙ্গে, চিত্রিনু চরিত্র—
দেবী সরস্বতীর বরে। কৃপা-চক্ষে হের
একবার, শেষে বিবেচনা মতে যার
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে, বহুমানে
লব শির পাতি।"

কলিকাতা যোড়াসাঁকোর সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে কালীপ্রসন্নের জন্ম। ইহাঁরা জমিদার। ইহাঁর প্রপিতামহের নাম শান্তিরাম সিংহ; পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী তিন ভাষাতেই কালীপ্রসন্ন ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বঙ্গানুবাদ মহাভারত, বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত করিয়া ইনি অতুল যশস্বী হন।

(৩) কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহাঁর সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব লেখাই যুক্তিযুক্ত।

এইবার ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা। ভূদেব দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান। কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যাহাকে বলে, তাহা ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণেই ছিল। ভূদেবের পিতৃদেব বিশ্বনাথ তর্কভূষণ একজন নির্লোভ, তেজস্বী, আচারবান্ অধ্যাপক ছিলেন। ভূদেবের শিক্ষা দীক্ষা তাঁহারই আদর্শে হইয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইলেও তাঁহার মেজাজ বিগ্‌ড়ায় নাই। ভূদেবের সেই তপ্তকাঞ্চননিভ গৌরবরণ, সেই দীর্ঘায়তন উন্নতবপু, সেই বিশালবক্ষঃ, সেই সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুসংযুক্ত শান্তমূর্ত্তি স্মরণ করিলে, অতীত যুগের ঋষিদের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, মহাত্মা ভূদেব যেন এই ঘোর কলিতে, প্রকৃত আর্য্যনাম রক্ষা করিবার জন্য সংসারে আসিয়াছিলেন এবং যতটুকু সাধ্য—অর্থে, সামর্থ্যে, আচারে, উপদেশে, অনুষ্ঠানে, এবং আত্মবিসর্জ্জনে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। আট টাকা মাহিনার ছেলে-পড়ানোর কাজ হইতে দেড় হাজার টাকা মাসিক বেতনে তিনি যে স্কুল-ইন্‌সপেক্‌টারের উচ্চপদ পাইয়াছিলেন, সকল অবস্থাতেই তাঁহার সেই শান্তস্বভাব ও বিনীতভাব প্রকাশ পাইত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন,—"জ্ঞানীর দুটি লক্ষণ; প্রথম শান্ত-স্বভাব, দ্বিতীয়—নিরহঙ্কারের ভাব।" ভূদেবের জীবনে এ দুটি ভাবই ছিল। প্রকৃতই তিনি জ্ঞানী ছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকবার আমরা এ মহাত্মার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। প্রত্যেকবারের আলাপেই দেখিয়াছি, ঠাকুরের ঐ অমৃতময়ী উক্তি,—ভূদেবের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে; প্রকৃতই তিনি শান্ত ও নিরহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। বয়সে আমরা তাঁহার পৌত্রের সমান, বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছুই নয় বলিলেই হয়, তথাপি সেই সৌম্য শান্ত ঋষিতুল্য ভূদেব, ধর্ম্মবিষয়ে ঠিক সমবয়স্কের ন্যায় আমাদের সহিত কথা কহিতেন,—একটুকু বৈলক্ষণ্য বা আত্মপ্রাধান্য দেখাইয়া আমাদিগকে দাবাইবার চেষ্টা করেন নাই। মহাত্মার একটি কথা আজিও বেশ মনে আছে। আধুনিক বঙ্গসমাজের নির্জ্জীবতার লক্ষণ দেখাইয়া এই মর্ম্মে তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "এখন আর বৈষ্ণবের নিরীহভাব লইয়া

সংসারধর্ম্ম করিলে, এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনে একরূপ অস্তিত্বই থাকিবে না, সমাজের এখন শক্তি-উপাসক হওয়াই সঙ্গত।"—ইত্যাদি। মূঢ়বুদ্ধি তখন আমাদের. বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তখন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিমলধর্ম্মের অমৃত-আস্বাদ উপভোগ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, কিংবা সেই দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্য ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমৃতময় উপদেশ হৃদয় মন অধিকার করে নাই; এখনও যে সম্যক করিয়াছে, সে অহঙ্কার করিতেছি না, তবে সত্য বলিব, পাশ্চাত্যজগতের পরমপূজ্য প্রেমাবতার খৃষ্টই তখন আমাদের মহান্ আদর্শ ছিল;—তাই সেই মহাপুরুষের দোহাই দিয়া বলিলাম, "মহাশয় এমন অনুমতি করিতেছেন কেন? খৃষ্টের মত সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশক্তি লাভ করা কি মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য নয়?" ভূদেববাবু স্মিতমুখে বলিলেন, 'খৃষ্ট একটি সরল বালকমাত্র, চৈতন্যও তাই, ঐরূপ সরল স্বর্গীয় বালকের আদর্শে সমাজধর্ম্ম টিকিতে পারে না।" বোধ হয় তখন একটু উত্তেজিত হইয়া থাকিব, অভিমানেও কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিয়াছিল মনে হইতেছে; তাই একটু রুক্ষভাবে বলিয়া ফেলিলাম, "হাঁ, বালক বটে, কিন্তু এমন বালক যে, ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতে করিতেও প্রাণহন্তা শত্রুগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন,—"Father! forgive them, they know not what they do."——মহানুভব মহাত্মা যেন একটু চমৎকৃত হইয়া বড় আনন্দ-মূর্ত্তিতে বলিলেন, "বাঃ! বড় সুন্দর জবাব দিলে ত হে? কথাটা ত অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এমন ভাবে ত কখন আকৃষ্ট হই নাই?" পার্শ্বে তাঁহার এক পুত্র (বোধ হয় মুকুন্দ বাবু হইবেন) দাঁড়াইয়াছিলেন, উৎসাহভরে তাঁহাকে কহিলেন, "আজিকার আমাদের এই conversationটা নোট করিয়া রাখত, সময়ান্তরে কথাটার আলোচনা করিব।"—নিজের বড়াই করিবার জন্য অতকালের একটা কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি না,—ভূদেবের মহত্ত্ব ও নিরহঙ্কারের ভাব দেখাইতে গিয়া, কথাটা যেন আপনা হইতে আসিয়া পড়িল। ভাবুন দেখি, অত বড় একটা পণ্ডিত, জ্ঞানী, দেশমান্য, লক্ষপতি, রাজসম্মানিত ব্যক্তি,—(ভূদেব বাবু তখন C. I. E. উপাধি পাইয়াছেন।) আমাদের ন্যায় সামান্য এক ব্যক্তির সহিত কেমন সম-

যোগ্য বন্ধুর ন্যায় কথা কহিলেন, কতটা উদারতা দেখাইলেন, কিরূপে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন! বলা বাহুল্য, তখন এ শিক্ষা পাই নাই যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা শাক্তধর্ম্ম মূলতঃ এক,—যেই কালী সেই কৃষ্ণ,—কেবল পথ ভিন্ন। গুরুকৃপায় এখন যেন ক্রমেই বুঝিতেছি, মহাত্মা খৃষ্টও যেন শ্রীগৌরাঙ্গেরই আর এক রূপ, কেবল দেশকালভেদে তাঁর আর এক মূর্ত্তি, আর একরূপ কার্য্য।

অল্পজলে সফরীর ন্যায় ভূদেব কখন আত্মপদমর্য্যাদা বা বিদ্যার গরিমা দেখাইতেন না,—চিরদিনই গুপ্তভাবে তিনি জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। কখন কোন সভা সমিতি করিয়া হৈ চৈ করেন নাই, দল পাকাইয়া নিজমত পুষ্ট করেন নাই, কিংবা অন্যকে খাটো করিয়া নিজের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতেও প্রয়াস পান নাই। তাঁহার এই মহৎ জীবন ও উন্নত আদর্শচরিত্র এখন যেন আপনা হইতে চোখের উপর ভাসিয়া আসিতেছে, উপস্থিত মুহূর্ত্তেও, এই সাধুসজ্জনপদধূলিপূত সারস্বত-সাধন মন্দিরে বসিয়া যেন তাঁহার সেই দেবোপম মনোহরমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি! তোমরা হয়ত বলিবে, ইহা খেয়াল বা কবিকল্পনা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এই সংক্ষিপ্ত চরিতকথা লিখিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও আমরা সেই মহাত্মা সম্বন্ধে এ সব কিছু ভাবি নাই, এখন যেন এই কলমের মুখে তিনি নিজেই স্ব-স্বরূপে ফুটিয়া বাহির হইলেন।

ভূদেবের এই আত্মগোপন ও নিরহঙ্কারের ভাব বোধ হয় নিম্নের এই ঘটনাটিতেও পরিস্ফুট হইতে পারে।

স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টর ভূদেব বাবু—বেতন বোধ হয় তখন তাঁর আটশত টাকা—একবার মফঃস্বলের এক স্কুল পরিদর্শনে গিয়াছেন। যে গ্রামে তিনি গিয়াছেন, সেটি একটি মহকুমা; তথায় একঘর প্রবলপ্রতাপ জমিদারের বাস। বাঙ্গাল জমিদার। আড়ম্বরহীন ভূদেব তাঁহার কুঠিতে গিয়া দেখা করিলে জমিদার বাবু জিজ্ঞাসিলেন, 'কি চাও? কর কি?" বিনীত ভূদেব বিনীতভাবে উত্তর দিলেন,—"আজ্ঞে আমি স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার।" "ও বটে! ছেলে পড়াও?—ব্যাতন?" ভূদেববাবু যেন একটু মুস্কিলে পড়িলেন, মুখ নত করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে আটশত টাকা।"

জমিদার বাবুর যেন তখন চমক ভাঙ্গিল, উচ্চৈঃস্বরে চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, কে আছিস রে, মাচা * দে,—শীগ্গির মাচা নি আয়—দু-দুটা সদরালার তলব পায়—এমন লোক দাঁড়াইয়ে!' বলা বাহুল্য; এতক্ষণ তিনি ভূদেবকে আমলেই আনেন নাই,—'কত লোক যাইতেছে আসিতেছে,—এও তাদেরই একজন' ভাবিয়া যথারীতি আপন বৈষয়িক কাজ করিতেছিলেন,—তাঁর অপরাধই বা কি? পরে বেতনের বহর শুনিয়া বুঝিলেন, লোকটা শাঁসালো বটে;—এমন লোককে বসিবার আসন দেওয়া হয় নাই? বলা বাহুল্য, অন্য কোন স্কুল-ইন্‌সপেক্টর হইলে, কখনই এমন সাদাসিদা রকমে সাধারণভাবে তিনি সেখানে আসিতেন না, আসিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একটা 'এত্তালা' দিয়া পাঠাইতেন যে, "আমি অমুক, আপনার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি।"

পঠদ্দশায় দরিদ্র ভূদেবের বড় কষ্টে দিন কাটিয়াছিল। তারপর প্রথম চাকরি-চেষ্টার কাল আরও কষ্টকর। সে সব দুঃখের কাহিনী স্মরণ করিলেও চোখে জল আসে। অথবা মনে হয়, বাল্যে ও প্রথম যৌবনে, অন্নবস্ত্রের অত কষ্ট পাইয়াছিলেন বলিয়াই, উত্তরজীবনে, সৌভাগ্যশালী রাজার ন্যায়, তিনি দেড়লক্ষ টাকা—ব্রাহ্মণপণ্ডিতের—তথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষাকল্পে—শাস্ত্র-চর্চ্চার জন্য নিঃস্বার্থভাবে দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরদুঃখকাতরতা তাঁহার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রকৃতই তিনি এদেশে একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন;—ঈশ্বরজানিত মহাত্মা ছিলেন। প্রতিদিনই কিছু না কিছু দান করিতে তিনি আত্মীয়স্বজনকে উপদেশ দিতেন; অবশ্য পাত্র বিবেচনায় দান।

যৌবনে ভূদেবের স্ত্রীবিয়োগ হয়। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এজন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিতেন। চির-বিনীত ভূদেব—অহমিকাশূন্য ভূদেব—শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ভূদেব—স্বল্পভাষায় বলিতেন,—'আমাদের বংশে কেহ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করে নাই।' বলা বাহুল্য, এইরূপে তিনি শত অযাচিত আত্মীয়তার হাত এড়াইয়াছিলেন।

* মাচা—বসিবার মোড়া।

কিন্তু শুনিয়াছি, প্রাণোপমা সুশীলা সাধ্বী পত্নী বিয়োগে তিনি যার-পর-নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই কাতরতা ও করুণার সজীব ছবি—তাঁহার একখানি অনুপম গ্রন্থমধ্যে পাইয়াছি। গ্রন্থই গ্রন্থকারের হৃদয় ও মন ব্যক্ত করে। যে, যে ভাবের ভাবুক বা যে রসের রসিক, তাহা তাহার গ্রন্থেই পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। আত্মগোপনের শত চেষ্টা থাকুক, লিপিকুশলতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হউক, সরস কাব্য-কথায়, লেখককে ধরা দিতেই হইবে। এই ভূদেবেই দেখুন না?

"পারিবারিক প্রবন্ধ" বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এমন গ্রন্থ, বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে আজও পঠিত হইতেছে না কেন,—ইহাই আশ্চর্য্য। ইহার সকল প্রবন্ধ, সকল আলোচ্যবিষয়ই উচ্চ-শিক্ষায় পূর্ণ, পরম প্রয়োজনীয়। এমন সুচিন্তিত, সুগ্রথিত, গৃহস্থের পরম কল্যাণকর গ্রন্থ—বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না। হিন্দু গৃহস্থালীর যাবতীয় বিষয়—হিন্দুর সংসারধর্ম্মের অতি প্রয়োজনীয় সকল তথ্যই ইহাতে সরল ও সুন্দরভাবে বিবৃত। পিতা পুত্রকে, পতি পত্নীকে, ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূকে, বৈবাহিক বেহানকে এ গ্রন্থ পড়িতে দিন, সোণার সংসার হইবে, শান্তি তপোবনরূপে তাহা শোভা পাইবে,—তাহাতে আর অভিমান ও ঈর্ষ্যা-বিষ প্রবেশ করিয়া কাহারও মন ভাঙ্গিতে পারিবে না। হিন্দুর এ দুর্দ্দিনে, 'পারিবারিক প্রবন্ধের' মত রত্নও উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে, আর তাহার খোসা ও ভূষি—হিঁদুয়ানির আবরণে বিকাইয়া যায়! যাঁহাদের হাতে শক্তি ও সামর্থ্য, কতবার তাঁহাদিগকে বলিয়াছি, এ গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য হইলে দেশের একটি স্থায়ী মঙ্গল হয়; দু একবার নিজেও এমনভাবে লিখিয়াছি,—'এরূপ গ্রন্থের সমুচিত আদর না হওয়া দেশের দুর্ভাগ্য মনে করি।' কিন্তু কৈ, কথাটা ত কেউই গ্রহণ করিলেন না। না করুন, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাই,—ফল ভগবানের হাতে।

এই অপূর্ব্ব 'পারিবারিক প্রবন্ধে,' সাধু ভূদেবের পত্নীবিয়োগের গভীর চিত্রটি কেমন অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখুন। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণস্বরূপ উৎসর্গপত্রেই চিত্রটির বিকাশ। পাঠককে সেই চিত্রটি পড়িতে বিশেষভাবে

অনুরোধ করি। আমাদের নিতান্ত স্থানাভাব, তাই সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। একটু নমুনা লউন ;—

"আমি কি? এবং কি জন্য হইলাম?—গাছে যেমন পাতা হয়, তেমনি হইয়াছি বৈত নয় * * * মন যেন কি চায়, পায় না—কি যে চায়, তা জানেই না। * * * পৃথিবী শ্মশানভূমি—এখানে থেকে কাজ কি? মনের এই ভাব, এমত সময়ে একটী দেবীমূর্ত্তি আমার সম্মুখীন হইল—আমার দুই চক্ষুতে দুই চক্ষু মিলাইল—আমার হাতে হাত দিল—বলিল, 'আমি তোমার'।"

এই ভাবে আরম্ভ করিয়া দার্শনিক ভূদেব যে ভাবে প্রকৃতিশক্তির দশবিধ মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। অমন ভাবে জীবন গঠন করা ত সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তিনি ভাগ্যবান্, তাই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন,—আমরা তাঁহার অমর আত্মাকে পূজা করি।

এই এক উৎসর্গ-পত্রেই ভূদেবের ভাব, ভাষা, চিন্তা কেমন অপূর্ব্ব পরিস্ফুট! প্রগাঢ় দার্শনিকের সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া, ছবিখানি অঙ্কিত। যেন এক-খানি অতি মনোহর চিত্র কোন দক্ষ চিত্রকর, ধ্যানে আঁকিয়াছেন! প্রকৃতই ইহা ধ্যানের ছবি। এই এক ছবি দেখিয়াই আমরা ভূদেবের ভক্ত। তাঁহার আর কোন গ্রন্থ—'সামাজিক প্রবন্ধ' 'আচার প্রবন্ধ' 'বিবিধ প্রবন্ধ' 'পুষ্পাঞ্জলি'—সত্য বলিব,—এমন ভাল করিয়া ও মন দিয়া পড়ি নাই,—ভাসা-ভাসা অমনি দেখিয়া গিয়াছি মাত্র। কিন্তু 'ভাতের হাঁড়ীর' এই একটা ভাত টিপিয়া আমরা বুঝিয়াছি, অন্ন সুসিদ্ধ হইয়াছে, যে খাইবে, সে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করিবে। ক্ষুধা ত তার থাকিবেই না,—পরমান্নও আর তার ভাল লাগিবে না। প্রকৃতই 'পারিবারিক প্রবন্ধ'—এমনি সুসিদ্ধ সদ্‌গন্ধযুক্ত উপাদেয় অন্ন। এ অন্নে আহার ঔষধ দুই-ই হয়। যাঁহারা বর্ত্তমান বিজ্ঞাপন-বিড়ম্বিত বাঙ্গালা বই পড়িয়া নিরাশ হন, তাঁহারা এই গ্রন্থ খানির সহিত একটু আলাপ করুন, দেখিবেন,—ভিক্টোরিয়া-যুগে বঙ্গসাহিত্য কত সৌভাগ্য-শালী হইয়াছে।

১২৩২ সালের ২রা ফাল্গুন কলিকাতা-হরিতকী-বাগানে ভূদেবের জন্ম

হয় ; এবং ১৩০১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রি প্রায় ১ টার সময় বহু-মূত্র রোগে, চুঁচুড়ার গঙ্গাগর্ভস্থ পুণ্যনিকেতনে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

'বড়লোক হইব' 'খুব নাম হইবে' 'টাকা হইবে' এ সব আকাঙ্ক্ষা ভূদেবের মনেই জাগিত না ;—কিসে দেশে শিক্ষার বিস্তার হইবে,—জ্ঞানের বিস্তার হইবে,—লোক সাধারণের হৃদয় ও মন উন্নত হইবে, ইহাই তাঁহার জীবনের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছার সহিত কাজও তিনি করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে মিশনরী সাহেবদের ন্যায়, নিঃস্বার্থভাবে হুগলীর নানাস্থানে স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন , সেই সব স্কুলে নিজে পড়াইতেন ; কিন্তু নিজেরই দারুণ অর্থ-কষ্ট ; বাধ্য হইয়া তিনি চাকরি গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় পঞ্চাশ টাকা বেতনে ইংরেজী দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমেই অভাবনীয় উন্নতি ; তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া আর পুঁথি বাড়াইব না।

ভূদেবের অন্যান্য যে সব গ্রন্থ আছে,—শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, অঙ্গুরীয় বিনিময়, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি,—সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ভূদেব বা প্যারিচাঁদ বাঙ্গালায় প্রথম উপন্যাস লিখিলেও, ঠিক যাহাকে উপন্যাস বলে, তাহা বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতেই প্রথম প্রকাশ পায়। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালা উপন্যাস-জগতের রাজরাজেশ্বর ও গুরু, ইহা অবিসংবাদী সত্য।

ইংরেজী ১৮৬৪ সালে 'শিক্ষাদর্পণ' নামে ভূদেব একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তাহা উঠিয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত এডুকেশন গেজেট সংবাদপত্র সম্পাদনেই ভূদেবের সমধিক কৃতিত্ব। ইং ১৮৬৮ সালে ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ; ঈশ্বরেচ্ছায় কাগজ খানি আজও আছে।

স্বনামপ্রসিদ্ধ মাইকেল মধুসূদনের সহিত ভূদেবের বাল্যকাল হইতেই বন্ধুতা ও ঘনিষ্ঠতা। মাইকেলের জীবনচরিত রচয়িতা প্রযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, এ সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর যে একখানি পত্র তাঁহার অনুপম পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত চুঁচুড়ার বাটীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্ব্বের মত চেহারা ছিল

না। চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল না, পূর্ব্বের সেই অতি সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, ঠোঁট পুরু এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোষাক সাহেবী, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তার পর কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত হওয়ায় মধু কাপড় চাহিল, বলিল, "আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি-পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব।" ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় আমার মনে তখন যাহা হইয়াছিল তাহার মনেও তাহাই হইয়া থাকিবে। আমার মার কথা মধুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি সে সময়ে মুখ ফুটিয়া তাহার নিকট আমার মার নাম আনিতে পারিলাম না, কারণ এ মধু আর সে মধু ছিল না। সে মধু প্রকৃতির হস্ত-বিনির্ম্মিত প্রোজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন এবং যশোলিপ্সু পবিত্র মানবরত্ন ছিল, কিন্তু এ মধু এক্ষণে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত, অনুকরণাধিক্যে মলিনীকৃত এবং কবির চক্ষে নিমেদস্তের আদর্শীভূত।" * * *

ভূদেবের সাহিত্যপ্রতিভা,—তাঁহার সাধু চরিত্রের আদর্শে প্রস্ফুটিত। অক্ষয়কুমারের ন্যায় তিনিও চিন্তাশীল এবং দার্শনিক। তাই তাঁহার লিখন-ভঙ্গি ও ভাষা কিছু অধিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত;—কবিত্বের সরসতা তাহাতে অধিক নাই। করিত্বের মূল প্রস্রবণ ভক্তি,—জ্ঞান নহে। তাই ভূদেব যে পরিমাণে জ্ঞানী, সে পরিমাণে ভক্ত ছিলেন না। মূলে জ্ঞান ভক্তি এক হইলেও, ব্যবহারিক হিসাবে কিছু প্রভেদ। জ্ঞান—শুষ্ক, ভক্তি—সরস। ভাষাও তাই কাহারও কাহারও কিছু শুষ্ক বা সরস হইয়া থাকে। সরসভাষা স্বভাবতই লোকের চিত্তাকর্ষক হয়। তাই তাহার পাঠকও অধিক। বুঝি সেই জন্যই অক্ষয়কুমার বা ভূদেবের ভাষা তেমন লোকপ্রিয় হয় নাই;—অমন চিন্তাপূর্ণ দর্শন ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা থাকাতেও হয় নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের তাহা পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল। কেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে কবিত্ব বা ভক্তির বীজ ছিল। সেই জন্যই তাঁহাদের ভাষায় পাঠক শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই তাঁহাদের লেখা অপেক্ষাকৃত কম চিন্তা-শীলতার পরিচায়ক হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যে অধিক কার্য্য করিয়াছে। সাহিত্যের এই ক্রমিক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

দ্বারকানাথ, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি।

—:০:—

ভূদেবের পরেই রাজনারায়ণ বসু, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কেশবচন্দ্র সেন, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, হরিনাথ মজুমদার, মনোমোহন বসু, ক্ষেত্রমোহন সেন, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কালীময় ঘটক, 'সদ্ভাবশতকের কবি' কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি মহাশয়দের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহাদের সকলেরই অল্পাধিক কৃতিত্ব আছে। সকলের কথা বিস্তৃত ভাবে স্বতন্ত্র করিয়া লিখিতে গেলে দ্বিতীয় Encyclopædia হইয়া পড়ে। তাহা কেহ পড়িবেও না, আর আমাদেরও সে সামর্থ্য নাই। কেননা শুধু reference হিসাবে এ গ্রন্থ লিখিত হইতেছে না,—বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবীদের সংক্ষিপ্ত চরিতকথা ও সমালোচনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য কতটা সার্থক হইতেছে, পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই দেখিবেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। কেননা, তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ হইতে আমরা মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি। রাজনারায়ণ বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তি,—সদাশয়,সরল ও অকপট বিশ্বাসী। কলিকাতার দক্ষিণ—২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল গ্রামে ইং ১৮২৬ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯০০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। রাজনারায়ণ আজীবন ধর্ম্মানুরাগী ও বিদ্যানুরাগী। তাঁহার স্বদেশবাৎসল্য, দয়া, সত্যনিষ্ঠা, মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সেকাল আর একাল" সাহিত্যের গৌরব। ইহা ব্যতীত "ব্রহ্মসাধনা" "ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা," "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" প্রভৃতি আরও কয়েক খানি গ্রন্থ তাঁহার আছে। সংপ্রতি তাঁহার "আত্ম জীবনচরিত" প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অকপট হৃদয়ের পরিচয়ের সহিত, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর অনেক অতীত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থ হইতে বসুজ মহাশয়ের মনের ভাব একটু উদ্ধৃত করিলাম,—

"চরিত্র বিষয়ে আমাদের সমাজ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আমাদের পুরাতন প্রাণগুলি হারাইতেছি, অথচ ইংরাজদিগের সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিতেছি না। বিলাতের অনেক ভদ্র ইংরেজেরা চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ-স্থল হইতে পারেন। এমন শুনা গিয়াছে, তাঁহারা ব্রাণ্ডি পান করেন না, তাঁহারা ব্রাণ্ডির নাম পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের নিকট উচ্চারণ করা অশিষ্টাচার জ্ঞান করেন। তাঁহাদের স্বার্থপরতা অল্প, আতিথেয়তা বিলক্ষণ আছে, কৃতজ্ঞতাও বিলক্ষণ আছে। কৈ, বিলাতের ভদ্র ইংরাজ-দিগের এই সকল ভদ্রগুণ ত আমরা অনুকরণ করি না। কৈ, সাধারণ ইংরেজবর্গের সাহস, অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও শ্রমশীলতা ত আমরা অনুকরণ করি না? তাঁহাদের যত মন্দ গুণ, তাই অনুকরণ করি।"

(২) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। সুবিখ্যাত "সোমপ্রকাশ"-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তে চিরদিন উজ্জ্বল ভাবে উল্লিখিত থাকিবে। বলা বাহুল্য, তখনকার সংবাদপত্র আর এখনকার সংবাদপত্র স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। তখনকার সোমপ্রকাশে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ, সমাজের অভাব অভিযোগ, গুণের পূজা ও দোষের সাজা যথাযথ বর্ণিত হইত; লোকে তাহা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিত, সম্পাদককে যথোচিত

সম্মান করিত, আর আলোচ্য বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হইত। আর এখন?—সাধারণতঃ এখন কি ভাবে সংবাদপত্র পরিচালিত হয়, বিজ্ঞ পাঠক-মণ্ডলীর তাহা অবিদিত নাই। সহরে ও মফঃস্বলে দুই চারিখানি ভাল কাগজ আছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশেরই চরম দুর্দ্দশা। সেগুলাকে পূতিগন্ধময় নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ব্যক্তিগত কুৎসা ও গালাগালি, দল বাঁধা ও অন্যের অনিষ্ট করা, ব্যবসাদারীর ফাঁদ পাতা ও স্থানবিশেষে সাহিত্যিক গুণ্ডামী করা,—অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই অঙ্গ। একদল ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য চরিত্র-হীন ভাড়াটে লেখক, সংবাদপত্রের এই সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাহাদের উৎপাতে সমাজে ত্রাহি মধুসূদন রব পড়িয়াছে। হতভাগাদের ঠিক যেন ভূতুড়ে কাণ্ড। সমাজ, দেশ, সাহিত্য, ধর্ম্ম জাহান্নামে যায় যাক,—তাহাদের খরিদদার জুটিলেই হইল।—এই দুর্নীতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, সত্য সত্যই দুই একখানি সংবাদপত্র পরিচালিত হইতেছে। কখন বা কুৎসিত ছবি দিয়া, অশ্লীল ছড়া বাঁধিয়া, মানীর মান হরণ করিয়া, ডাহা মিছাকথা রটাইয়া, তাহারা তরিয়া যাইতেছে। কোন্ ভদ্রসন্তান তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে?—এ দুর্দ্দিনে 'সোমপ্রকাশের' ন্যায় সংবাদপত্রের পুণ্যস্মৃতি, স্বভাবতই মনে হয়। মনে হয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সেই সত্যনিষ্ঠতা, সেই সুরুচিসঙ্গত গম্ভীর রচনা, বিশুদ্ধ ভাষায় পল্লীর সেই অভাব বর্ণনা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের সেই জ্বলন্ত উপদেশ, আর ভাষার সেই বিশুদ্ধতা ও সংযম। ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিবৃত্তে 'সোমপ্রকাশের' নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্র হইলেও, ভাষার পুষ্টিসাধনে ইহাঁর দৃষ্টি ছিল এবং সে দৃষ্টি অনেক পরিমাণে সফলতা লাভও করিয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। 'প্রভাকর' ও 'ভাস্কর' প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমপ্রকাশ আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের

প্রভাবের মূলে ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন, তাহার এক পংক্তিও কাহারও তুষ্টিসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোক-সমাজে সমাদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়নিঃসৃত অকপট ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন দশটাকা এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে, কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও সোমপ্রকাশের গ্রাহকসংখ্যা সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল।" *

শিবনাথ বাবুর এই উক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি, এবং বিজ্ঞ সুধীমণ্ডলীও বর্ণে বর্ণে এ উক্তির সমর্থন করিবেন।

এই 'সোমপ্রকাশ' ব্যতীত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'কল্পদ্রুম' নামক একখানি মাসিকপত্রও ছিল; কিন্তু সত্য বলিব, তাহার তেমন প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ইহা ব্যতীত, দুই ভাগ 'নীতিসার' 'রোম ও গ্রীসের' দুইখানি ইতিহাস—এই সকল গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সে গুলিও স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পায় নাই। সংবাদপত্রের সংস্কার করিতে ও তাহার একটা উচ্চ আদর্শ দেখাইতেই বুঝি বিধাতা তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তিনি সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার দক্ষিণ—২৪ পরগণা সোণারপুরের সন্নিকট চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে ইং ১৮২০ সালে বিদ্যাভূষণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ সালে ১২শে আগষ্ট বিস্ফোটক রোগে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার পিতৃদেব হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সে সময়ের একজন সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক ছিলেন।

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শিক্ষা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে; চাকরি গ্রহণও ঐখানে। ব্যাকরণের অধ্যাপকতা করিতে করিতে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় কিছুদিন তিনি সহকারী প্রিন্সিপালের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে সাহিত্যাধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পেন্‌সনও পান। তাঁহার সর্ব্বাগ্রে চাকরি গ্রহণ—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অবর্ত্তমানে 'সোমপ্রকাশ' কিছুকাল ছিল,—কিন্তু যার লক্ষ্মী তার সঙ্গেই যায়,—'সোমপ্রকাশ' আর জমিল না,—উঠিয়া গেল।

এইবার যে মহাত্মার নাম আমরা গ্রহণ করিব, তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও সমাজসংস্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু সেই মহাত্মার মাতৃভাষায় অনু-রাগ ও আন্তরিক ধর্ম্মভাবের নিগূঢ়রহস্য, সম্ভবতঃ অনেকের অপরিজ্ঞাত। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া যাঁকে পার্শ্বে বসাইয়া আদর ও সম্মান করিয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি, যাঁহার রাজ-জামাতাকে প্রধানতঃ সেই খাতিরেই, মূর্ত্তিমতী রটন-লক্ষ্মী সমাদর করিতেন,—যাঁহার সত্যনিষ্ঠ সাধুহৃদয়ের ভক্তিবলে ব্রাহ্মসমাজে মধুর মা-নাম, হরিনাম ও নগরসঙ্কীর্ত্তন প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, —সেই ঈশ্বরজানিত মহাত্মা, জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদি-ভক্ত স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের দ্বারাও বাঙ্গালাভাষা এক সময়ে কম পরিপুষ্ট হয় নাই। প্রথম বাঙ্গালা সুলভ সংবাদপত্র 'সুলভসমাচার' এই কেশবচন্দ্রের দ্বারাই বঙ্গদেশে প্রথম প্রচারিত হয়। তিনিই প্রথম পথ দেখাইলেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্মের বীজ ছড়াইতে গেলে, কালোপযোগী প্রথায় তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। ইংরেজীশিক্ষিত দেশে ইংরেজ রাজ্যে—তাই তাঁহার 'সুলভ সমাচারের' সৃষ্টি। কেবশচন্দ্রই এ দেশে লোকমতের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সেই আদি 'সুলভ-সমাচার' এক সময়ে বঙ্গবাসীর অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা লইয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিত,—'সুলভের' দ্বারা এক সময়ে অনেক কাজ হইয়া-ছিল। অথবা এখন যাহা মহা আড়ম্বরে ও ধুমধামে হইতেছে, তাহার মূলে সেই 'সুলভ'। সুতরাং এ মহাত্মার ঋণ আমাদের অপরিশোধনীয়। তিনি ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হউন, ধর্ম্মপিপাসায় দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া নানা ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত মিশুন, আমাদের সহিত তাঁহার সকল মত না মিলুক,—কিন্তু তিনি যে একজন

অকপট বিশ্বাসী, সত্য-অনুসন্ধিৎসু ও ভগবদ্ভক্ত,—ইংরেজীনবীসদের মধ্যে—অনেক নাস্তিকেরও মধ্যে ধর্ম্মের সুবাতাস যে তিনি অনেক বহাইয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যুগ-অবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা তিনিই সর্ব্বপ্রথমে 'সুলভে' প্রকাশ করেন। তাহার ফলে অগণিত ধর্ম্মপিপাসু—সেই মহাপুরুষের চরণাশ্রয় লাভ করেন এবং কৃপাপ্রাপ্ত হন। এটুকুও ঠাকুরের কৌশল। কেননা, বিলাতের দিগ্বিজয়ী 'চন্দ্র সেন' এবং অত বড় একটা জাঁদ্রেল ইংরেজীনবীশ যখন এ কথা বলিতেছেন, তখন ইহার মূলে অবশ্যই সত্য আছে,—সহরের অধিকাংশ লোকেরই এই বিশ্বাস। কেশববাবুর উপর তখন লোকের এমনি অগাধ শ্রদ্ধা। এজন্য ঠাকুর একদিন হাসিতে হাসিতে কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—'ও কেশব, তুমি নাকি আমার সম্বন্ধে কি ছাপিয়েছ? তা এখন ওসব কেন?' অতপর নিজের বুকে হাত দিয়া পরমহংসদেব বলিলেন,—'এ আধারে যদি কিছু থাকে, ত হিমালয় ভেদ কোরেও তা উঠবে—অত ছাপাছাপির কি দরকার? কিন্তু 'ভক্তের ভগবান্' যাহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন, অমৃতের আস্বাদ পাইয়া 'আপ্তসার' সাধকের ন্যায় সে চুপ করিয়া থাকে কিরূপে?—সে আর পাঁচ জনকে তার সন্ধান দেয়। তাই ভক্ত কেশব উদার উন্মুক্ত হৃদয়ে 'সুলভে' এই মর্ম্মে ছাপাইতে লাগিলেন,—'কে আছ ধর্ম্মপিপাসু—ভক্তির কাঙ্গাল! যাও, দক্ষিণেশ্বরে গিয়া সোণার মানুষ দেখিয়া এস! ভগবানের নামে যার প্রেমাশ্রু ঝরে, মা-নামে যে পাগল, হরিনামে যে উন্মত্ত হয়,—যাও, সেই স্বর্গের মানুষ দেখিয়া জন্ম সার্থক কর গিয়া'!—মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, কেশবের এই আন্তরিক আহ্বানের অশেষ ফল ফলিয়াছিল,—এখনও সেই শুভফল ফলিতেছে। সূক্ষ্ম মতবাদের গণ্ডী কাটিয়া, আন্তরিক ব্যাকুলতায় এখনও যে—সেই গুপ্ততীর্থ শ্রীদক্ষিণেশ্বরে যায়, তাহার শান্তি মিলে,—জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি,—তোমার বিদ্রূপে টলিব কেন? পরমহংসদেব এখনও আছেন, তাঁহার শক্তি বিরাজ করিতেছে,—সত্য মিথ্যা—দু'দিন তাঁহাকে ডাকিয়া দেখ। না ডাকিলেও তিনি ডাকিয়া লন, কৃপা করেন, এমনি তিনি দয়াময়;—তবে সে ভাগ্য সকলের হয় না। পরমহংসদেবের দল নাই। যারা তা বলে, তারা তাঁকে জানে না। কেন না, তিনি নিজেই

শ্রীমুখে বার বার বলিয়া গিয়াছেন,—গেড়ে-ডোবায় 'দল' জন্মায়, নদীর স্রোতে 'দল' থাকে না।' এ কথার অর্থ কি? অর্থ এই, তোমার মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা—কি মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) আসিল, ত তুমি মরিলে। 'যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ,—মূল প্রত্যয়।' তোমার ভাবে তুমি থাক,—দল পাকাও কেন? "এক জল, নাম ভিন্ন বৈত নয়? হিন্দু বলে অপ্‌—নারায়ণ, মুসলমান বলে পানি, খৃষ্টান—বলে ওয়াটার; মূলে সেই একই বস্তুকে বুঝাইতেছে। 'মত—পথ মাত্র। তা যে পথেই ব্যাকুল-ভরে যাও, ভগবান্ পাইবে।"—এই ত ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী। কে বলে, পরমহংসদেবের 'দল'? অন্তর্য্যামী তিান; এই প্রশ্ন জীবের মনে উঠিবে জানিয়াই কতবার তিনি রঙ্গ-তামাসার সহিত শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—'চাঁদা-মামা সকলের মামা',—কারো একার নয়!—যা হোক, মহাত্মা কেশবের নিকট আমরা সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী। ঋণী এই জন্য যে, তিনিই প্রথমে তাঁর 'সুলভে' এই 'ভক্তের' ভগবানের' সন্ধান আমাদগকে দিয়াছিলেন। কেশবের অনেক বিশিষ্ট শিষ্যও 'সুলভে' লিখিতেন; তাঁহাদের দ্বারাও বঙ্গভাষার অনেক পরিপুষ্টি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। একটি মাত্র মহাত্মার নাম এখানে উল্লেখ করিব; কেন না, তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ ভক্তিভাবময় সাধন-সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ। মহাত্মা ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) মহাশয়কে আমরা এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। 'চিরঞ্জীব' ত চিরঞ্জীবই বটে। গুরদত্ত এ নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে। অমন সরস গান, অমন রচনার ভঙ্গি, অমন মধুর প্রেমপূর্ণ ভাব—এ যুগের বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়াও ত বোধ হয় না। হউন সান্ন্যাল মহাশয় ব্রাহ্ম, হউন তিনি কেশব বাবুর শিষ্য;—তাঁহার অদ্ভুত ভাবুকতা ও ভক্তিবিমিশ্রিত কবিত্বময় সঙ্গীতে আমরা গলিয়া গিয়াছি। বলা বাহুল্য, ত্রৈলোক্য বাবুর ঐ সমস্ত গানের মূল ভাব—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অমূল্য উপদেশ হইতে গৃহীত। সৌভাগ্যক্রমে উক্ত ত্রৈলোক্য বাবুও ঠাকুরের অশেষ কৃপা পাইয়াছিলেন। এখন তিনি বা তাঁহারা যে ভাবে থাকুন, বা ঠাকুরকে যাহা ইচ্ছা হয় বলুন,—আমাদের বিশ্বাস, পরমহংসদেবের কৃপাতেই কেশবের আধ্যাত্মিক উন্নতি। সত্যানুরাগী

ভক্তচূড়ামণি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তিনি,—এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও খানিকটা যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। উক্ত 'সুলভ সমাচার' বাদেও কেশব বাবুর ছোট বড় কতকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। তাঁহার 'জীবনবেদ' একখানি উৎকৃষ্ট প্রার্থনাবিষয়ক গ্রন্থ। উহাতে ধর্ম্মের অনেক গূঢ়কথা ও উচ্চভাব সরলভাষায় বিবৃত আছে। 'নববিধানের' স্রষ্টা কেশব-চন্দ্রের ঘটনাবহুল কর্ম্মময় জীবনের কথা এবং তাঁহার চরিতালোচনা এ গ্রন্থে সম্ভবে না। তাঁহার বিস্তৃত জীবনচরিত তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠক তাহাই দেখিবেন। তবে তাঁহার মহৎ বংশপরিচয়ে এই মাত্র বলি যে, পরম বৈষ্ণব ও ধার্ম্মিককুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পিতামাতা উভয়েই পরমধার্ম্মিক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কেশবের হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ নিহিত ছিল। গরিফার (বৈদ্য) সেন বংশ প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত; ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও 'নববিধানের সৃষ্টিকর্ত্তা' হইয়াও কেশব পিতৃকুল উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

ইং ১৮৩৮ সালের ১৯শে নবেম্বর কলিকাতা কলুটোলায় কেশবচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ৯টা ৫৩ মিনিটের সময়, একরূপ জীবনমধ্যাহ্নে তাঁহার স্বর্গারোহণ হয়। তাঁহার পিতার নাম প্যারিমোহন সেন। কেশবচন্দ্রের অকালবিয়োগে, বঙ্গদেশ একটি রত্ন-হারা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

(৪) **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।** কবি রঙ্গলাল ভিক্টোরিয়া-যুগের প্রথম 'জাতীয় কবি।' এক সময়ে তাঁহার কবিতার যথেষ্ট আদর ও প্রতি-পত্তি ছিল। কিন্তু যে কারণে হউক, এখন আর তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা নাই। রঙ্গলালের 'পদ্মিনীর উপাখ্যান', এক সময়ে নব্যযুবকসমাজে পরম সমাদরে ও মহা উৎসাহ সহকারে পঠিত হইত। সেই—'স্বাধীনতা-হীনতায়' ইতি-শীর্ষক কবিতা এক সময়ে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিত। কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদের ভেরীবাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে উদ্দীপনা নিবিয়া গেল, কবির কবিত্বের ঝঙ্কারও বুঝি থামিল। 'কর্ম্মদেবী' 'সুরসুন্দরী' প্রভৃতি আরও

কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহার আছে। ইং ১৮২৬ সালে বৰ্দ্ধমান জেলায় কাল্‌নার সন্নিকট বাকুলিয়া গ্রামে রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষাবস্থায় রঙ্গলাল কলিকাতা—খিদিরপুরে বাস করিয়াছিলেন। দুই একখানি সংবাদপত্রের তিনি সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইন্‌কাম ট্যাক্‌সের এসেসারি হইতে কবি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। এ সময়েও তাঁহার কবিতারচনার বিরতি ছিল না। গুপ্তকবির 'প্রভাকরে' রঙ্গলালের একরূপ হাতে খড়ি হয়। ইং ১৮৮৭ সালের ১৩ই মে কবি ইহলোক ত্যাগ করেন।

(৫) রামগতি ন্যায়রত্ন। এই মহাত্মার অক্ষয়কীর্ত্তি—"বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।" এই গ্রন্থে প্রাচীন সাহিত্যালোচনার পথ তিনি যে কিরূপ সুগম করিয়া দিয়াছেন, তাহা এক মুখে বলা যায় না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পর এ শ্রেণীর যতগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বা হইতেছে, সে সমস্তই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া। তিনি বহু শ্রম, সময় ও অর্থব্যয় করিয়া, অনেক কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বহুদেশ ভ্রমণ, বহুস্থান হইতে প্রাচীন সাহিত্যবিষয়ক উপাদান সংগ্রহ করিয়া, তিনি বঙ্গভাষার ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের যে মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য সাহিত্যসেবীমাত্রেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তার পর কত শত সহস্র সুপাঠ্য অপাঠ্য গ্রন্থ যে তাঁহাকে নিবিষ্ট মনে দীর্ঘকাল ধরিয়া পাঠ করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলে তাঁহার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে হয়। এই এক গ্রন্থে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম, সাহিত্যের ইতিবৃত্তে চিরসমুজ্জ্বল থাকিবে সন্দেহ নাই। এই "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থের তুলনায়, তাঁহার 'বস্তুবিচার' 'অন্ধকূপহত্যার ইতিহাস', 'রোমাবতী' প্রভৃতি—সমুদ্রের নিকট সরোবর।

বাঙ্গালা সাহিত্যের একরূপ শৈশবকালে, যিনি কিছুমাত্র লাভের প্রত্যাশা না করিয়া এরূপ অক্লান্ত শ্রম ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় দেখাইয়া সাহিত্যব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারেন, তাঁহার স্মৃতি পূজার যোগ্য। যে মহতী কল্পনা তাঁহাকে এই মহান্ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া সফলকাম করাইয়াছিল, সেই কল্পনাকেও আমরা প্রণাম করি। সাহিত্যের জন্য যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী

ও জীবনব্যাপী অধ্যবসায় অনেক ইংরেজ-লেখকের ধাতেও সহে না, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত,—এই বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন,—এ কি কম কথা? ইংলণ্ড বা আমেরিকা হইলে আজ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম শিক্ষিতসমাজে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইত; তাঁহার পুণ্য প্রতিমূর্ত্তি—লোকের ঘরে ঘরে বিরাজ করিত;—কিন্তু হায়! এ বঙ্গদেশ!

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় একরূপ প্রাণপাত করিয়াও পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বিনীতভাবে বলিয়াছেন;—

"ভাষাতত্ত্বের প্রকৃতি ভূতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রকৃতির ন্যায়;—উভয়েরই মূল ভাগ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যেরূপ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না যে, কোন্ কালে অমুক ভূভাগের প্রথম স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে—কোন্ কালে ও কিরূপে ক্রমে উহার দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি স্তর সকল উহাতে বিন্যস্ত হইয়াছে এবং কোনকালেই বা ঐ সকল স্তর বিসারিত, বিপ্লুত বা বিপর্য্যস্ত হইয়া ঐ ভূভাগকে বর্ত্তমান অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছে, সেইরূপ ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও কোন ভাষার প্রারম্ভ বিষয়ে অথবা সেই ভাষার পূর্ব্বপূর্ব্বে অসংখ্যরূপ যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কালের ক্রম কিছুই বলিতে পারেন না।"

বলা বাহুল্য, আমরা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এ কথা অনুমোদন করি। সেইজন্যই আমরাও ঐ আনুমানিক প্রসঙ্গের আলোচনায় অধিক সময় অতিবাহিত করি নাই।

হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার সন্নিকট ইল্‌ছোবা মণ্ডলাই নামে গ্রাম; সেই গ্রামে ১২৩৮ সালের ২১শে আষাঢ় ন্যায়রত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৩০১ সালের ২৪ শে আশ্বিন—বিজয়া দশমীর পুণ্যমুহূর্ত্তে চুঁচুড়ার বাটীতে তাঁহার স্বর্গারোহণ হয়। তাঁহার পিতার নাম হলধর চূড়ামণি। সংস্কৃত কলেজেই মেধাবী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শিক্ষা এবং হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষকতা তাঁহার প্রথম কার্য্য। শেষ বহরমপুর কলেজে অধ্যাপকতা করিতে করিতে তাঁহার ঐ অমূল্য 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থ প্রণয়ন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ভূদেববাবুর মত লোক তাঁহার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সাহিত্য-জীবন কত মধুর ও আদর্শ কিরূপ উন্নত ছিল, সহজেই

অনুমিত হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তিরও ভূয়সী প্রশংসা শুনা যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই মহাত্মার স্থান যে কত উচ্চে, সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীই নিরপেক্ষভাবে তাহার বিচার করিবেন। আমরা তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত; আমাদের মতামত এক্ষণকার শিক্ষিতাভিমানী 'সাহিত্যিক দল' না লইতেও পারেন। তবে আগুন চাপা থাকে না। সত্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যদি আমাদের এই মন্তব্যের মধ্যে একটুও থাকে, তবে তাহার কার্য্য হইবেই হইবে।

(৬) হরিনাথ মজুমদার। নদীয়া কুমারখালি-নিবাসী—'কাঙ্গাল হরিনাথ'—ভক্তসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার সাধনসঙ্গীত ও বাউলকীর্ত্তন—দেশপ্রসিদ্ধ। 'ফিকিরচাঁদ ফকির' এই ভণিতায় তাঁহার অনেক পারমার্থিক সঙ্গীত এখনও ভক্তসমাজে গীত হয়। বড় কষ্টে ভক্তের দিনযাপন হয়। অথবা ভক্ত, সংসারে ভুগিতেই আসেন,—ভোগ করিতে আসেন না। এটি ভগবানের কৌশল। কাঙ্গাল হরিনাথের মধুর চরিত্রে ও মনোহর সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ। ইহাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'বিজয়বসন্ত।' এই বিজয়বসন্তের আখ্যান, ইহাঁরই মধুময়ী লেখনী হইতে প্রথম নিঃসৃত হয়। যাত্রা থিয়েটারে যে বিজয়বসন্তের মহাধুম, তাহার মূল ইনি। ইহাঁর অনেক সাহিত্যশিষ্য ও ভক্ত উপাসক এখন দেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও চণ্ডীর সদ্-ব্যাখ্যাকার সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, 'সিরাজউদ্দৌলা' 'রাণী ভবানী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,—'হিমালয়' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, মধুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-লেখক, বিনয়ী শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক—কাঙ্গাল হরিনাথের শিষ্যস্থানীয়। তাঁহার 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' সংবাদপত্রে, প্রথমে ইহাঁরা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ফিকিরচাঁদের প্রথম লেখা প্রকাশ হয়,—গুপ্ত-কবির প্রভাকরে। প্রভাকর নিজপ্রভায় অনেককেই প্রভান্বিত করিয়া গিয়াছেন। ১২৪০ সালে ইহাঁর জন্ম এবং ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে এই মহাত্মা ত্রিতাপজ্বালা হইতে চিরজন্মের মত অব্যাহতি পান।

(৭) মনোমোহন বসু। কবি ও নাটককার মনোমোহন বাবুকে না জানে কে? তাঁহার 'রামাভিষেক'; 'প্রণয়পরীক্ষা' 'হরিশ্চন্দ্র' 'পার্থ-পরাজয়' 'সতীনাটক' প্রভৃতি এক সময়ে বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের মান রক্ষা

করিয়াছিল। বঙ্গের অনেক নগরে ও গ্রামে—যাত্রা ও থিয়েটারে—তাঁহার এই সকল নাটকের অভিনয় হইত। এখনও স্থানে স্থানে অভিনীত হয়। তাঁহার শিশুপাঠ্য পদ্যমালার ন্যায় পুস্তক, কৈ এখন ত কর্তৃপক্ষের এত বাঁধা-বাঁধি নিয়ম সত্ত্বেও প্রকাশ পাইতেছে না? ফলতঃ মদনমোহনের 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' আর মনোমোহনের 'আইল ঋতু বরষা, চাষার হ'লো ভরসা, চাতকের পিপাসা ঘুচিল'—ইত্যাকার শিশুকবিতা এখন আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুপাঠ্য অধিকাংশ কবিতাই এখন কষ্টকল্পিত, ইংরেজীভাবে পুষ্ট ও অস্পষ্ট দোষদুষ্ট। কবিতা যার কোষ্ঠিতেও নাই,—কবিতা যার ধাতই নয়, সেও এখন কবিতা লেখে, গান রচনা করে। তখনকার লোকের ছিল—সখ্, আর এখন হইয়াছে—ব্যবসা। তখন আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া স্বভাবকবি লেখনী ধারণ করিতেন; আর এখন কোথাও নাম পাইবার আশায়, কোথাও বা স্কুলপাঠ্যের সাহায্যে কিঞ্চিৎ অর্থলাভের প্রত্যাশায়, অধিকাংশ শিশুপাঠ্য কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কাজেই তাহাতে ছেলেদের মন তেমন বসে না, কবিতা তাহাদের মুখস্থও থাকে না। কিন্তু উক্ত 'পাখী সব করে রব' বা 'আইল ঋতু বরষা', প্রভৃতির ন্যায় কবিতা যদি এখন তারা পায় ত পড়িয়া বাঁচে,—তাদের সঙ্গে তাদের বাপ মাও রক্ষা পায়। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের মর্জ্জি ও কর্ত্তাদের রুচি,—কর্ত্তারাই জানেন। মনোমোহন বাবু গুপ্তকবির সমসাময়িক। তাঁহারও 'মধ্যস্থ' বলিয়া একখানি কাগজ ছিল। তাহাতে তদানীন্তন সময়োপযোগী অনেক কথাই আলোচিত হইত। বসুজ মহাশয়ের অনেক পাঁচালী ও হাফ্ আখ্ড়াইয়ের ভাল ভাল গান আছে। সেকালের লোক তিনি—তাই সরল, অমায়িক ও গুণগ্রাহী। তাই বৃদ্ধবয়সেও নানারূপ শোকতাপ পাইয়াও আজিও তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। মনের গুণে তিনি এই সহিষ্ণুতারূপ অপার্থিব রত্নলাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ২৭ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রাম মনোমোহন বাবুর জন্মস্থান। 'বসন্তক পঞ্চরং' ইহাঁর 'মধ্যস্থের' সমসাময়িক।

(৮) ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত। প্রবীণ সাহিত্যসেবী, সংবাদপত্রের সর্ব্বজনমান্য বিজ্ঞ লেখক, ক্ষেত্র বাবুর নিকট আধুনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক, লেখক ও স্বত্বাধিকারী মাত্রেই ঋণী। ২।৪ খানি বাদে, এমন কোন

বিশিষ্ট সংবাদপত্র নাই যে, ক্ষেত্রবাবু তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে লেখনী চালনা না করিয়াছেন। স্বনামে ও বেনামে ইঁহার কত লেখা যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেই দৈনিক চন্দ্রিকা, প্রভাতী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, নববিভাকর, সাধারণী, সহচর, রঙ্গালয়, দৈনিক প্রভৃতি নানা সংবাদপত্রে নানা বিষয়ে এত অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ ইনি লিখিয়াছেন যে, সে সব একত্র সংগ্রহ করিয়া ছাপিলে, দীর্ঘে প্রস্থে ও ওজনে লেখকের সমান হয়,—কি তাঁহা অপেক্ষাও বোধ হয় ভারী হইতেও পারে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল তিনি সমানে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সংবাদপত্রের সেবা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, ভাগ্যলক্ষ্মী কখনই ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সংবাদপত্রের যা কিছু অঙ্গ,—সকল বিষয়েই ইঁহার সমান অধিকার। নজীর ও প্রমাণ প্রভৃতি ইঁহার কণ্ঠস্থ। কত সংবাদপত্রের উত্থান ও পতন ইনি দেখিলেন, তাহা ইনিই জানেন। কিরূপে নূতন লেখককে মানুষ করিতে হয়,—জলের মত সরল ভাষায় কিরূপে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হয়, তাহা ক্ষেত্রবাবু যেমন জানেন, সংবাদপত্রের অত শত লেখকগণের মধ্যে, তেমনটি ত কৈ, দেখিতে পাই না। আজ কালের অনেক সম্পাদক ও সংবাদপত্র-লেখক তাঁহার পদতলে বসিয়া মানুষ হইয়াছেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকতাবিষয়ে ইঁহার প্রাধান্য বোধ হয় সুধীমাত্রেই স্বীকার করিলেন। ক্ষেত্রবাবুর মত অশ্রান্ত লেখনী চালন করিতে আমরা আর একজনকে দেখিয়াছি,—স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়কে। তিনি যেমন পদ্যে, ক্ষেত্রবাবু তেমনি গদ্যে—ইচ্ছামাত্রেই কলম চালাইতে পারেন। 'শিক্ষা ও উপদেশ' 'মদনমোহন' প্রভৃতি দুই একখানি গ্রন্থও ক্ষেত্রবাবুর আছে। জন্মভূমি, প্রদীপ ও সাহিত্য প্রভৃতি মাসিকেও ইঁহার বহু প্রবন্ধ আছে। কিন্তু সংবাদপত্র লিখনই তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। বৃদ্ধ বয়সেও সেই শোকাতুর বৃদ্ধ একখানি সাপ্তাহিকে নিয়মিতরূপে লিখিতেছেন। ক্ষেত্রবাবু সহৃদয়, উদারচেতা ও ঈশ্বরবিশ্বাসী; তাই নানারূপ পারিবারিক দুর্ঘটনাসত্ত্বে আজিও দাঁড়াইয়া আছেন; আজিও তাঁহাকে অনেকগুলি অপোষ্যকে অন্ন দিতে হইতেছে। শুনিতে পাই ত, এখন উন্নতির যুগ;—দুঃস্থ সাহিত্যসেবীর সভা, মৃত সাহিত্যিকের স্মৃতি-সম্মান, চারিদিকে সাহিত্য-

সমিতি,—কিন্তু কৈ, এমন একজন একনিষ্ঠ জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ লেখকের জন্য তাঁহারা কি করিতেছেন? হায় রে উন্নতি! এ কি উন্নতি, না, আপন আপন নাম-প্রচারের একটা নূতন ফন্দি?

হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী তীর্থের সন্নিকট বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম ক্ষেত্রবাবুর জন্মস্থান। ইং ১৮৪৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ পীতাম্বর সেনগুপ্ত। ক্ষেত্রবাবু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তাই তাঁহার ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী, বিশুদ্ধ; অথচ সে ভাষার সরলতা ও প্রসাদগুণ এত অধিক যে, পণ্ডিত হইতে পুরনারী পর্য্যন্ত সমান আগ্রহে তাহা পাঠ করিতে পারেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে ক্ষেত্রবাবু বিদ্যারত্ন উপাধিও পান।

(৯) হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-বিদ্যারত্ন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর-নিবাসী হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গানুবাদ এক অতুল কীর্ত্তি। ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারতের ন্যায় ইনিই প্রথমে সাতকাণ্ড মূল রামায়ণের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন। তাহাতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই।

(১০) হরানন্দ ভট্টাচার্য্য। উক্ত মজিলপুর-নিবাসী পণ্ডিত হরানন্দ দক্ষিণাঞ্চলের একজন গণনীয় ব্যক্তি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, সুপ্রসিদ্ধ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইনি জন্মদাতা—পিতা। তেজস্বী, ত্যাগী ও নির্লোভ ব্রাহ্মণ—একরূপ রাজা-ছেলের মায়া ত্যাগ করিয়া কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলঙ্কারে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'নলোপাখ্যান' নামে সাহিত্যগ্রন্থ একটু নিবিষ্টচিত্তে পড়িলে মনে হয়, যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন লেখা পাঠ করিতেছি। কিন্তু নিয়তিং সর্ব্ব মূলাধার; তাই দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরানন্দ—সেই সদানন্দ পুরুষ—মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে, আপন মনে হাসিয়া খেলিয়া, নিরহঙ্কার, সৌম্য শান্তমূর্ত্তিতে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া, সরস হাস্য-কৌতুক ও পরিহাস-রসিকতায় শোকাতুরের মুখেও হাসি ফুটাইয়া, ৮৫ বৎসর বয়সে, সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন, সে সংবাদ কে-ই বা রাখিল আর কে-ই বা লইল? আর সে তুলনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম?—পাঠক নিজেই তার তুলনা করুন। তাই বলিয়াছি,

নিয়তিই সর্ব্ব মূলাধার। নলোপাখ্যান ব্যতীত বাল্মীকি রামায়ণের আদি-কাণ্ডটিও পণ্ডিত হরানন্দ অনূদিত করিয়াছিলেন। সে অনুবাদও সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সেই সাহিত্যপ্রতিভা ঐখানেই শেষ হইল।—ক্ষুদ্র মজিলপুর টুকুতে বসিয়া, পেন্‌সনের ক'টি গোণা টাকা লইয়া, হিন্দু সমাজচ্যুত একমাত্র কৃতী পুত্রের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, তিনি যে হাসি-মুখে সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিতে পাইয়াছেন, ঐটুকুই তাঁহার পুণ্যফল।

এই মজিলপুর-নিবাসী 'ভারতসংস্কারক' সম্পাদক স্বর্গীয় কালিনাথ দত্ত ও সুপ্রসিদ্ধ 'বামাবোধিনী পত্রিকার' সম্পাদক ধীরপ্রকৃতি উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম হইলেও চরিত্রের মধুরতা-গুণে ইহাঁরা অনেক হিন্দুরও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কালীনাথ বাবুর 'গুরু-আনুগত্য ধর্ম্ম' একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

(১১) কালীময় ঘটক। রাণাঘাট-নিবাসী ৺কালীময় ঘটক মহাশয়ের 'চরিতাষ্টক', 'ছিন্নমস্তা', 'সর্ব্বাণী' ও 'আমি' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছে। 'ছিন্নমস্তা' উপন্যাসের শেষ অংশটুকু পড়িয়া আমরা মোহিত হইয়াছি এবং 'সর্ব্বাণীর'ও অনেক চরিত্র-চিত্র, হিন্দুর দৃষ্টিতে অতি সুন্দর। ঘটক মহাশয়ের ভাষা একটু সংস্কৃতমূলক হইলেও মনোজ্ঞ,—উহা পড়িতে কষ্ট হয় না।

(১২) নীলমণি বসাক। কলিকাতা-নিবাসী ৺নীলমণি বসাক মহাশয়ের 'নবনারী' একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে সীতা সাবিত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া লীলাবতী, খনা, রাণীভবাণী পর্য্যন্ত নয়টি রমণীরত্নের পুণ্যকথা আছে। এতদ্ব্যতীত আরব্য ও পারস্য উপন্যাস, বত্রিশ সিংহাসন ও ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াও তিনি বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

(১৩) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। 'সদ্ভাবশতকের' কবি দরিদ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালীর বড় গৌরবের পাত্র। 'দরিদ্র কবি' নামের যদি কিছু গৌরব থাকে, তাহা ভিক্টোরিয়া-যুগের আদি হিন্দুকবি কৃষ্ণচন্দ্রই পাইতে পারেন। তাঁহার সদ্ভাবশতকের শতটি কবিতা—সৎ-ভাবসম্পন্নই বটে। অমন ভক্তিভাবময়

কোমল কবিতা অমন ভাবুকতাপূর্ণ সাধু শুদ্ধ রচনা,—অধিক পরিদৃষ্ট হয় না। দরিদ্র কবির দীনতাই ঈশ্বরপূজা। এ দীনতা অনেক ধনীরও স্পৃহনীয়। সার্কেল পণ্ডিতের কাজই ইঁহার অবলম্বন ছিল। কিছুদিন 'ঢাকা-প্রকাশ' সংবাদপত্রের সম্পাদকতাও ইনি করিয়াছিলেন। গুপ্তকবির 'প্রভাকরে' ইঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়।

"অয়ি সুখময়ী উষে, কে তোমারে নিরমিল।
বালার্ক সিন্দূর-ফোঁটা, কে তোমার শিরে দিল॥"

—ইতিশীর্ষক সুপ্রসিদ্ধ গানটি এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই রচিত। খুলনা-সেনহাটী গ্রামে ১২৪২ সালে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাণিকচন্দ্র মজুমদার। দরিদ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের আর একটি কবির ঠিক তুলনা হয়। তিনিও 'দরিদ্রের কবি।' তাঁহার কবিতাও এমনি সদ্ভাবময়। 'প্রেম ও ফুল' 'কুঙ্কুম' প্রভৃতি রচয়িতা, কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কথা এখানে মনে পড়িল। তাঁহার সেই "মা-হারা মেয়ে", "ঘোমটা" প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিয়া একসময়ে আমরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য দরিদ্র কৃষ্ণচন্দ্র অধিক লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু এক 'সদ্ভাব-শতকই' তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে! সেই—

"কি যাতনা বিষে, সে জানিবে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" এবং—
"ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

—প্রভৃতি কবিতা এখনও যেন আমাদের কাণে বাজিয়া আছে।

কিন্তু কবিতায় মাইকেলের যুগ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের নাম ডুবিয়া গেল। পদ্যে মাইকেল ও গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, ভিক্টোরিয়া-যুগের চতুর্থ বা শেষস্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। তাঁহাদেরই যুগ এখন চলিতেছে। মাইকেল মহীরুহের দুই প্রকাণ্ড শাখা—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। তবে ইহার মধ্যভাগে—কিংবা একটু অগ্র পশ্চাতে—এমন কয়েকটি মনোহর বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে যে, তাহার ফুল কাননে আপনি ফুটিতেছে ও আপনিই ঝরিতেছে।

বিশেষ সৌভাগ্য না থাকিলে, সে সব সৌরভময় পুষ্পের আঘ্রাণ লইতে কেহ পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয় বটবিশেষ। সেই বটের শাখা প্রশাখা পত্র শৈত্য ছায়া এত অধিক যে, গদ্যে পদ্যে শত শত শক্তিশালী সাহিত্যসেবী, আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তাঁহার পদাঙ্ক অনুকরণ করিতেছেন। বিশেষ উপন্যাসে ও গদ্য-কাব্যে তাঁহার চরম সাফল্য। এমন সাফল্য অবশ্য সকলের ভাগ্যে হয় নাই, কিংবা হইবেও না। তাঁহার উন্নত আদর্শ ভিক্টোরিয়া-যুগের সাহিত্যসেবী মাত্রেরই সম্মুখে বিরাজিত। এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সুমধুর গীতি-কবিতায় ও ছোটগল্পে বঙ্গসাহিত্যে নবীন যুগের অবতারণ করিয়াছেন, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অল্পাধিক ঋণী। সেই বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলের যুগ এবং নাট্যসাহিত্যে রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রঙ্গমঞ্চ-সংশ্লিষ্ট প্রতিভাবান্ গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাটককারদিগের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, দরিদ্র দাশরথি রায়ের কথা কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক বোধ করি।

দাশরথি রায়

শরথি সামান্য পাঁচালি গায়ক বলিয়া অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। তাঁহার দ্বারা সাধারণ লোকশিক্ষার পথ বিশেষ সুগম হইয়াছে মনে করি। বিশেষ দাশরথি ভক্ত ও কবি। সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার অসামান্য অধিকার। সেই—"দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্ব-খাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা", "ধনি! আমি কেবল নিদানে।" "হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, কর যদি কমলাপতি" প্রভৃতি তত্ত্বসঙ্গীত—বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের জিনিস। অবস্থার বিপাকে পড়িয়া, কর্ম্মফলে যে—যে পথেই যাক্, তাহার ভিতর হইতে সারটুকু গ্রহণ করিতে হইবে। দাশরথির আমলে দেশে পাঁচালীর প্রচলন ছিল, এখন নয়, থিয়েটারের যুগ আসিয়াছে। থিয়েটার হইতেও যদি আমরা সঙ্গীত, সাহিত্য-রস সংগ্রহ করিতে পারি, তবে পাঁচালী বা যাত্রা হইতেও তাহা সংগ্রহ না করিব কেন? সহরে দুই পাঁচটা থিয়েটার আছে বলিয়া ত সাত কোটি বাঙ্গালী পরিতৃপ্ত হইতে পারে না? এই এত বড় একটা দেশ,—কত রকমের লোক আছে, সকলের ধাতে থিয়েটার সহেও না,—তাহারা যাত্রা শুনিতেই অধিক ভালবাসে; যাত্রা শুনিয়াই পরিতৃপ্ত হয়। একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ অনেক যাত্রা-সম্প্রদায় দিয়া গিয়াছেন, এখনও দিতেছেন। প্রাচীন যুগের পরমানন্দ

অধিকারী হইতে গোপাল উড়ে পর্য্যন্ত এই পর্য্যায়ভুক্ত। তারপর গোবিন্দ অধিকারী, বদন, লোকনাথ, মতি রায়, ব্রজ রায়, রসিক চক্রবর্ত্তী, ভক্তচূড়ামণি নীলকণ্ঠ,—ইহাঁদের যাত্রা ও গীতি শুনিয়া বঙ্গের বহু পল্লীসমাজ এখনও সজীব আছে। এখনও সাঁতরা কোম্পানী, বউকুণ্ড, ভূষণ দাস প্রভৃতি যাত্রা-সম্প্রদায়ের নাম লোকে উল্লেখ করে। এখনও নূতন নূতন ভাল ভাল যাত্রা সময় সময় সহর ও পল্লীসমাজ মুখরিত করিয়া থাকে,—তাহা অনেক থিয়েটার অপেক্ষাও ভাল। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া সত্যের অপলাপ করিব কি প্রকারে? বিশেষ, ভক্ত ও সাধক-কবি নীলকণ্ঠের মত ভক্তিরসাশ্রিত, ভাবুকতাপূর্ণ তত্ত্বসঙ্গীত যে আকর হইতে বাহির হয়;—যে আকরে—"কত দিনে হবে সে প্রেম-সঞ্চার", "হরি দুঃখ দাও যে জনারে" "গৌরাঙ্গসুন্দর, নব-নটবর, তপত কাঞ্চন কায়"—প্রভৃতি দুর্লভরত্ন লুক্কায়িত থাকে,—সামান্য যাত্রাওয়ালা বলিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করায় অপরাধ হয়। নীলকণ্ঠ ত মাথার মণি,—গোবিন্দ অধিকারীর দলে গীত—সেই রাধাকৃষ্ণের 'নূপুর চূড়ার দ্বন্দ্ব' অথবা 'শুক-শারীর বিবাদ' গানটির মত ভক্তিভাবপূর্ণ সরস কৌতুকময় গান—এখনকার এই উন্নতযুগের থিয়েটার সম্প্রদায় হইতেও হঠাৎ দেখাও দেখি? সেই "বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের। আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের॥ শুকে বলে আমার কৃষ্ণ 'মদনমোহন'। শারী বলে 'আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নইলে শুধুই মদন" ॥—এই গান এবং "শ্যাম শুক-পাখী, সুন্দর নিরখি, পাখী ধ'রেছি নয়ন-ফাঁদে। তারে হৃদয়-পিঞ্জরে, রাখিতাম ভ'রে, প্রেম-শিকলেতে বেঁধে॥"—কিংবা "লম্পট নিরদয়, তোমায় দয়াময়, হরি বলে কোন্ গুণে॥"—এই সকল সঙ্গীত একদিন সহস্র সহস্র বাঙ্গালীর হৃদয়ে কি অতুল আনন্দ প্রদান করিয়াছে! অধিক কি, রূপচাঁদ পক্ষীরও সেই 'চিরদিন কভু সমান না যায়' প্রভৃতির মত গান এখন আর বড় একটা হয় না। বর্ষীয়ান বিজ্ঞ প্রাচীন অথবা সেকাল-ঘেঁসা লোক,—কিংবা একালেরও সাধু ভক্ত ভাবুকগণ এই গান শুনিয়া পুলকপূর্ণিত দেহে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন, ভাবে মোহিত হন,—স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখিয়াছি, নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি,- তোমার বাক্-চাতুরী বা বাহ্যচটকে

ভুলিব কেন? প্রধানতঃ চেঙ্গ্ড়া-মহল ভুলাইয়াই ত তোমাদের প্রতিপত্তি পসার? বিজ্ঞের নিকট তোমাদের মান কতটুকু? অতএব, শত ত্রুটি থাকিলেও, যাত্রা-সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করিতে পারি না, পাঁচালী গায়ক-কেও ঘৃণার চোখে দেখা অপরাধ মনে করি।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম;—শত অপরাধ থাকিলেও ভক্ত-কবি দাশ-রথি রায় আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য তাঁহার নিকট হইতে প্রভূত উপকার পাইয়াছে। বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়সমাজ এখনও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে পুরনারী পর্য্যন্ত,—প্রাসাদবাসী রাজা হইতে পর্ণকুটীর-নিবাসী নিরক্ষক কৃষক অবধি—তাঁহার গুণে মুগ্ধ। তুমি আমি দুই দশজন নব্যসাহিত্যিক রুচির দোহাই দিয়া, তাঁহার অনুপ্রাসের দোষ দেখাইয়া, 'অসভ্য ইতর অশিক্ষিত সমাজের কবি' বলিয়া গালি দিলে, তাঁহার যশোপ্রভা মলিন হইবে না। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, এক হিসাবে আমরা সকলেই। কেননা, ভগবান্‌কে জানার নাম—জ্ঞান, তদ্ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান এখন, সেই জগৎকারণ জগদীশ্বরকে জানি বা মানি—আমরা কয়টি 'শিক্ষিত' প্রাণী? দু পাতা ইংরেজী পড়িলে বা দুটা লেক্‌চার দিতে পারিলেই ত সেই বিশ্বজীবন ব্রহ্মাণ্ডস্বামী ভুলিবেন না? সে বড় কঠিন ঠাঁই,—এক চুলও গোঁজামিল দিবার যো নাই। এমত অবস্থায় শিক্ষা ও সভ্যতার বড়াই করা কি আমাদের সাজে? কবি দাশরথি ইংরেজী পড়েন নাই, কিংবা দু'টো লেক্‌চারও দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি এমন একটি জিনিস তাঁহার স্বজাতিকে দিয়া গিয়াছেন, যাহার সুমধুর স্মৃতি সুদীর্ঘকাল বঙ্গ-দেশে থাকিবে, এবং বঙ্গসাহিত্য সেই স্মৃতি লইয়া গৌরবান্বিত হইবে। সেই স্মৃতি—তাঁহার স্বর্গীয় সঙ্গীত। তাঁহার পাঁচালীর পালা—কালে লোপ পাইলেও পাইতে পারে,—কিন্তু তাঁহার ভক্তজনবিমোহন সুধাময় সঙ্গীত—সঙ্গীতের কয়েকটি বিশিষ্ট চিহ্নিত চরণ—কিছুতেই লুপ্ত হইবে না। এই দেখুন না?

(১) আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে, মা যদি মরি।
'আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা জাবে গো শঙ্করী।'

(২) 'আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে।
আমি পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।'

(৩) নবদি, তুই বোল্‌গে নগরে।
ডুবেছেন রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে" ॥

ছিদ্রঘটে জল আনিতে গিয়া শ্রীরাধার উক্তি,—

(৪) 'এখন যা করো হে ভগবান্‌।'

(৫) ও কে যায় গো, কালো মেঘের বরণ, কালো-রতন, রমণী-রঞ্জন। মোহন করে মোহন বাঁশী, বিধুমুখে মৃদু হাসি, আবার কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন খঞ্জন। নিরখি বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে চাঁদ বদন খানি, লেগে সই দারুণ রবির কিরণ গো;—যদি বিধি আমায় সদয় হ'ত, কুলের শঙ্কা না থাকিত, সই তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধুবদন ॥"

এই সকল গানে ভক্ত ও সহৃদয় স্বভাবকবির মনের ভাব কি অপূর্ব্ব সুন্দর-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একটু ভাল করিয়া তলাইয়া না দেখিলে বুঝা যাইবে না। কষ্টকল্পনা বা ভাষার জটিলতার লেশমাত্র উহাতে নাই,—যেন ভাব-গঙ্গা আপনা আপনি প্রবাহিতা। উহা কি শুধু শব্দ-কবিতা? কৈ, ঐরূপ দুই চারিটা শব্দ-কবিতা, এখনকার নব্যকবির দল হইতে দেখাও দেখি? বলা বাহুল্য, ভারতচন্দ্রের রচনার ন্যায় দাশরথির গীতগুলি সমধিক প্রসাদগুণসম্পন্ন। সঙ্গীতহিসাবে, ভারত হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। কেননা, তিনি কবি ও সুগায়ক দুই-ই। অবশ্য তাঁহার পাঁচালীর পালা বা ছড়া সমস্তই এরূপ উচ্চ অঙ্গের নয়, পূর্ব্বেই আমরা তাহার একটু আভাষ দিয়াছি। তথাপি তাঁহার 'কলঙ্কভঞ্জন' 'শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন' 'বস্ত্রহরণ' প্রভৃতি পাঁচালীর রচনা উপভোগের জিনিস। তাহাতে ভাষার ঝঙ্কার ও ভাবের কমনীয়তা যথেষ্ট আছে। নির্ঝরিণীর ধারার ন্যায় এরূপ অশ্রান্ত কবিতা রচনা, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয় না। বিশেষ গোপিনীর বস্ত্রহরণ,—যাহা আধুনিক রুচিবাগীশদিগের নিকট অত্যন্ত অশ্লীল,—সেই বস্ত্রহরণের রচনায়, দাশুর কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে একজন পরমভক্ত, তাহাও উপলব্ধ হয়।

অবশ্য দোষগুণ সকল আধারেই আছে; দাশুরও ছিল। আসর জমাইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সং দিতে অথবা ভাঁড়ামো করিতেও হইয়াছে। তা সেরূপ ভাঁড়ামী না করেন কে? যাঁহাদের নাম লইয়া তুমি আমি গৌরব করি,—

সেই কবির রাজা বা সাহিত্যের সম্রাট পর্য্যন্তকেও আবশ্যক বোধে, স্বনামে ও বেনামে উহা করিতে হইয়াছে। 'বিল্বমঙ্গলের ন্যায় মহানাটকের নাটককারকেও, থিয়েটারের আসর রাখিতে 'ফণির মণি' লিখিতে হইয়াছে। দাশু বেচারীর অপরাধ কি? বিশেষ সেই সময়, তখনকার সমাজের সেই রুচি। কিন্তু সেই সব খুঁটীনাটী ধরিয়া এবং অনুপ্রাস ও অশ্লীলতার ধূয়া তুলিয়া, যাঁহারা দাশুর ন্যায় কবিকে চাপা দেন, তাঁহারা কৃপার পাত্র।

অনেক দিন হইতে একদল 'শিক্ষিত' নামধারী বিজ্ঞ বা বাবু, কবিবর দাশরথি রায়কে এই ভাবে দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে চরমে উঠিয়াছেন,—আমাদের দীনেশ বাবু। তিনি দাশুর সঙ্গীতের সুখ্যাতি যথেষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার রুচি, রচনা, চরিত্রদোষ—ঢাক পিটিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার সেই লেখার ভঙ্গিই এক রকম। অল্প পড়িলেই মনে হয়, যেন তিনি কবিকে বিশেষভাবে অপদস্থ করিবার জন্যই ওরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। দাশু কোন্ 'ইতর জাতীয়া অকাবাই নাম্নী রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন';—সে সংবাদটি পর্য্যন্ত তিনি দিয়াছেন। দিন, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি কবির ভগবদ্ভক্তির গাঢ়তাটিও গভীরভাবে আলোচনা করিতেন এবং কবির অন্তিমজীবনের দৃশ্যটিও দেখাইতেন, তাহা হইলে ঠিক ধর্ম্মসঙ্গত বিচার হইত। কেননা, হিন্দুর দৃষ্টিতে আমরা দেখি,—সজ্ঞানে ইষ্টদেবতার নাম লইতে লইতে যাহার প্রাণত্যাগ হয়, সে ব্যক্তি মহা ভাগ্যবান্। ভাগ্য ও পুণ্যের যোগে, তিনিই তখন লোকের আদর্শস্থানীয় হন। সমালোচক দীনেশবাবু, এ সকল কথা কি ভাবিয়াছিলেন? ভাবিলে বোধ হয় ওরূপ করিতেন না। চরিত্রের দুর্ব্বলতা, দাগ বা দোষ—নাই কার? চিরসংযমী, ঊর্দ্ধরেতা, তাপসশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রেরও পতন হইয়াছিল। অথবা মানুষ তুচ্ছ,—স্বয়ং দেবাদিদেবও যাহা হইতে অব্যাহতি পান নাই, সেই দুর্জ্জয় রমণীর রূপরশ্মিতে দাশরথি-পতঙ্গের প্রভাব কতটুকু? সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, এতদিন পরে, কবির কাব্য আলোচনা ব্যপদেশে ঘটনাটির উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। হাঁ, এমন বুঝিতাম যে, চণ্ডীদাসের 'রামীর' ন্যায় ঐ 'অকা বাইয়ের' সহিত বঙ্গসাহিত্যের যোগ আছে, তাহা হইলে অবশ্যই ইহার অনুমোদন করিতাম। কিন্তু দীনেশবাবুর উদ্দেশ্য ত তা নয়? এই

দেখুন না, তিনি কেমন ভাবে ও কিরূপ ভাষায় ভক্ত-কবি দাশরথির চরিত্র ও কাব্য সমালোচনা করিয়াছেন ;—

"এই শ্রুতিসুখকর কিন্তু কুরুচিদুষ্ট গীতরচকগণের মধ্যে দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭ খৃঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। * * * মাতার ভৎর্সনায় দাশু প্রতিজ্ঞা করেন, আর কবির দলে গান বাঁধিবেন না ; তদবধি তিনি পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন, এই নূতন অস্ত্র হস্তে দাশু দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন। * * * তাঁহার লেখনীকে একরূপ অবিশ্রান্ত বলিতে হয়, ইতিপূর্ব্বে যত কবি জন্মধারণ করিয়াছেন, দাশু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রহস্ত।'

এ পর্য্যন্ত একরূপ 'ব্যজস্তুতি' বলিয়া লইলেও লওয়া যায়। কিন্তু ইহার পর সমালোচক মহাশয়—কবিবর দাশরথি রায়কে যে পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হইলেও তাহা করিতে হইবে। কেননা, আমরা যে কার্য্যে ব্রতী, তাহাতে এত বড় একটা গুরুতর কথা উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারি না। মৃতের প্রতি যে সম্মান-দান অত্যন্ত স্বাভাবিক,— স্বয়ং সাহিত্যসেবী হইয়া, দাশরথি রায়ের মত বঙ্গের একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ভক্ত-কবিকে, হিন্দু দীনেশ বাবু কি ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন দেখুন ;—

"তাঁহার অশ্লীলতা এত জঘন্য যে, তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা প্রদানানন্তর ভদ্রলোকের সভা হইতে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়।"—হায় সাধারণ সম্পত্তি! হায় রে সমালোচক!

এরূপ অসংযত ভাষা ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করার দরুণ, দীনেশ বাবুর অনুতাপ আসিয়াছে কিনা জানি না; কিন্তু হিন্দু আমরা,—আমাদের বিবেচনায় কোন সদ্‌ব্রাহ্মণের বিধান লইয়া তাঁহার একটি প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কেননা, সত্য হইলেও ওরূপ অশিষ্ট ভাষা কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতে নাই। বিশেষ অত বড় একজন ভক্ত-কবি সম্বন্ধে। যাহার সম্বন্ধে, দীনেশবাবুর ন্যায় দু'দশজন সাহিত্যিক বাদে, বোধ করি, এখনও এই বাঙ্গালার সহস্র সহস্র লোক—উচ্চধারণা করেন।

মাত্র একস্থানে ঐ দুর্ব্বাক্য বলিয়া দীনেশবাবু ক্ষান্ত হন নাই, দাশুর

একখানি আদিরসপূর্ণ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন,—"এই ভাবে কবি কুসুম ও ভ্রমর-জগৎ উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ন্যায় নায়ক ও অকাবাই-এর ন্যায় নায়িকার রসকোন্দল উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, রুচি ও পবিত্রতার অনুরোধে বলিতে হয়, এই চিত্র ঢাকা থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু কবিত্বের আকর্ষণে তৎপ্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।"

দেখুন, উদ্ধৃত অংশে কবির ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি লেখকের কি কঠোর কটাক্ষ! প্রায় আগাগোড়াই এইরূপ। দীনেশবাবু যে এত সুরুচিসম্পন্ন ও সভ্য-লেখক, তাহা আমরা জানিতাম না।

দাশুর রুচির কথা ত গেল,—এইবার তাঁর সাহিত্যিক সার্টিফিকেট। এ অংশেও দীনেশবাবু কবিকে যে প্রশংসাপত্র দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজ ভাষাতেই শুনুন ;—

"নৈতিক প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া, দাশুকে সাহিত্যের তুলাদণ্ডে ধরিলে দেখা যাইবে, শব্দের বাঁধুনির জন্য যেরূপ প্রশংসাই দাশুর প্রাপ্য হউক না কেন, তাঁহার বিষয় ও চরিত্রবর্ণনের কৌশল আদৌ নাই। দাশুর প্রসঙ্গ ও অপ্রসঙ্গ জ্ঞান নাই, সর্ব্বত্রই ইনি 'দন্তরুচি কৌমুদী' দেখাইয়া ঠাট্টার হাসি হাসিয়াছেন; * * * (দাশুর) পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকমণ্ডলীর মধ্যে দাশু গাহিয়া যাইতেছে।"

সমালোচনার ভঙ্গিটা দেখিলেন? গানের প্রশংসা ছাড়া, প্রায় আদ্যন্তই এইরূপ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিতে পূর্ণ! কিন্তু অমন সাধন-সঙ্গীত-রত্নগুলিও যিনি বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে রাখিয়া গিয়াছেন,—তর্কের খাতিরেও বলি,—শত দোষ সত্ত্বেও, তাঁহাকে 'অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা' দিবার অধিকার কার? এ ত আর গায়ের জোর নয়? বিজ্ঞ সুধীমণ্ডলীই ইহার বিচার করিবেন। এ সম্বন্ধে আমরা আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকট বাঁধমুড়া গ্রাম দাশরথির জন্মস্থান। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই মাতুলালয়ে—পীলা গ্রামে তিনি অবস্থিতি করেন। ঐখানেই তাঁর শিক্ষা দীক্ষা। শিক্ষা তাঁর অধিক হয় নাই। স্বভাবের শিশু স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপন শিক্ষার উপাদান বাছিয়া

লইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সময়ে সেই অনুরাগই ফুটিয়া উঠে। তাহার ফল তদ্বিরচিত অপূর্ব্ব সঙ্গীতাবলী ও পাঁচালী। দাশু সুরসিক ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। সন ১২১২ সালে মাঘ মাসে ব্রাহ্মণ-বংশে দাশরথি রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। মাতার নাম শ্রীমতী দেবী; পত্নীর নাম প্রসন্নময়ী। প্রসন্নময়ী অতি সাধ্বী ও পতিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। ইঁহাদের একটি কন্যা হয়। ১২৬৪ সালের ২রা কার্ত্তিক সজ্ঞানে স্বরচিত সাধনসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে, ভাগীরথীর পুণ্যমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। মুর্শিদাবাদে এই ঘটনাটি হইয়াছিল। দাশুর কবিত্ব সম্বন্ধে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন,—"দাশরথি রায়ের কবিত্বে আমি চির মুগ্ধ। * * * আমি বহুবার সভাক্ষেত্রে মুগ্ধ হইয়া, ৺দাশরথির সহিত কোলাকুলি করিয়াছি। * * * দাশরথির রচনায় বারংবার লোমহর্ষণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে। দাশরথির রচনা বিষয়ে যে লোকাতীত শক্তি ছিল, কাব্যরসে রসিক সহৃদয় পুরুষগণই তাহা অনুভব করিতে পারেন।" *

মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে দাশরথিকে এত উচ্চসম্মান দিয়াছেন এবং প্রকাশ্য আসরে যাহার সহিত কোলাকুলি পর্য্যন্ত করিয়াছেন, সভ্য ও শিক্ষিত দীনেশ বাবু সেই সাধক ও ভক্ত-কবিকে, 'অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা' প্রদানপূর্ব্বক 'ভদ্রলোকের সভা হইতে দূর করিয়া দিতে' পাঠককে ইঙ্গিত করিতেছেন!—আমরা আর কি বলিব?

দীনেশ বাবু মাপ করিবেন,—আমরা কবির 'গোপিনীর-বস্ত্রহরণ' হইতেই একটি গান উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ভুবন-মোহন শ্যামসুন্দরের অতুলনীয় রূপ দেখিয়া,—সাধিকা, সিদ্ধা শ্রীরাধা বলিতেছেন,—

"সই গো ডুবিলাম ঐ রূপ-সাগরে!

এই গোকুল নগরে, আছে কে হেন সুহৃদ্,

আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে॥

* বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দাশুরায়ের পাঁচালী

মরি কি রূপ-মাধুরী, নীলোৎপল-বল নিল হরি,
দিল লাজ নীল গিরিবরে।
কালো ত কত দেখিলো, সখি লো, একি কালো,
অখিল ভুবন আলো করে॥
ভবে এ নীলধন কে আনিলে, বিনিমূলে তরুতলে,
ও নীলবরণ কিনিল মোরে।—
আমি একা কোথা রাখি, কিছু ধরগো ধরগো সখি,
রূপ আমার আঁখিতে না ধরে॥
কোটি আঁখি দিলে বিধি, কিছুকাল ঐ কাল নিধি,—
হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে।
ঐ যে কালো রূপ, বিশ্বরূপারূপ, দাশরথি কয়,
শ্রীমতি! দেখ নয়ন মুদে অন্তরে॥"

কবির এ সাধন ও সিদ্ধসঙ্গীত. এ অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ পদলালিত্য, এ ভাব ও ভাষার জমাট গাঁথুনি,—আধুনিক কোন কবির কাব্যে আর দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। 'আমি একা কোথা রাখি কিছু ধরগো ধরগো সখি, রূপ আমার আঁখিতে না ধরে'—চক্ষু মুদিয়া ভক্তের এ মানসচিত্র ধ্যান করিলে,—বিদ্যাপতির সেই 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'—এ ছবিকেও যেন ছাড়াইয়া যায়। বলা বাহুল্য, অশ্লীল ভাবিয়া অনেক রুচিবাগীশ সাহিত্যিক,—কবির 'বস্ত্রহরণের' এ পালাটি আদৌ পড়েন নাই বোধ হয়। না পড়িয়াই তাঁহারা বিড়ম্বিত হইয়াছেন মনে করি। আমাদেরও এক সময়ে এইরূপ মনে হইত। কিন্তু 'বঙ্গবাসীর' যোগেন্দ্র বাবুর কৃপায়, এই পালাটি বিশেষ করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি;—অশ্লীলতার লেশ মাত্র ইহাতে নাই,—উপরন্তু গভীর ভাব, পবিত্র কল্পনা, অপূর্ব্ব কবিত্ব ও ভাষার লালিত্য,—'বস্ত্রহরণ' বঙ্গসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এই এক পালাতেই দাশরথির নাম থাকিবে, আর সঙ্গীত-সাহিত্যে ত তিনি চির-স্মরণীয় হইয়াই আছেন। আমরা সেই স্বর্গীয় কবিকে বারবার প্রণাম করি।

দাশরথির পর যাঁহারা পাঁচালীর আসরে নামিয়াছিলেন, তাঁহাদের পালা

জন্মে নাই। তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আর নাই। কেবল রসিকচন্দ্র রায় পাঁচালী-রচয়িতা বলিয়া দিন কতক একটু নাম পাইয়াছিলেন। এখন, তিনিও বিস্মৃতিগর্ভে লীনপ্রায়। হুগলী-ভদ্রেশ্বরের পশ্চিম পালাড় গ্রামে ১২২৭ সালে কায়স্থকুলে রসিকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকমল রায়। এই রায়-পরিবারের বর্ত্তমান বাস শ্রীরামপুর বড়াগ্রাম। ১৩০০ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে রসিকচন্দ্র পরলোক গমন করেন। দাশরথির আদর্শে ইহাঁর পাঁচালী গ্রন্থ লিখিত। উভয় কবির মধ্যে সৌহাদ্য ছিল। ইঁহার একটি শ্যামাসঙ্গীতের দুইটি ছত্র বড় সুন্দর;—'আয় মা সাধন-সমরে। দেখ্‌ব মা হারে কি পুত্র হারে॥'

এই প্রসঙ্গে আর দুইটি কবির নাম এখানে উল্লেখ করিব। কবি বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের একজন। বিষ্ণুরামের সেই—"তরুবর বল্‌রে বল, —কে তোরে সাজায়ে দিল পত্র-পুষ্প-ফল রে।" গানটি অতি মনোজ্ঞ ও সুন্দর। নদীয়া—মেটয়ারী গ্রামে ১৭৫৪ শকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন লোকান্তরিত হন। ঐ এক গানেই তিনি সর্ব্বত্রে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ আর একটি কবি—"তারা, কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে সংসার-গারদে থাটি বল্"—এই একটি গানে সংসারতাপক্লিষ্ট মুমুক্ষু ব্যক্তির নমস্ত। ইহাঁর নাম নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। হুগলী বৈঁচির নিকট যোৎখণ্ড আলিপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন শক্তি-উপাসক সাধক ছিলেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি আজিও বিদ্যমান আছেন।

এইবার আমরা পুরা ইংরেজীনবীশের নব্যতন্ত্রের সাহিত্যযুগে প্রবিষ্ট হইব। প্রথম মাইকেল হইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অতি সংক্ষেপে আমাদিগকে এ কাজ সারিতে হইবে। চুম্বকে ইহার একটু আভাষ দিব মাত্র। কেননা, সাগর-লহরমালার ন্যায়, পুস্তক পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা, এখন এত বাহির হইতেছে যে, এক জন্মে তাহা পড়িয়া উঠাই দুর্ঘট, তা সমালোচনা করিব কি? তবে ভরসা এই, বুদ্ধিমান্ পাঠক ইঙ্গিতেই আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন।

মাইকেল মধুসূদন।

মাইকেলের পূর্ব্বে পূরা ইংরেজীনবীশ প্রতিভাবান্ কবি বঙ্গসাহিত্যে প্রবিষ্ট হন নাই। প্রকৃতির নির্দেশানুসারে যেন এ শুভসংযোগটি ঘটিল। কেননা যে মাইকেল, জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাসক,—শিক্ষা সংস্কার এবং আদর্শও যাঁর পাশ্চত্য গুরুর নিকট, তিনি প্রাচ্যভাবাপন্ন হইবেন কিরূপে? কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র বিধান,—সেই পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী কবিই,—বাঙ্গালা সাহিত্যে নবীন যুগের অবতারণা করিলেন। এটুকু যেন ভগবানেরই কৌশল,—মাইকেল উপলক্ষ মাত্র। কেন না, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতায় ভারত ভরিয়া যাইবে,—তৎপূর্ব্বেই ভারতের একটি প্রধান অংশ—বঙ্গদেশ তাহার পথপ্রদর্শক না হইলে চলিবে কেন? বাঙ্গালী সর্ব্ববিষয়েই অগ্রণী,—তাই সাহিত্যেও তাহার ছায়াপাত হইল। হিন্দুসন্তান মাইকেল খৃষ্টান হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইলেন। প্রথম উদ্যমে ইংরেজী লিখিতে তিনি গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি জানি কাহার আকর্ষণে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল,—মাইকেল মাতৃভাষার সেবায় মনোযোগী হইলেন।

যশোলিপ্সা জিনিসটা একেবারে মন্দ নয়। অত্যধিক যশোলিপ্সা ছিল বলিয়াই, শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মধুসূদন অত বড় হইতে পারিয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টারিতে যে তাঁহার পসার প্রতিপত্তি হয় নাই, সে টুকুও ভগবানের কৌশল। তাহা হইলে সাহিত্যের 'কবি-সিংহাসন' লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না,—বাঙ্গালা সাহিত্যও আজ অভাবনীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত না। বড় ব্যারিষ্টার হইলে তিনি টাকারই মানুষ হইতেন,—হয়ত টাকার পাহাড় করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে ত তাঁহার এ অমর নাম হইত না,—বঙ্গসাহিত্যেওত এরূপ মন্ত্রপূত কুহকদণ্ডপরিচালিত শক্তিরও সঞ্চার হইত না। তাই বলিয়াছি, কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশের পথে, নামের লোভ বা যশের আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত মন্দ জিনিস নহে; কেননা সকাম হইতেই নিষ্কাম আসে। তবে একদল লোক আছে, তারা আজীবন নামের কাঙ্গাল; বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিবার সময়ওএক এক বার মিট্‌মিট্ করিয়া চায়, অথবা হয়ত গর্ব্বে ফুলিয়াও উঠে। এই মনে করিয়া যে, 'আমি কত বড় লোক,—আমার কথা এই এত লোক নিয়ে বসিয়া শুনিতেছে!' বলা বাহুল্য, এরূপ নামের কাঙ্গাল বা মানের ভিখারী—কৃপার পাত্র। তাহাদের দ্বারা সমাজের কোন কাজ হয় নাই, কখনও হইবেও না।

মধুসূদন 'কবি-প্রতিভায়' সকলের বড় হইবেন, লোকে তাঁহাকে 'genius' বলিয়া অভিহিত করিবে, এই টুকুই তাঁহার অন্তরের কামনা ছিল। ভগবানের কৃপায় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল,—জীবিত কালেই, সম্যক দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে পড়িলেও তিনি তাহার কিছু উপভোগ করিয়াও গিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার স্বরচিত—তাঁহারই ভাবী সমাধি-স্তম্ভের জন্য নিম্নলিখিত কবিতাটি সার্থক হইয়াছে;—

"দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব বঙ্গে; তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি-স্থানে।"

এরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বভাবতই কোন নূতন পথ খোঁজে,—অথবা প্রকৃতি যেন আপনা হইতেই তাহাকে সেই পথ দেখাইয়া দেয়। তাহাতে যত বিপদ থাক্, নির্য্যাতন ঘটুক, কষ্ট হউক,—এমন কি মরণের দ্বারেও লইয়া যাক্, সে তাহাতে ক্ষান্ত হইবে না,—সেই পথে যাইবেই যাইবে। পতঙ্গ যেমন আগুন দেখিলেই ঝাঁপ দেয়, পুড়িয়া মরিতে হইবে জানিয়াও ঝাঁপ দেয়, মধুসূদনের জীবনও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। তথাপি তাঁর বড় সৌভাগ্য যে, সহস্র প্রকারে জীবনকে বিড়ম্বিত করিয়াও একটা বিষয়ে তিনি সফলকাম

হইতে পারিয়াছিলেন,—'ভিক্টোরিয়া যুগের' পাশ্চত্যভাবসমন্বিত কাব্য-সাহিত্যের গঠন ও পুষ্টি তিনিই সর্ব্বপ্রথমে করিয়া গিয়াছেন। তথাপি, এমন সফলতা লাভ করিয়াও তাঁহাকে কাঁদিতে হইয়াছিল। কেননা তিনি যে তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে কাঁদাইয়াছিলেন,—স্নেহময় জনকের বুকেও শেল দিয়া গিয়াছিলেন! ঐ সব গুরুতর পাপের ফল এইখানেই ফলে,—পরজন্ম পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করিতে হয় না। মধুসূদনের সেই মর্ম্মভেদিনী করুণার উক্তিটি—তাঁহার আত্মজীবনের সজীব চিত্রটি—এখানে উদ্ধৃত করিলাম;—

"আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে!
জীবন-প্রবাহ বহি, কাল-সিন্ধু পানে যায়,—ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন, তবু এ আশার নেশা ছুটিলনা?
একি দায়॥

রে প্রমত্ত মন, কবে পোহাইবে রাতি? জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি কতকাল রবে?
নীরবিন্দু দুর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলে ঝলে?
কে না জানে অম্বুমুখে অম্বুবিম্ব সদ্যঃপাতি?
নিশার স্বপন সুখে, সুখী যে, কি সুখ তার? জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে।
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে,
এ তিনের ছল সম, ছল যে এ কু-আশায়।
বাকি কি রাখিলি তুই, বৃথা অর্থ অন্বেষণে—সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে, কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে?
যশোলাভ লোভে আয়ুঃ, কত যে ব্যয়িলি হায়, কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে, অন্ধকীট যথা ধায় কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য বিষ-দংশন, কামড়ায়ে অনুক্ষণ,
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায়!"

প্রকৃতই এইটি মধুসূদনের জীবনকাহিনী। উন্নতির অত উচ্চ সোপানে উঠিয়াও তাঁহার এই গভীর আত্মানুশোচনা। ভগবান্ দেখাইলেন, বাহ্য চাকচিক্যে ভুলিয়া জীবনের জীবনকে ভুলিলে তার পরিণাম এইরূপই হয়। সুখ,—যশঃ মানে বা আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে,—ধর্ম্মধন উপার্জ্জনে। কিন্তু লোকে এমন কবির সে ব্যক্তিগত জীবন ভুলিয়া গিয়াছে,—তাঁহার সাহিত্য-জীবন-আলেখ্য দেখিয়া। সে আলেখ্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেছে। এইরূপই হইয়া থাকে। সকল দেশেই এইরূপ হয়।

বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন—মধুসূদনের নিজস্ব। ততোধিক নিজস্ব সেই অমিত্র ছন্দে "মেঘনাদ বধের" ন্যায় গুরুগম্ভীর মহাকাব্য রচনা। পাশ্চাত্য মহাকবিগণের অনেক ভাব, অনেক সৌন্দর্য্য, অনেক চরিত্র-ছায়া ইহাতে প্রতিবিম্বিত। গ্রীক-সাহিত্যের অস্থি মজ্জা ও মেরুদণ্ড 'মেঘনাদের' ভিত্তি। হোমরের ইলিয়ড,—কবির প্রধান অবলম্বন। বাল্মীকি ব্যাসের দেশে জন্মিয়াও কবির এই অনুকরণপ্রিয়তা! তাহার ফল যেরূপ হইবার, তাহাই হইয়াছে—'মেঘনাদের' রচনা গুরুগম্ভীর ও তেজোপূর্ণ হইলেও হিন্দুর দৃষ্টিতে রামচরিত্র নামিয়া পড়িয়াছে। রাম যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, এ বিশ্বাস ত কবি রাখিতেন না,—তাই সাধারণ মানবের মত 'ভিখারী রাম'—ভিখারীর ভাবেই কাঁদিয়া গিয়াছেন এবং মূর্ত্তিমান্ দম্ভ—রাবণ মেঘনাদ প্রভৃতি রাক্ষস-চরিত্র উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির জীবন যেরূপ, তাঁহার জীবন-আলেখ্য কাব্যও ত সেইরূপ হইবে? যেমন ভাব সেইরূপ লাভই হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে মাইকেলের জীবন-চরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার অপূর্ব্ব সমালোচন-গ্রন্থে কবির জীবন ও কাব্য সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন,—কবির ভক্তবৃন্দকে সেই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

তথাপি ইহাও একটা বিশেষ প্রশংসার কথা যে, গ্রীক, লাটীন, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও কবি মাতৃভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অর্থোপার্জ্জন বা সামাজিক পদপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাঁহার আদৌ ছিল না,—যা কিছু লক্ষ্য ছিল, তাহা মাতৃভাষা-ভাণ্ডারে নানা দেশের নানা রত্ন সঞ্চয় করা। সরলচেতা কবি সরলভাবে তাহা বলিয়াও গিয়াছেন,—'রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান, সুধা নিরবধি।' প্রকৃ-

তির পাঁচ ফুল হইতে মধুসঞ্চয় করিয়া প্রকৃতির মধু অপরূপ মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন,—শত অপরাধেও তিনি মার্জ্জনীয়।

বিশেষ, উত্তরজীবনে তিনি আপনার এ ভ্রম বুঝিতেও পারিয়াছিলেন। কবি যখন ইংলণ্ড প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া ফরাসী দেশে অবস্থিত, তখন তদ্বিরচিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে' এ ভাব স্পষ্টরূপে উল্লিখিত ;—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচারি।"—ইত্যাদি।

সকল বিষয়েই কবি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, প্রহসন—ইংরেজীনবীশদের বাঙ্গালা পাঠের সকল সাধ বা সখ্ তিনি মিটাইবার চেষ্টা করিতেন। মেঘনাদ বধ ব্যতীত তাঁহার 'বীরাঙ্গনা' 'তিলোত্তমা' 'ব্রজাঙ্গনা' প্রভৃতি কাব্য,—'শর্ম্মিষ্ঠা' 'পদ্মাবতী' 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটক,—এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি প্রহসন—তাহার নিদর্শন। "নাচিছে কদম্ব-মূলে, বাজায়ে মুরলী রে, রাধিকা-রমণ। চল সখি ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি, ব্রজের রতন॥"—ব্রজাঙ্গনার এই গীতি-কবিতাটি যখন প্রথম পড়ি, তখন এক এক বার আমাদের মনে হইত, 'হায়! এমন মধুর গোপিভাব যে কবির লেখনী হইতে নিঃসৃত হইতে পারে, সে কবি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল কেন?" বস্তুতই, ব্রজাঙ্গনা কাব্যটি আমাদের বড় মিষ্ট লাগে। এইরূপ তাঁহার নাটক এবং প্রহসনও, উচ্চ কবি-প্রতিভার ফল, সন্দেহ নাই। বিশেষ তাঁহার বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের চিত্রটি বড়ই করুণরসপূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী। প্রহসন দু'খানিও তাঁর সমাজদৃষ্টির ফল। হায়! এমন লোকও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন! অদৃষ্টের ফল কে রোধ করিবে? ধর্ম্মের ব্যাকুলতার জন্য খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার এ অধোগতি হইত না,—হীন অনুকরণ প্রিয়তা ও ঝুটা সভ্যতা—সর্ব্বোপরি ভোগসুখের আশাই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। মাইকেলের এই প্রহসনের ছাঁচ লইয়াই প্রসিদ্ধ

হাস্যরসরসিক নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সর্ব্বজনসমাদৃত প্রহসনগুলি—বিশেষতঃ বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। আর তাঁহার নাটক-গুলির অস্তিত্বেই ক্রমে দেশীয় নাট্যশালাগুলি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং সকল দিক্ জড়াইয়া ধরিলে, ইংরেজীনবীশের আদর্শে, বঙ্গসাহিত্যে মাইকেলের স্থান সকলের উচ্চে। কেন না, প্রায় সকল বিষয়েই তিনিই প্রথম পথ দেখাইয়া যান। তবে সত্যের অনুরোধে এ কথা বলিব, গদ্যে তাঁহার তেমন কৃতিত্ব ছিল না। বিশেষ 'হেক্টর বধে' তিনি অত্যন্ত নামিয়া পড়িয়া-ছিলেন ;—গদ্যে কোন সন্দর্ভ বা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যও তিনি সৃষ্টি করেন নাই, —সে সৌভাগ্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন,—তাঁহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী লেখক ক্ষণজন্মা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণ উত্থান সাহিত্যেরও যুগান্তর, দেশেরও যুগান্তর—বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গালীর ঋণ জন্ম জন্ম থাকিবে।

মাইকেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শত শত কবি উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম এখন লুপ্ত। কেবল সেই অক্ষয়বটের দুইটি প্রকাণ্ড শাখা এখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুই শাখা হইতেও আবার শত শত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। বটের নামুনা ঝুলিয়া বৃক্ষ হয়, তাহা সকলে জানেন। হয়ত কালে মূল গাছটি শুকাইয়া একরূপ মরিয়া যায়, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন ঐ শাখা-প্রশাখাই নূতন বৃক্ষের রূপ ধারণ করিয়া মূল বৃক্ষের গৌরব জ্ঞাপন করে। মাইকেল মহামহীরুহের সেই দুই প্রকাণ্ড শাখা—কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন।

এ হেন মাইকেলকেও, বাঙ্গালায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য অনেক বাক্যবাণ ও শ্লেষ-বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছিল। ঢাকা-পানকুণ্ডা নিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র—"ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য" নাম দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এক শ্লেষকাব্য লিখেন। মেঘনাদের parody করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এক শ্রেণীর লোকে কিছুদিন তাহা লইয়া মাইকেলকে খুব লঘু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সত্যের নিকট সে শ্লেষ-বিদ্রূপ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, —কবি আজ মনুমেণ্টের মত মাথা তুলিয়া সকলের উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আছেন।

এই জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কিন্তু আর একটি বড় ভালকাজ বাঙ্গালা সাহিত্যে

করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের পদাবলী তিনিই প্রথমে বহুকষ্ট করিয়া উদ্ধার করেন। 'গৌরপদ তরঙ্গিনী' নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থও আছে। 'সাধারণী' সম্পাদক অক্ষয়বাবু ও মাননীয় সারদাচরণ মিত্র দু'য়ে মিলিয়া তারপর 'বিদ্যাপতি' সম্পাদন করেন। 'বিদ্যাপতি ব্যতীত "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও সারদাবাবু লিখিয়াছেন। একটা বড় শুভযোগ দেখিতেছি, হাইকোর্টের জজেরাও এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ "কর্ম্ম ও জ্ঞান" গ্রন্থই ইহার প্রমাণ।

এখন যাহা বলিতেছিলাম ;—হেমচন্দ্রও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, বিশেষ দক্ষতার সহিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বৃত্রসংহার' প্রণয়ন করিয়া অতুল যশস্বী হইয়াছেন। এমন কি, এই মহাকাব্য, স্থানে স্থানে মেঘনাদকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। মাইকেলের দোষ ইহাতে অল্প, গুণ সমধিক। কোথাও কোথাও বা গুরু হইতেও শিষ্যের প্রাধান্য দেখা যায়। তা হউক, সত্যের অনুরোধে তথাপি বলিব, মাইকেল না জন্মিলে, হয়ত হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের অস্তিত্ব অন্যরূপে থাকিয়া যাইত। আবার, ইহাও ঠিক যে, এক গুরুর শিষ্য হইলেও, হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভা নবীনচন্দ্র হইতে অনেক উচ্চ। হেমচন্দ্রের রচনা গুরুগম্ভীর, কল্পনা মাইকেলেরই ন্যায় সুদূরগামিনী, আদর্শ বোধ হয় আরও উচ্চ। ইহার উপর লেখার ভঙ্গি, ভাব-অভিব্যক্তি, চিন্তা ও তাহার সামঞ্জস্য এত সুন্দর যে, আজ পর্য্যন্ত হেমচন্দ্রের স্থান কেহ পূর্ণ করিতে পারিলেন না। বৃত্রসংহার ব্যতীত কবির 'দশমহাবিদ্যা', 'কবিতাবলী' চিত্ত বিকাশ প্রভৃতি কাব্যসাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। বড়ই ক্ষোভের বিষয়, মাইকেলের ন্যায় এই কবিরও শেষজীবন বড় দুঃখে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করিলে আজিও চোখে জল আসে। বিধির নির্ব্বন্ধে, অথও কর্ম্মফলে অন্ধ হইয়া, পরানুগ্রহ-প্রত্যাশী কবি শেষজীবন যেরূপ কাতরভাবে গোঁয়াইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই উক্তি হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"কি নিয়ে থাকিব ভবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে, ভবলীলা ঘুচেছে আমার।
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন, বৃথা রাখা ধরণীর ভার।

জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে !
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার,—বিভু ! কি দশা হবে আমার ?"

হায় কবি ! তোমার জন্মার্জ্জিত অখণ্ড কর্ম্মফলই তোমার এই দুঃখময় অদৃষ্টের সৃষ্টি করিয়াছিল ! বোধ হয়, অদৃষ্টের এই ভাবের একটা অস্ফুট চিত্রও একদিন তোমার মানসমন্দিরে ছায়ার ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিল, তাই মাইকেলের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তুমি বহুপূর্ব্বেই কাঁদিয়াছিলে,—

"হায় মা ভারতি ! চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে, ও পদযুগল, সেই যে দরিদ্র হবে ?"

কবিবর নবীনচন্দ্র এত উচ্চ সম্মানের অধিকারী না হইলেও তাঁহার কাব্যপ্রতিভাও অনেকের তপস্যার বিষয়। বিশেষ তাঁহার সারল্যপূর্ণ মধুর মূর্ত্তি ও কবিজনোচিত সহৃদয়তা আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। কাব্যের কোন কথা পড়িলে তাঁহার হৃদয়-প্রস্রবণ একেবারে খুলিয়া যাইত ;—সরল শিশুর মত তিনি উদার অকপটভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। বাল্যে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'পলাশীর যুদ্ধ' যখন পাঠ করি, তখন অনেক স্থান আমাদের কণ্ঠস্থ ছিল, এখনও বোধ হয় কিছু কিছু আছে। তাঁহার সেই 'কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র-কিরণ ! বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !'—ইতিশীর্ষক মোহনলালের সেই অমৃতময়ী উক্তিটি স্মরণ করিলে এখনও চোখে জল আসে। উত্তরজীবনে কবি যে কয়খানি কাব্য লিখিয়াছিলেন,—তাঁহার সেই 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' ও 'অমিতাভ' পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মের মধুর মোহন ভাব ও নির্ঝরিণীর ধারার ন্যায় স্বাভাবিক সরল উচ্ছ্বাসে মন মোহিত হইয়া যায়। নবীনচন্দ্র যেন স্বভাবের সরল শিশু ; তাই তাঁহার কোন কবিতায় কষ্টকল্পনা নাই। চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় তাঁহার কবিতা পাঠে পাঠককে টানিয়া লইয়া যায় ; কোথায় দিয়া যে সময় চলিয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তিনি যেখানে যাহা কিছু বলিয়াছেন, কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলেন নাই,—যেন সবটা হৃদয় ঢালিয়া বলিয়া গিয়াছেন। এমন মুক্তপ্রাণ কবি এখনকার কালে, কৈ, আর দেখা যায় না। তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিব, সকল স্থানে তিনি চিন্তার সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই ; লিপিকুশলতা এবং চরিত্রচিত্রণেও স্থানে স্থানে তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আর্য্য অনার্য্যের মতবিরোধিতার জন্য এ কথা বলিতেছি না,—এ অংশে কবির স্বাভাবিকই কিছু ত্রুটি ছিল। কিন্তু তাঁর ভাষার বেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস এত প্রবল ছিল যে, কোন কোন স্থানে হেমচন্দ্র—এমন কি মাইকেলকেও তিনি অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। সেই ভাষার একটানা তোড়ে, এ ত্রুটি—ত্রুটি বলিয়াই অনেকের নিকট মনে হইত না। যাই হোক, নবীনচন্দ্রের নিকট বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ঋণী;—ভাষা-জননীর সেবা করিতে করিতে যে উত্তর-জীবনে তাঁর চৈতন্যচন্দ্রের চাঁদ-মুখ মনে পড়িয়াছিল এবং সেই পতিত-পাবনের পাদপদ্মে যে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়াও তাঁহার ভক্তগণ পরিতৃপ্ত হইবেন। বাল্যকাল হইতেই নবীনচন্দ্রের জীবনে প্রেমভক্তির বীজ ছিল; তাহার ফলেই উত্তরকালে তাঁহার ঐ সকল মনোরম কাব্যবৃক্ষের বিকাশ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার কিয়দংশ তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন,—সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর এক নবীনচন্দ্রের উল্লেখ করিতেছি;—রাজ-কার্য্যের গুরুভারে থাকিয়াও তাঁহার কাব্যালোচনার বিরতি নাই। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পদ্যানুবাদ 'রঘুবংশ' পড়িয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। মূল রঘুবংশ যাঁহারা পড়েন নাই, অথবা তাহাও যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা উভয়পক্ষই **শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস** মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন,—দেখিবেন, কি অবিচলিত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত, কবি তাঁহার আরদ্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন। আমাদের স্থানাভাব, তাই সে অনুবাদ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

যশোলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; যশের যোগ্য হইলেও ঘটে না। নাম হওয়া বা মান পাওয়া, প্রকৃতই একটা বরাত। অর্থভাগ্য বা বিদ্যা-ভাগ্যও যেরূপ, যশোভাগ্যও ঠিক তদ্রূপ। ইহার সাক্ষী—কবিবর **বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী** ও **সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার**। ফলতঃ বিহারি-লালের 'সারদামঙ্গল' 'সাধের আসন', 'বঙ্গসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্য এবং সুরেন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'মহিলা' 'সবিতা-সুদর্শন' প্রভৃতি কাব্য—বঙ্গসাহিত্যের এক একটি রত্নস্বরূপ হইয়াও একরূপ লোক-লোচনের অন্তরালে রহিয়া গেল,—তাহার সন্ধান বা সংবাদও কেহ লইল না মনে হয়;—অথচ তাঁহাদের

শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এক একটা দিগ্‌গজ—দেশমান্য হইয়া পূজা পাইতেছেন,—মূল অদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিব? কেননা, যে বিহারিলালের 'সারদামঙ্গলের' ভাব ও ছায়া লইয়া প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কাব্য-আলেখ্য অঙ্কিত করেন,—সেই 'বাল্মীকি প্রতিভার' কবি এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শত শত শিষ্য প্রশিষ্যের পূজা ও সেবা পাইতেছেন, আর তাঁর গুরুস্থানীয় দীন বিহারিলাল যেন ক্রমেই বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইতেছেন! প্রকৃতই, 'সারদামঙ্গলের' কবির কথা সাধারণতঃ কার মনে জাগে? কিন্তু সে তুলনায় 'বাল্মীকি-প্রতিভার' কবি রবীন্দ্রনাথের নাম এখন কতরূপে বিস্তৃত। মূল অদৃষ্ট, তার সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই সঙ্গে একটি সত্যকথাও বলিব। ছন্দোবন্ধময়ী কবিতা বা পদ্য,—বঙ্গদেশ হইতে যেন ক্রমেই বিদায় গ্রহণ করিতেছে; আর তাহার স্থানে সরস কবিত্বপূর্ণ গদ্যসাহিত্য যেন উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগ প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহার সময় হইতেই যেন ভাষা-কবিতার ক্রমিক তিরোধান। তবে হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের ন্যায় প্রথিত-নামা যশস্বী কবিদিগের কাব্য বা মহাকাব্য প্রকাশিত হইলে দিনকতক একটু উত্তাপের লক্ষণ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও যেন ক্রমেই শীতল হইয়া যাইতেছে।

এই সঙ্গে আর একটি কথাও আছে। আমাদের দেশে, এবং বোধ হয় সকল দেশে—এখনও লোকে পদমর্য্যাদা ও ধনগৌরবের অধিক বশংবদ হয়। সেই সঙ্গে যদি কাহারও ঈষৎমাত্রও সাহিত্যপ্রতিভা বা কাব্যপ্রভার বিকাশ হয়, জনসাধারণ সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা অপেক্ষা উচ্চ বা উৎকৃষ্ট প্রতিভাও কোন দরিদ্র সাহিত্য-সেবীর মধ্যে বিকসিত হইলেও, সহজে কেহ তাহাকে আমল দিতে চাহে না; আমল দেওয়া অপমানকর বোধ করে। কেননা, সেই সাহিত্য-সেবী অবস্থাবিপাকে হয়ত সামান্য প্রত্যাশী হইয়া পূর্ব্বোক্ত ধনী বা পদস্থ কবির দ্বারস্থ হইলেন, দশে তাহা দেখিল বা জানিল,—কাজেই স্বাভাবিক মানবীয় দুর্ব্বলতা বশে ঐ দরিদ্র সাহিত্যসেবীর সাহিত্যমর্য্যাদার প্রতিও তাহারা অনাস্থাবান্ হইল।—কমলার কেমন মহিমা,—সকলেরই সহানুভূতি

ও চিত্তের অনুরাগ ঐ ধনী কবির প্রতিই ন্যস্ত হয়। বিশেষ, সে কবি যদি সত্য সত্যই ঈশ্বরানুগৃহীত ও একটু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই,—দুঃস্থকবির ন্যায্যপ্রাপ্য মানও সেই সঙ্গে ডুবিয়া গিয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং স্থানবিশেষে পরীক্ষিত। সুতরাং ইহাতে বিক্ষুব্ধ বা চঞ্চল হওয়া উচিত নয়। পরের দুঃখে যেমন, পরের সুখের প্রতিও সেইরূপ সমান সহানুভূতি ও আনন্দ প্রকাশ করাই মহত্ত্ব। নচেৎ ঈর্ষা-বিষে জ্বলিয়া মরিতে হয়; মনে ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা আসে; মানীর মান-হরণে আত্মাকে অধোগামী করিয়া পাপপঙ্কে ডুবিতে হয়। বিহারিলালের বা সুরেন্দ্রনাথের তেমন নাম এখন না হইলেও একদিন হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে; কেননা সত্যের নাশ কখন হয় না।

তারপর স্বভাবতই কবিতা এখন ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—কবিত্বমিশ্রিত গদ্য-কাব্যই এখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে এত মান ও নাম, তাহার একমাত্র কারণ—তাঁহার গীতি-কবিতা নয়,—তাঁহার স্বর্গীয় সাধনসঙ্গীত, সুন্দর সুন্দর ছোট গল্প,—সুচিন্তিত ও সুলিখিত গদ্য প্রবন্ধ,—উৎকৃষ্ট ভাব ভঙ্গিময় নাটক—এইরূপ নানা ভাবে তিনি তাঁর অমৃতময়ী লেখনী অশ্রান্ত-ভাবে পরিচালিত করিতেছেন,—তাহার উপর বিধিদত্ত তাঁর ধনৈশ্বর্য্য,—সুতরাং তাঁহার ঈর্ষায় মন মলিন করিয়া কলম চালাইলে চলিবে কেন? আমরা সার বুঝিয়াছি—প্রাক্তন; সেই প্রাক্তনফলই সকলে ভোগ করে;—বিহারিলাল ও সুরেন্দ্রনাথই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী। বিহারিলালের সেই—

"নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার! জীবন-জুড়ান ধন হৃদি-ফুলহার।
মধুর মূরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব, সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুম-ঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিবারে পারিব না আর।
তবুও ভুলিতে হবে, কি লয়ে পরাণ লবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বার বার।"

—কবিতা পড়িয়া মনে হয়, এ কবির প্রাণ কি উচ্চসুরে বাঁধা! এমনি উচ্চ সুরে তিনি প্রাণপ্রতিমার পূজা করিয়াছেন। অন্যত্র, স্বভাবের বর্ণনায়ও

কবির কি দিগন্তপ্রসারিণী দৃষ্টি, তাহাও তাঁহার হিমালয় দর্শনে উপলব্ধ হইবে ;—

'পদে পৃথী, শিরে ব্যোম, তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে।
সমুখে সাগর ধারা, ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে॥'

এই বিহারিলাল ও 'মহিলার' কবি সুরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক ; উভয়েই যেন এক টোলের ছাত্র। উভয়েরই আদর্শ উন্নত, লক্ষ্য উচ্চ, ভাব গভীর ও গম্ভীর, রচনা সমধিক প্রসাদগুণসম্পন্ন। তবে শেষের এই অংশে সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষাও বিহারিলালের কৃতিত্ব যেন আরও অধিক। 'মহিলার' ভাষা 'সারদামঙ্গলের' ভাষার ন্যায় অমন মার্জ্জিত ও সুপরিস্ফুট নয়, একটু অনুপ্রাসের আধিক্য উহাতে আছে। তথাপি এই কাব্যও যে বঙ্গসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি সমগ্র নারী জাতিকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ;—

"যে প্রগাঢ় কাব্য পড়ি আননে তোমার, বুঝাইতে ব্যগ্র হয় মন।
যুক্ত বাক্য যোগাতে না শক্তি রসনায়, হৃদে ক্ষোভ মূকের স্বপন।"

অন্যত্র,—"বিষয়-মদিরা পানে মত্ত চিত যার, তারে কি পারিব বুঝাইতে।,
ধাতার করুণা মর্ত্তে নারী অবতার, নর-হৃদি বেদনা বারিতে॥"

এ হেন সাধক-কবিও শেষ জীবনে ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া গিয়াছেন ; গভীর উচ্ছ্বাসে মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

'দীর্ঘকাল পরে কেন, এ ভাব আবার ! কেন এ কটাক্ষ লালসার ?
কিবা না ঘ'টেছে প্রেমে, সারদে তোমার, বাকি কিবা রেখেছ আমার ?
ভোগ যশ আশা গেছে, আছে মাত্র প্রাণ, মধুগন্ধ কান্তিহীন কুসুমসমান।"

বিহারিলাল ও সুরেন্দ্রনাথ, নিভৃত সারস্বত-কুঞ্জে গান গাহিয়া গিয়াছেন, একদিন অবশ্যই ইহাঁদের প্রতিভা পূজা পাইবে।

বিহারিলালের একজন প্রধান ভক্ত—কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল বড় মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায়—মৃতকবির স্মৃতিসম্মান গান করিয়াছেন,—

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর, নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজ—নহে পৃথিবীর, নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ কাঁদ—জনম-ভূমির, সে এক দরিদ্র কবি!
এসেছিল শুধু গায়িতে প্রভাতি, না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি,—
আঁধার আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি, কুহরিল ধীরে ধীরে।
ঘুমঘোরে প্রাণী, ভাবি স্বপ্ন-বাণী, ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।"

এই অক্ষয়কুমারের প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল, শঙ্খ প্রভৃতি কয়খানি সুন্দর গীতিকাব্য আছে। গুরুর ন্যায় ইহাঁর নামও অধিক লোক জানে না, কিন্তু যাঁহারা ইহাঁর পরিচয় রাখেন, তাঁহারা ইহাঁর কবিতা পাঠে পরিতৃপ্ত হন। সেই— "গীত অবসানে নিশ্বসিল কবি—বল কি গাহিব আর,
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে, বাজিল না হৃদি-তার।"

—ইত্যাদি কবিতাগুলি যেন আমাদের কাণে বাজিয়া আছে।

এই সঙ্গে 'যোগেশ' কাব্যের প্রণেতা—কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে পড়ে। ঈশানের জীবন-পরিণাম অতি শোচনীয় হইলেও কবিতায় যে তিনি একটি করুণার সুর রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার 'চিন্তা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকদিন তাহা মনে থাকিবে। বিশেষ 'যোগেশ' কাব্যে কবির হৃদয়-প্রতিবিম্ব অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একদিন উচ্চগৌরবের জিনিস ছিল,—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সর্ব্ববিষয়িণী সাহিত্য-প্রতিভার। তাঁহার সেই 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' 'পুষ্পমালা' 'হিমাদ্রিকুসুম' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'মেজ বউ', 'যুগান্তর' 'নয়নতারা' প্রভৃতি উপন্যাস, উপভোগের জিনিস। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সেবায় তাঁহার সেই কবিপ্রতিভা এখন নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু ইহাঁর লেখায় যে একটি আন্তরিকতা আছে, তাহা হয়ত অনেকে লক্ষ্য করেন না। শিবনাথ বাবুর সেই—"চাহিনা সভ্যতা চাষা হ'য়ে থাকি, দাও ধর্ম্মধন বুকে পূরে রাখি'—এখনো যেন আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়। আর তাঁর "মেজ বউ" একখানি উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস।

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য কাব্য ও গীতিকবিতায় বঙ্গসাহিত্য-

ভাণ্ডার পূর্ণ। কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম উল্লেখ করিব? হয়ত এমন নাম—কি ইহা অপেক্ষাও যোগ্যনাম আমাদের ছাড় হইয়া গিয়াছে, কি পরেও হয়ত হইবে, তজ্জন্য কেহ যেন আমাদের অপরাধ গ্রহণ না করেন, এই প্রার্থনা। কেননা, সাহিত্যের ইতিবৃত্তরূপ এমন একটা বৃহৎ কার্য্যে এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এ শ্রেণীর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ভিন্ন এ ভ্রম সংশোধনের উপায় নাই। যদি ভগবানের কৃপায় সে শুভদিন হয়, তবে আমরা মনের সাধে, আরও হৃদয় ঢালিয়া, এ বিষয়ের অনুশীলন করিব,—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।

এইবার আমরা নব্যবঙ্গের নেতা, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের অদ্বিতীয় সম্রাট্, ক্ষণজন্মা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভা আলোচনা করিয়া, ভিক্টোরিয়া যুগের গদ্য-সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ দেখাইব। মাইকেল মধুসূদনেও যাহা অসম্পূর্ণ রহিল, প্রকৃতির প্রিয়পুত্র প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্র আপন মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তিবলে, গদ্যসাহিত্যে সেই গীতি-কবিতার মনোহর সুর মিশ্রিত করিয়া দিলেন। সেই অপূর্ব্ব মিশ্রণের ফলে ভাষা-জননীর নবজীবন সঞ্চার হইল। এখন বোধ হয় পৃথিবীর কোন সাহিত্যে এমন কোন ভাব ও চিন্তা নাই, যাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা, বঙ্গভাষায় তাহা যথাযথ প্রকাশ হইতে না পারে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া যে ভাষার গঠন ও সংস্কার করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অভিনব উপায়ে, একরূপ অদ্ভুত শক্তি দ্বারা সে ভাষার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধরাতলে অক্ষয়কীর্ত্তির অধিকারী হইলেন। এখন বঙ্কিমেরই যুগ চলিতেছে,—রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাণীর প্রিয়পুত্রগণ—সেই বঙ্কিমেরই আরব্ধ কার্য্যের সফলতা সাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র।

-*•*-

যাঁহার নাম লইয়া এই পরিচ্ছেদে হস্তক্ষেপ করিলাম, তিনিই বঙ্গসাহিত্যের চতুর্থ স্তরের রাজরাজেশ্বর সম্রাট্। তাঁহার প্রতিভালোকে সাহিত্যের সর্ব্বদিক উদ্ভাসিত; তাঁহার পিক-কুহরিত কলকণ্ঠে দিকসমূহ মুখরিত; তাঁহার হৃদয়-পারিজাত-সৌরভে দেশদেশান্তর আমোদিত;—তিনি 'সাগরী' ও 'আলালী' ভাষা দুটাকে ভাঙ্গিয়া মিশাইয়া নিজের মনের মতন করিয়া গড়িয়া, পণ্ডিত ও পুরনারীর সমান আরামের জিনিষ করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনি-শ্রবণে, যেমন ভক্তের প্রাণ বিমোহিত হয়; সে ধ্বনিশ্রবণে যেমন যমুনার জল, টলটল ঢলঢল করিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, লহরমালা তুলিতে থাকে; বঙ্কিমের ভাষাতেও যেন, সেইরূপ কি-জানি-কি একটা মিশানো আছে। স্তুতি নয়—বাহুল্যবর্ণন নয়—ভক্তির অভিব্যক্তি নয়—এক্ষণে ইহা অবিসংবাদিত সত্য। বঙ্কিমের বাঙ্গালা এখন সমগ্র বাঙ্গালা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সে কীর্ত্তি,—সে সৌভাগ্য,—সে আধিপত্য,—যদি তুমি বুদ্ধিদোষে বা হিংসাবশে, অথবা এমনই কোন একটা কারণে ঘুচাইতে সচেষ্ট হও, তবে তুমি নিজেই বিড়ম্বিত হইবে—ভগবানের রাজ্যে সত্যের কিছুতেই মার্ নাই।

বস্তুতঃ আমরা অনেক ভাবিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের চতুর্থ স্তরে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এই যে অভূতপূর্ব্ব

উন্নতি হইয়াছে এবং শনৈঃ শনৈঃ হইতেছে, ইহার মূলে বঙ্কিমের সেই প্রাণময়ী চিত্তজয়ী ভাষার আধিপত্য। বঙ্কিমের ভাষাতেই এখন—ইস্তক সংবাদপত্র হইতে নাগাইদ দর্শন-বিজ্ঞান-গ্রন্থও গ্রথিত হইতেছে। অধিক কি, পুর-মহিলারা যে সকল চিঠিপত্র লিখেন, তাহাতেও সেই বঙ্কিমের ভাবময়ী ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। আর নব্যতন্ত্রের অধ্যাপক-পণ্ডিতগণও যে, মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতের "বুকনি" দিয়া ব্যাকরণের বাঁধন কষিয়া, সব আটঘাট বাঁধিয়াও শাস্ত্র গ্রন্থাদি অনুদিত করিতেছেন তাহাও সেই বঙ্কিমের নূতন ভঙ্গিময় সন্ধি-সমাস-যুক্ত সরল-সুন্দর ভাষার একাংশ। আবার যে সব বঙ্কিম-বিদ্বেষী ভাষা-সংস্কারক, বঙ্কিমকে বা তৎপথাবলম্বী নব্য লেখককে ব্যাকরণ-ভুলের অছিলা ধরিয়া ঘোর আক্রমণ করেন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁহাকে গালি পাড়েন,—তিনিও জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সেই বঙ্কিমী ঢংয়েই 'শাদার পিঠে কালি' দিয়া থাকেন,—বা বঙ্কিমেরই সরস রসিকতার ব্যর্থ-চেষ্টা করিয়া উপহাসাস্পদ হন!—সোনার বঙ্কিম, ভাষার উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিয়া, প্রতিদানে নিজেই এইরূপ তীব্র শ্লেষ ও বিদ্বেষ-বাণ সহিয়া গিয়াছেন। "বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম" গ্রন্থে সে সব কথা, আমরা একবার বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি; সুতরাং এ গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না।

বঙ্কিমের আবির্ভাব কালের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গসাহিত্য প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার সুন্দর গদ্য সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাতে বড় একটা আকৃষ্ট হইলেন না,—সে বাঙ্গালা তাঁহারা কেহ বড় একটা পড়িলেন না;—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফলতঃ বঙ্কিমের যুগ হইতেই, বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি ইংরাজী-শিক্ষিতগণের দৃষ্টি পড়িল।

বর্ত্তমানের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়া, আজ অতীতের অনেক স্মৃতি জাগিতেছে। বঙ্গভাষার যখন সব থাকিয়াও যেন কিছু নাই;—যখন ভাষা, শব্দ-সম্পদে সৌভাগ্যশালিনী হইলেও, একরূপ অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত;—তখন অতি নিভৃতে বীণাপাণির পদতলে বসিয়া, 'সাহিত্য-ক্ষেত্রের কর্ম্মবীর' অপূর্ব্ব সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতেছিলেন। কাল

পূর্ণ হইল, সেই কর্ম্মবীরও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ;—প্রতিভাবলে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।—উপন্যাসে, ইতিহাসে, সমালোচনায়, সাহিত্য-সন্দর্ভে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ধর্ম্মতত্ত্বে, শাস্ত্রানুশীলনে,—সকল বিষয়েই তিনি অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তবে প্রধানতঃ পাঠক জুটাইবার উদ্দেশ্যে, তিনি তাঁহার সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, উপন্যাসেই বিশেষরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মিষ্ট করিয়া গল্প বলিতে পারিলেই সহজেই লোক আকৃষ্ট হয় ;—অথচ কৌশলে সেই গল্পের মধ্যেও সকল তত্ত্বই সন্নিবেশিত করা যায়। তাই, শক্তির অভাবে নহে—প্রধানতঃ পাঠক-সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই, তিনি উপন্যাসের আসর লইয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাস—হেলা-ফেলার জিনিষ নয়,—একটু শ্রদ্ধার সহিত পড়িলে, তাহাতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সকল তত্ত্বই মিলিবে। বিশেষ, তাহার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য' মিশ্রিত থাকায়, অতি গুরুতর জটিল তত্ত্বও সুখপাঠ্য হইবে। বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে এ গুণটা কাহারও ছিল না,—এবং আজিও এ গুণের সম্যক্ অধিকারী বোধ হয় কেহ হইতেও পারেন নাই। পূর্ব্বে হাস্যরসের নামে ভাঁড়ামী ও ইতর গালাগালি বুঝাইত ;—বঙ্কিমই তাহার আমূল সংস্কার করেন। এইরূপ এবং আরও অনেক রূপ উচ্চ গুণ থাকায়, বঙ্কিমের উপন্যাস, আজ 'জগতের উপন্যাস' হইতে চলিল। কেন না, ইউরোপীয় ভাষায় যখন বঙ্কিমের উপন্যাস অনুদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন দেখিতে দেখিতে তাহা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে।—ভিক্টোরিয়া-যুগে, বঙ্গসাহিত্যে এমন সৌভাগ্য আর কাহারও হয় নাই। সমগ্র বাঙ্গালী নরনারীর হৃদয়ের উপর বঙ্কিম অসাধারণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্কিম বলিতে বাঙ্গালার একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বুঝায়। সত্যই বাঙ্গালার মধ্যে, বঙ্গসাহিত্যরাজ্যে "বঙ্কিম" একজন মাত্র। বঙ্কিমকে প্রথম আসন দিয়া ঐ প্রথম আসনের গুণের তুলনায়, ঠিক দ্বিতীয় আসনে বসিবার উপযুক্ত ব্যক্তি, কে,—আজ পর্য্যন্তও ত দেখিতে পাইলাম না ? মুখে কেহ স্বীকার করুন্ আর নাই করুন্, কোন না কোন প্রকারে, সাহিত্যের এই চতুর্থ

স্তরে, বঙ্কিমের শিষ্য নন কে? সকলেই বঙ্কিমের প্রতিভালোকে অল্পাধিক আলোকিত। বঙ্কিমের অক্ষয়কীর্ত্তি—সেই সুবিখ্যাত বঙ্গদর্শনই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

এই 'বঙ্গদর্শন'—বঙ্গসাহিত্যের গৌরব,—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব। 'বঙ্গদর্শনের' আবির্ভাবে, সাহিত্যকাননে মধুর বসন্তের সমাগম হইল। নানা-জাতীয় নয়ন-তৃপ্তিকর অতি মনোহর মধুগন্ধময় ফুলদল বিকশিত হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ মলয় মারুত হিল্লোলে, কোকিলের কুহুতানে, ভ্রমর-গুঞ্জনে, পাদতলবিধৌত তটিনীর গানে, প্রকৃতি হাস্যময়ী হইল,—জড়জগৎ অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে চাঁদের হাসি, চকোর-চকোরীর সেই চন্দ্রসুধাপান, ভাবুকের সেই আত্মবিস্মৃতি,—সকলই মনোহর। সত্যই 'বঙ্গদর্শন' জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র 'কোহিনুর'। যতদিন বঙ্গভাষা, ততদিন 'বঙ্গদর্শন'।

কত ভাব, কত চিন্তা, কত উদ্যম, কত আশা, কত আলো লইয়া, 'বঙ্গদর্শন' জড়প্রায় বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ফিরিল। এক্ষণ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালীর জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। ধর্ম্মপ্রচারক ও নীতিবেত্তা, 'পুলপিটে' দাঁড়াইয়া, গগনভেদী বক্তৃতা দিয়াও যাহা করিতে পারেন নাই, এক 'বঙ্গ-দর্শন'ই তাহা করিল। বাঙ্গালীর দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, জীবনবৃত্তান্ত ও কাব্য-সাহিত্য এইবার যেন আপন পথ পাইল। নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, সুদূরদর্শিতা ও সত্যবাদিতার গুণে, 'বঙ্গদর্শন' অতি অল্পকাল মধ্যেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয় আকর্ষণ করিল।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাকে সকলেই, বিশেষতঃ বিদ্বজ্জন-সমাজ, অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বঙ্কিমবাবু গভীর দুঃখে সে সকল কথা 'বঙ্গদর্শনের' পত্র-সূচনায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সমাজের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয়। এই অবস্থায় বঙ্কিমকে বাঙ্গালা ভাষার কাণ্ডারী হইতে হইয়াছিল। বিপুল মনোবলে বলীয়ান নির্ভীক বঙ্কিম, তখন একমাত্র অদম্য উৎসাহ ও গভীর বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া, সাহিত্য-সাগরে আপন প্রতিভা-তরী ভাসাইলেন। দুর্জ্জনে উপহাস করিল; ক্ষুদ্রচেতা টিটকারী দিল; অধমাত্মা বিফলমনোরথ করিতে চেষ্টা পাইল;—ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহ, কিছুতেই

বিচলিত হইলেন না,—কিছুতেই দৃক্‌পাত করিলেন না,—একাগ্রচিত্তে আপন লক্ষ্যপথে চলিতে লাগিলেন। শেষে প্রতিভারই জয় হইল। লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমের লেখাই পড়িতে লাগিল।*

আজ সেই ভাষার বিস্তৃতি ও প্রসার দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বড় জোর পঞ্চাশ বৎসর, বঙ্কিমের ভাষা চলিয়াছে, ইহারই মধ্যে তাহাতে কি অভূতপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার! এক্ষণে যে বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা-শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে—দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, ইতিহাস, জীবনবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি সকল বিষয়েই কোন-না-কোন গ্রন্থ দেখা যাইতেছে,—ইহারও মূল বঙ্কিম। বঙ্কিমই প্রথম, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচার করিয়া, রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইংরেজ যে এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটু খোঁজ-খবর রাখেন, ইহার মূলেও বঙ্কিম। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা না চলিত;—বাঙ্গালা সাহিত্য যদি একমাত্র সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হইত, তাহা হইলে ইহার এরূপ প্রসার ও প্রতিপত্তি কখনও সম্ভবপর হইত না। অতিরিক্ত বিজ্ঞতা ও সহজসুলভ মুরুব্বিয়ানাটুকু ছাড়িয়া দিয়া একটু ধীর-ভাবে উদারচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মাত্র ৫০।৬০ বৎসরে একটা পরাধীন জাতির মধ্যে ভাষার কি অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে! এখন কোন কোন মহানুভব ইংরেজও যত্নপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ উত্তমরূপ বাঙ্গালা শিখিয়াছেনও। বাঙ্গালার কোন কোন গ্রন্থ, ইংরেজীতে অনূদিতও হইয়াছে। যখন রাজার জাতি ইংরেজ, মাৎসর্য্য-অহমিকা ত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালা শিখিতে—বাঙ্গালার ভাব ও চিন্তা উপলব্ধি করিতে এবং বাঙ্গালার কাব্য-রসের আস্বাদন লইতে উদ্‌গ্রীব;—তখন যে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি বা শক্তিসঞ্চার হয় নাই,—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে বসিয়া, এ কথা কিরূপে স্বীকার করি? যাহাই হউক, এ সকলের মূল বঙ্কিম। বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে না নামিলে,—বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা না করিলে, বাঙ্গালা

* মৎপ্রণীত 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থ হইতে এই অংশটি সঙ্কলিত।

সাহিত্য আজ কখনও রাজা প্রজা উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না ;—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন উচ্চ সকল পরীক্ষাতেও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবেশলাভও হইত না। সুতরাং সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গালা দেশ কৃতজ্ঞ—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ। অন্ততঃ কৃতজ্ঞ হওয়াই কর্ত্তব্য ও স্বাভাবিক। অবশ্য বঙ্কিমের লেখা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং উহাই যে সাহিত্যের চরম, এমন কথা বলিতেছি না। গুণ থাকিলে যে দোষ থাকিবে না, এমন কোন কথা নাই। পরন্তু, গুণের তুলনায় দোষের ভাগ—বঙ্কিমের লেখায় খুবই কম। সে কমও যাঁহারা বুদ্ধিদোষে বা ঈর্ষাবশে অথবা এমনই কোন একটা কারণে—অত্যধিক মাত্রায় পরিণত করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ও কৃপার পাত্র ;—এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন, উপস্থিত সময়ে বঙ্কিম-ভক্তগণের আর কোনও সান্ত্বনা নাই।

ভিক্টোরিয়া-রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যে শুভ অবস্থা,—এই যে আশার ক্ষীণরশ্মি,—ইহাতে আকৃষ্ট হইয়াই আমরা স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীকে ভক্তিভরে অভিবাদন করি। বলিয়াছি ত, তাঁহার সেই ৫৮ সালের 'অভয়-বাণীর' ঘোষণা না হইলে, ভারতের কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

ভারতে ইংরেজীশিক্ষা বিস্তারের প্রতিও জননীর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। সেই ইংরেজী শিক্ষার গুণেই ভারতবাসী আপনাদের জাতীয় অভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।—শিক্ষিত বাঙ্গালী তাই বঙ্গসাহিত্যের সেবায় মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা যেন ক্রমশই বুঝিতেছেন, অগ্রে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি না হইলে, কোন বিষয়েরই উন্নতি হইবে না। তাই বাঙ্গালী-জীবনে, সহস্র দুঃখ-দুর্গতির মধ্যেও বঙ্গভাষার এই ক্রমবিকাশ। মূল, স্বভাবের নিয়মবশে এই ক্রমবিকাশ হইয়াছে সত্য ; পরন্ত আমরা রাজভক্ত কৃতজ্ঞ হিন্দু সন্তান ;—তাই আমাদের সৌভাগ্য-সূচনার এই ক্ষীণ রশ্মির মধ্যেও আমরা রাজরাজেশ্বরী জননী-ভিক্টোরিয়ার সেই পবিত্রমূর্ত্তি দেখিতে পাই। অপিচ এই সাহিত্য হইতে সমাজ, সমাজ হইতে জাতীয়তা, জাতীয়তা হইতে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব হইতে ধর্ম্ম,—সকলই পরস্পর শৃঙ্খলিত। পরন্তু এই ধর্ম্মবিষয়ে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে কিছুই হয় না। তাহা যে হয় নাই, তাহা সেই কৃপাময়ী বৃটন-লক্ষ্মীর অন্তর্দৃষ্টির গুণে। ধর্ম্মের অবতারস্বরূপিণী

মাতা বুঝিয়াছিলেন,—মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস উদার উন্মুক্ত ও চিরস্বাধীন না হইলে, মানুষ কখনও মানুষ হইবে না। মায়ের সেই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সফলা হইয়াছে। আমরা আর যাহাতে সামান্য হই না কেন,—আমাদের সনাতন-ধর্ম্মাশ্রিত সাহিত্য,—সামান্য নয়। একজন সহৃদয় ইংরেজ-লেখক বলিয়াছেন,—"প্রকৃত বাঙ্গালা অতি সম্ভ্রান্ত ভাষা। এমন কোনও ভাব নাই, যাহা শ্রায়ত, তেজের সহিত, বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা না যায়।" *

বড় দুঃখ, তথাপি কোন কোন 'শিক্ষিত' নামধারী বাঙ্গালী এখনও বাঙ্গালা পড়া বা বাঙ্গালা লেখা অপমানকর বোধ করেন! কিন্তু এইটুকু তাঁহাদের বুঝা উচিত,—বাঙ্গালায় আর এখন সে দিন নাই;—দু'ছত্র ইংরেজী লিখিতে পারিলে বা ইংরেজী ভাষায় দু'টা বক্তৃতা দিয়া আসর জমাইতে পারিলে, এখন আর লোক ভুলে না। বাঙ্গালীর স্বাভাবিক অনুরাগ,—এখন তাহার জাতীয় ভাষায় আসিয়াছে। কলিকাতার দুই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেখিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াও, বিনা আবশ্যকে, কখনই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন না,—স্বভাবসুন্দর সরল মাতৃভাষায় সকল কাজ সম্পন্ন করেন।

বিশেষ, বাঙ্গালী লেখক এখন রাজদ্বারেও সম্মানিত। কেবলমাত্র বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়াই, কেহ কেহ রাজদত্ত উপাধিও লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী অক্ষম কবি ও গ্রন্থকার রাজবৃত্তি লাভে উপকৃতও হইয়াছেন। এমন কি, বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রকাশকও রাজপ্রশংসাপত্র লাভে বঞ্চিত হন নাই। এ সকলই আমাদের শুভঙ্করী স্বর্গীয়া রাজ্ঞীরই রাজত্বকালে। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে, ভিক্টোরিয়া-যুগেই, আমাদের সাধের বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্ববিধ শুভ সূচনা। তাই সভক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে, বার বার সেই স্বর্গীয়া জননীর গুণ-গান করিতে ইচ্ছা হয়।

* Author's Preface, Yates' Introduction to Bengali Language.

বঙ্গদর্শনের যুগ—সংবাদ ও সাময়িক পত্র।

ঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' হইতেই যেন নিদ্রিত বাঙ্গালী জাগরিত হইল। চারিদিক হইতে নানাশ্রেণীর মাসিকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লেখকশ্রেণীভুক্ত হইলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এখন দেশবিখ্যাত। কবিবর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ব্যতীত দার্শনিক-লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নাটককার দীনবন্ধু মিত্র, ঐতিহাসিক ডাক্তার রামদাস সেন, 'গ্রীক ও হিন্দু' প্রণেতা এবং 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত'-লেখক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তাশীল ও প্রবীণ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, 'সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি প্রণেতা ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, সুবিখ্যাত "বাল্মীকির জয়"-প্রণেতা, প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী. 'শকুন্তলাতত্ত্ব' 'হিন্দুত্ব' প্রভৃতির মাননীয় লেখক চন্দ্রনাথ বসু, 'কণ্ঠমালা' 'জালপ্রতাপচাঁদ' প্রভৃতি রচয়িতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুধী সন্দর্ভকার তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এক সময়ে বঙ্গদর্শনের লেখক ছিলেন।

৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "নানা প্রবন্ধ" গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের

গৌরবের জিনিস। এরূপ সন্দর্ভলেখক, আজিও বঙ্গসাহিত্যে, দুই চারিটির অধিক নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু বড় সরলভাবে, প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে, আলোচ্য বিষয় বিবৃত করিতে পারিতেন। এ শক্তি সকল সন্দর্ভকারের নাই। এই নানা-প্রবন্ধ ব্যতীত মেঘদূত, কাব্যকলাপ, 'মিত্রবিলাপ কাব্য', বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি তাঁহার আরও কয়েক খানি গ্রন্থ আছে।

বঙ্গদর্শন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী' 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব', 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'প্রবাহ', 'মাসিক সমালোচক',—তারপর 'নব্যভারত', 'নবজীবন', 'প্রচার' 'সাহিত্য', 'জন্মভূমি' প্রভৃতি প্রচারিত হইতে লাগিল। চারিদিকেই যেন একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি সংবাদপত্রের প্রবল স্রোত আসিল। আগেকার সেই বেঙ্গল গেজেট, সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, অবলাবান্ধব, ঢাকাপ্রকাশ, হিন্দুরঞ্জিকা প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংবাদপত্র সাধারণ লোক-শিক্ষার যে পথ সুগম করিতে পারে নাই,—বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের যুগ হইতেই সেই সংবাদপত্রও যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার ফলে সুপ্রসিদ্ধ সাধারণী, নববিভাকর, সহচর, হালিসহর পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু তবুও সংবাদপত্রপাঠের নেশা লোকের হইল না। সে নেশা হইল,—সুপ্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবাসীর' আবির্ভাব হইতে। সুলিখিত সুলভমূল্যের 'বঙ্গবাসী'ই এই নেশা বঙ্গবাসীকে ধরাইয়া দিল। 'সুলভ সমাচার' পথ দেখাইয়া গেলেও, সত্যের অনুরোধে বলিব, সম্পূর্ণ সফলকাম হয় নাই,—'বঙ্গবাসী'ই সেই ভাগ্যের অধিকারী হইল।

এ হিসাবে 'বঙ্গবাসীর' আদি প্রবর্ত্তক, অসাধারণ অধ্যবসায়শীল, গম্ভীর-বুদ্ধি, সুব্যবসায়ী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। ইংরেজের প্রথামত সংবাদপত্রের ব্যবসায় তিনিই এ দেশে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। এদেশে সংবাদপত্র লিখিয়া ও তাহার পরিচালন করিয়া যে, লোকের অর্থাগম হয়, আগে তাহা লোকের ধারণাই ছিল না। যোগেন্দ্রবাবুই প্রথম এ পথ দেখাইলেন। তাঁহার উদ্যম, উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা—প্রকৃতই অসাধারণ ছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী সেইজন্যই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞাপনের

যুগও প্রধানতঃ তাঁহা হইতেই এদেশে আসিয়াছে। কেননা, এ দেশের খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া যে, কোন ব্যবসায়ী লাভবান্ হইতে পারে, তাহা অনেকের ধারণাই ছিল না। যোগেন্দ্রবাবুই প্রথম সেই পথ দেখাইয়া যান। তাঁহার দেখাদেখি এখন সেই প্রথাই চলিতেছে। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন যে একটা প্রধান আয়, তাহা এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন। এমন কি, কোন কোন সংবাদপত্র, এই বিজ্ঞাপনের জোরেই চলিতেছে। যোগেন্দ্র-বাবুর এই সৌভাগ্যের মূলে আর একজনের প্রভাবও দেখিতে পাই। গ্রহবৈগুণ্যে এখন তাঁহার যে অবস্থাই হউক, তিনিও যে যোগেন্দ্রবাবুর একজন প্রধান সহায় এবং দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সেই আদি কার্য্যাধ্যক্ষ ও অংশী—ধর্ম্মনিষ্ঠ ও উন্নতমনা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় মহাশয়কে আমি এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। ফলতঃ উপেন্দ্রবাবুও এক সময়ে বঙ্গবাসীর জন্য কম পরিশ্রম করেন নাই। 'বঙ্গবাসীর' সে সব কথা খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি ইতিহাস হয়; কিন্তু উপস্থিত প্রস্তাবে তাহা সম্ভবে না। অক্ষয় বাবুর 'সাধারণী'তে যোগেন্দ্র বাবু প্রথম শিক্ষানবিশী করেন। উহাতেই তাঁহার সরল রস-রচনা প্রথম প্রকাশ পায়। অক্ষয় বাবুর লেখার ঢং ঢাং তিনি এমন সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, কোন কোন অংশে, যেন তিনি গুরুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সরল, মধুর, লোকমনোরম লেখার গুণে, বঙ্গবাসীর অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হয়। অবশ্য তাঁহার সহকারী অনেকেই ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্ম অনেকেই প্রথম প্রথম বঙ্গবাসীতে লিখিতেন। বঙ্গীয় লেখকগণের পারিশ্রমিকের প্রথা, এক হিসাবে, যোগেন্দ্র বাবুর আমলেই প্রচলিত হয়। যোগ্য লেখকগণকে তাঁহাদের প্রবন্ধাদির জন্য অগ্রিম টাকা দিবার ব্যবস্থা তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতে তাঁহার সুদূরদর্শিতা ও গভীর ব্যবসায় বুদ্ধি প্রকাশ পায়। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সখে কাজ হয় না, মূলে অর্থ চাই। সুলেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় সর্ব্বপ্রথম বঙ্গবাসীর সম্পাদক হন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক প্রথিতনামা ব্রাহ্মও তখন বঙ্গ-বাসীতে লিখিতেন। তারপর 'মানবপ্রকৃতি' প্রভৃতি প্রণেতা, সুলেখক শ্রীযুক্ত

ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু, দীননাথ সান্ন্যাল, স্বর্গীয় সুলেখক ও 'প্রতিমা'-সম্পাদক এবং 'ভালবাসা' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বামদেব দত্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন, দেশপ্রসিদ্ধ পঞ্চানন্দ-সম্পাদক ও 'কল্পতরু', 'ক্ষুদিরাম', 'ভারত-উদ্ধার' প্রভৃতি প্রণেতা, হাস্যরসরসিক ৺ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম্মপ্রাণ ৺ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্ক-চূড়ামণি, বঙ্গবাসীর বহু শাস্ত্রগ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, 'শক্তিকানন' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উপন্যাসলেখক ৺ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চিন্তাশীল সুধী ৺ চন্দ্রনাথ বসু, 'মানবতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও কৃষিগেজেট-সম্পাদক এবং 'বিলাতের পত্র' প্রভৃতি প্রণেতা গিরিশচন্দ্র বসু, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি অনেকেই প্রবন্ধাদি দ্বারা বঙ্গবাসীর পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এখনও 'বিদ্যাসাগর', 'শকুন্তলা-রহস্য,' 'ইংরেজের জয়' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার, 'বঙ্গভাষার লেখক' দাশুরায় প্রভৃতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গবাসীর' সেবা করিতেছেন। হরিমোহন বাবুর 'বঙ্গভাষার লেখক' হইতে এবং বিহারী বাবুর গভীর গবেষণাপূর্ণ বিদ্যাসাগর হইতে, এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমরা অনেক সাহায্য পাইয়াছি। আর যোগেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহা তিনি জানিতেন, আর আমি জানি,—আর কাহার নিকট সে মর্ম্মকাহিনী প্রকাশ করিব? যাই হউক যোগেন্দ্রবাবুর ভাগ্যই 'বঙ্গবাসীর' উন্নতির মূল ;—তা না হইলে এমন সব যোগাযোগই বা হইয়াছিল কেন? যোগেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় কীর্ত্তি—প্রাচীন লুপ্তপ্রায় গ্রন্থাদির প্রকাশ এবং অতি সুলভে হিন্দুর প্রায় যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের অদ্ভুত প্রচার। শেষোক্ত পুণ্যকার্য্যটির জন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রাচীন কবিগণের প্রতিও যোগেন্দ্র বাবুর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সেকাল-ঘেঁসা লোক তিনি ছিলেন ;—তাই বাহ্য চটকে ভুলিতেন না। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রাম যোগেন্দ্র বাবুর জন্মস্থান; পিতার নাম ৺ মাধবচন্দ্র বসু। গত ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসের ২রা তারিখে ৫১ বৎসর বয়সে, ভাগ্যবান্ যোগেন্দ্রচন্দ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। 'কালা-

চাঁদ', 'রাজলক্ষ্মী', 'মডেলভগিনী', 'চিনিবাস চরিত' 'বাঙ্গালীচরিত' প্রভৃতি তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার মানব চরিত্র-জ্ঞানের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বঙ্গবাসী' প্রচারের পর—'সঞ্জীবনী', 'সময়', 'সুরভিপতাকা' 'শক্তি', 'শান্তি',—তার কিছুকাল পরে 'বঙ্গনিবাসী,' 'হিতবাদী', 'বসুমতী', প্রভৃতি সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইল। তাহার কতকগুলি উঠিয়া গিয়াছে, কতকগুলি এখনও চলিতেছে। 'সঞ্জীবনীর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র তেজস্বী লেখক। তাঁহার রচিত 'বুদ্ধদেব' ও 'মহম্মদের জীবনচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। 'সময়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লেখক। শান্তি-সম্পাদক ৺ ধীরেন্দ্রনাথ পাল 'স্ত্রীর সহিত কথোপকথন' 'আশালতা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ স্বনামে ও বেনামে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখনী অশ্রান্ত ছিল। 'বঙ্গনিবাসীর' সম্পাদক স্বর্গীয় বামদেব দত্তের হাত বড় মিঠা ছিল। 'বঙ্গবাসীর' ভাষার মিষ্টতা তাঁহা হইতেই প্রথম দাঁড়াইয়া যায়। হিতবাদীর প্রথম সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তারপর 'রাজস্থান' প্রভৃতির অনুবাদক, 'চারুবার্ত্তা' প্রভৃতির সম্পাদক, বহু গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য 'হিতবাদী' সম্পাদন করেন। শেষ ৺ কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদ হিতবাদীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। 'মিঠেকড়া' প্রভৃতি ব্যঙ্গকবিতায় বিশারদের প্রতিপত্তি ছিল। সেই প্রতিপত্তি 'হিত-বাদীতে' দেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'—প্রাচীন পদাবলীর একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ। হিতবাদীর বর্ত্তমান সম্পাদক, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর 'বাজীরাও', 'ঝান্সীর রাজকুমার' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। 'বসুমতীর' শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সকলের পরিচিত। সমাজপতির সমধিক প্রতিষ্ঠা-তৎ-সম্পাদিত 'সাহিত্য' নামক মাসিকপত্রে। দীনেন্দ্রকুমারের হাত উপন্যাস ও আখ্যানে বেশ খুলিয়াছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য। জলধর ভ্রমণবৃত্তান্ত বেশ মিষ্ট করিয়া লিখিতে পারেন। কিন্তু ইহাঁরা কোন কাগজে স্থায়ী নন। শ্রীযুক্ত

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—সহরের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রের সংস্রবে এক একবার আসিয়াছেন, সম্পাদকতাও করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। 'আর্য্যাবর্ত্ত'-সম্পাদক, সুলেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিপত্নীক, 'অধঃপতন', 'প্রেমের জয়' প্রভৃতি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সংবাদ বা সাময়িকপত্র-যুগের সকল লেখক বা সম্পাদকের সম্যক পরিচয় দিতে গেলে আমাদের আয়ুতে কুলাইবে না,—এ ক্ষুদ্রগ্রন্থে তাহার স্থানও হইবে না। এই সঙ্গে লাহোর 'ট্রিবিউন'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নামও উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্র বাবু বহু পরিশ্রমে 'বিদ্যাপতির' একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং লীলা, তমস্বিনী প্রভৃতি তাঁর কয়েক খানি উপন্যাসও আছে।

বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনের' পর, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতির কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। আর্য্যদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতির জীবন-চরিত লিখিয়া এবং চিন্তাতরঙ্গিনী, কীর্ত্তিমন্দির, বাসবদত্তা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। তাঁহার সহকারী—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ও 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ, 'সংবাদপত্রের ইতিহাস' প্রভৃতি সন্দর্ভ এবং 'অনুশীলন ও পুরোহিত' নামে মাসিকপত্রের সম্পাদন করিয়া অনেক সাহিত্যসেবীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এইবার 'বান্ধব' সম্পাদকের কথা। স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ সি-আই-ই দুইবার এই প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের প্রচার করেন। তাঁহার প্রথম উদ্যমেই 'বান্ধবের' সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্ববঙ্গে কালীপ্রসন্ন বাবুর নাম বিশেষ সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গেও যে না হয়, এমন নহে, তবে ততটা নয়। এক সময়ে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের ন্যায় বান্ধবেরও নাম ছিল। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত এবং কবি রাজকৃষ্ণ রায়কে এই বান্ধব-সম্পাদকই প্রথম উচ্চাসন দেন। সাহিত্যের প্রতি কালীপ্রসন্ন বাবুর আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল। তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত 'নিভৃতচিন্তা' 'প্রভাতচিন্তা' 'নিশীথচিন্তা' 'ভক্তের জয়' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের

গৌরব। সন্দর্ভকার হিসাবে, কালীপ্রসন্ন বাবুর স্থান অনেক 'সাহিত্য-রথীর' উপর। এ অংশে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাওয়াল-রাজষ্টেটের ম্যানেজারী কার্য্যের সময়, জয়দেবপুরে তিনি একটি সাহিত্য সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া, অনেক দুঃস্থ সাহিত্যসেবীকে অনেক প্রকারে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। অর্থ অবশ্য রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয়ের; কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর ন্যায় মাতৃভাষার একনিষ্ঠ উপাসক, ও বিশিষ্ট সাহিত্যরথীর যোগ না থাকিলে এ কার্য্য সম্পন্ন হইত না। কালী-প্রসন্ন বাবুর রচনা সংস্কৃতানুসারিণী; কিন্তু কোথাও উৎকট বিকট শব্দ-প্রয়োগ নাই। ভাষা মার্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। একাধারে কবিত্ব ও দার্শনিকতত্ত্ব তাঁহার লেখায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সেই ভালবাসা, লোকারণ্য, নীরব কবি, অভিমান প্রভৃতি সন্দর্ভ বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বলমণি। "ভালবাসা এক মহাযজ্ঞ। স্বার্থ ইহার দান এবং মান ইহার আহুতি"—এখনও যেন আমাদের কাণে বাজিয়া আছে। ফলতঃ এরূপ চিন্তাশীল ও দার্শনিক প্রবন্ধলেখক, এ যুগে আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। বাগ্মিতায়ও কালীপ্রসন্ন বাবুর অসাধারণ অধিকার ছিল। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় তিনি সমানে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইহাঁরই 'বান্ধবে' স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মজুমদারের, 'দশমহাবিদ্যার' সমালোচনা এবং উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির রচনা প্রকাশিত হয়। নীলকণ্ঠ বাবুর কথোপকথনচ্ছলে গীতার ব্যাখ্যা প্রভৃতি এবং অক্ষয় বাবুর 'নবজীবনে' প্রকাশিত উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'মূর্খ' প্রভৃতি উপন্যাস উপভোগের জিনিষ। কালীপ্রসন্ন বাবুর নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিবৃত্তে চিরগ্রথিত থাকিবে। তাঁহার যোগ্যতা ও শক্তিমত্তা অস্বীকার করা নিতান্ত অসঙ্গত। এ অঞ্চলের কোন কোন সাহিত্য-রথী কিন্তু তাহা করেন। কেন যে করেন, তা তাঁহারাই জানেন। আমরা কিন্তু তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীর বিশেষ পক্ষপাতী।

এইবার 'ভারতীর' কথা। 'ভারতীর' প্রথম সম্পাদক ছিলেন,—সুপণ্ডিত দার্শনিক, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্র বাবুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য, মানবীকরণ, আর্য্যামি ও সাহেবীয়ানা, সোণার কাঠি ও রূপার কাঠি, 'সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা' প্রভৃতি সন্দর্ভ,—গভীর চিন্তাশীল-

তার পরিচায়ক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার ভাষা তেমন সরল ও মনোরম না হওয়ায় তাঁহার এই সকল উপাদেয় গ্রন্থ লোকে ভাল করিয়া পড়িতে পারিল না। দ্বিজেন্দ্রবাবুর এই সাহিত্যপ্রতিভার সহিত আর একটি মনস্বী ব্যক্তির সাহিত্যজীবন তুলনা করা যায়। স্বর্গগত শ্রদ্ধাস্পদ **চন্দ্রশেখর বসু** মহাশয়কে আমি এখানে উদ্দেশ করিতেছি। ফলতঃ বসুজ মহাশয়ের বেদান্তদর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ,—গভীর গবেষণা ও সূক্ষ্মদর্শনের পরিচায়ক। কিন্তু ইঁহারও ঐ ত্রুটি,—ভাষার সরলতার অভাব। তাই এই অনুপম গ্রন্থগুলি পাঠকসমাজে তেমন আদৃত হইতে পারিতেছে না। অথবা চুট্‌কী চটকের খরিদদারই বেশী; তাই এ শ্রেণীর গ্রন্থের সমধিক প্রচার বাঙ্গালায় হয় না। দ্বিজেন্দ্রবাবুর পর তাঁহার ভগিনী,—স্বর্গীয় মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, বিদুষী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতীর' সম্পাদিকা হন। স্বর্ণকুমারীর দীপনির্ব্বাণ, ছিন্নমুকুল, হুগলীর ইমামবাড়ী প্রভৃতি উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। মহিলাকবি বা গ্রন্থকর্ত্রীদের মধ্যে মাননীয়া স্বর্ণকুমারীই বোধ হয় সকলের বয়োজ্যেষ্ঠা।

তারপর 'জ্ঞানাঙ্কুর।' শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ দাসের 'জ্ঞানাঙ্কুর' মাসিকপত্রের এক সময়ে বেশ আদর ছিল। সুবিখ্যাত 'স্বর্ণলতা'-প্রণেতা, স্বর্গীয় **তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ গার্হস্থ্য উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' এই জ্ঞানাঙ্কুরেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তারকবাবুর 'অদৃষ্ট' 'হরিষে বিষাদ' 'ললিত-সৌদামিনী' নামে আরও কয়খানি উপন্যাস আছে; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিব, সেগুলি স্বর্ণলতার মত উচ্চ স্থান পায় নাই। এই জ্ঞানাঙ্কুরে শ্রীযুক্ত **চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়** মহাশয়ের সুবিখ্যাত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রথম প্রকাশিত হয়। চন্দ্রশেখর বাবু অসাধারণ লিপিকুশল ও চিন্তাশীল লেখক। এক 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' লিখিয়াই তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছেন। এরূপ মধুর গদ্য-কাব্য বঙ্গভাষায় আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। চন্দ্রশেখর বাবুর 'স্ত্রীচরিত্র'ও একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার তেমন প্রচার নাই। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের' আদর্শে আর এক খানি গ্রন্থের প্রচার হইয়াছিল, তাহার নাম 'প্রেমের পরীক্ষা।' স্বর্গীয়

কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু ইহার রচয়িতা। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিব, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের' কোমল মধুর মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষা—যেন 'বঙ্কিমচন্দ্রের' 'কমলাকান্তেরই' আর একটি সংস্করণ।

'প্রবাহ' মাসিকপত্র—স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দামোদর বাবু এক অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন,—'গীতার' একটি বহু গবেষণাপূর্ণ সুবৃহৎ অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণে। তদ্ব্যতীত তাঁহার 'মৃণ্ময়ী' 'মা ও মেয়ে', প্রতাপসিংহ, বিষ-বিবাহ, নবাবনন্দিনী প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাসও আছে। দামোদর বাবুর ভাষা বিশুদ্ধ।

"কল্পনা"-সম্পাদক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। হরিদাস বাবুর 'হেমচন্দ্র' 'পঞ্চবটী' 'রায় মাহাশয়' 'কুলীন কাহিনী' ও যোগেন্দ্রবাবুর ক'নে বউ, খুড়ী-মা, জঙ্গ্‌লী মেয়ে, আমাদের ঝি প্রভৃতি উপন্যাস এক শ্রেণীর পাঠকের খুব প্রিয়। হরিদাস বাবুর ভাষার মিষ্টতা আছে এবং যোগেন্দ্র বাবুর কোন কোন উপন্যাসে দুই একটি নাটকীয় চরিত্রচিত্রের দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্পাদিত "নব্যভারত" মাসিক পত্র বহুকাল হইতেই নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। দেবীবাবু অসাধারণ অধ্যবসায়শীল পুরুষ। সর্ব্বশ্রেণীর লেখক দেবীবাবুর নব্যভারতে লিখিয়া থাকেন। সাহিত্যসেবী মাত্রেই যেন তাঁহার আত্মীয়। দেবীবাবুরও মুরলা, শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন প্রভৃতি উপন্যাস এবং সান্ত্বনা, প্রসাদ, বিবেকবাণী প্রভৃতি বহু প্রবন্ধপুস্তক আছে। দেবীবাবুর লেখায় আন্তরিকতা ও ধর্ম্ম-ভাব পরিদৃষ্ট হয়।

'বীণা'-সম্পাদক স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের অতুলকীর্ত্তি—তাঁহার পদ্যানুবাদ সমগ্র মূল রামায়ণ ও মহাভারত। এত বড় বিরাট্ গ্রন্থ তিনি অত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহা ব্যতীত 'অবসর সরোজিনী' 'নিশীথ-চিন্তা' প্রভৃতি কাব্য, 'প্রহ্লাদচরিত্র' 'নরমেধ যজ্ঞ' প্রভৃতি নাটক, 'ঘোড়ার ডিম' 'টাকার তোড়া' প্রভৃতি খোসগল্প, হিরণ্ময়ী ও কিরণময়ী প্রভৃতি উপন্যাস—রাশি রাশি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আশ্রান্ত কবিতা-লেখক ইদানীং

আমরা আর দেখি নাই। কবিজনোচিত সহৃদয়তা, ধীরতা, নম্রতা এবং দীনতায় তিনি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তেমন সরল সত্যনিষ্ঠ আড়ম্বরহীন ধার্ম্মিক কবি, কৈ, ইদানীং ত প্রায়ই দেখিতে পাই না। সাধুচরিত্রের যদি কিছু মূল্য থাকে তাহা রাজকৃষ্ণ বাবুরই প্রাপ্য। সঙ্গীতেও রাজকৃষ্ণ বাবুর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। 'চন্দ্রহাস' নামে তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট নাটকে কয়েকটি অতি সুন্দর গান আছে। সেই—"খেলার ছলে হরিঠাকুর, গ'ড়েছে এই জগৎখানা। চারিদিকে তাই খেলার মেলা, খেলার শুধু আনাগোনা॥ খেল্‌তে খেলা ভবের বাসে, কোত্থেকে সব মানুষ আসে, খানিক খেলে খেল্‌না ফেলে, কোথায় চলে, যায় না জানা॥" —গানটি যেন এখনও আমাদের কাণে বাজিয়া আছে।

এই প্রসঙ্গে আর একজন প্রবীণ গদ্য-লেখকের নাম করিব,—তিনিও রাজকৃষ্ণ বাবুর মত অশ্রান্ত লেখক। জোসেফ উইলমটের অনুবাদক, সুপ্রসিদ্ধ 'হরিদাসের গুপ্তকথার' গ্রন্থকার তিনি। স্বনামে ও বেনামে কত গ্রন্থ যে, তিনি লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতি সরল ও সহৃদয়। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ গুপ্তকথার লেখক,—আর কেহ নন।

নবজীবন ও সাধারণীর সুবিখ্যাত সম্পাদক, মাননীয় লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অনেক লেখা—বঙ্গদর্শন, নবজীবন, সাধারণী প্রভৃতিতে ছড়াইয়া আছে, সেই গুলি সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ পুস্তক হয়। রস-রচনায় ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় অক্ষয় বাবুর অসাধারণ অধিকার। তেমনটি কৈ, আর কোথাও বড় দেখিতে পাই না। ভাষার উপরও অক্ষয় বাবুর অদ্ভুত অধিকার। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্মদর্শন, লিপিকুশলতা সবিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার সেই যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত সরল 'গোচারণের মাঠ' শিশুপাঠ্য কবিতা হইলেও অসাধারণ লিপিকুশলতার পরিচায়ক। তাহার 'আলোচনা' গ্রন্থখানিও স্কুল-পাঠ্যের হিসাবে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কিন্তু তাঁহার সমাজ-সমালোচন গ্রন্থে 'গ্রাবু' প্রবন্ধের নিকট তাঁহার সকল প্রবন্ধই বুঝি পরাভূত হয়। এইরূপ নবজীবনে প্রকাশিত তাঁহার 'বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম', 'জন্তুধর্ম্মী মানব' দুর্গোৎ-

সব', 'উদ্ভট কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং 'ভগবতী ভারতী' 'শিশু মহারাজ' প্রভৃতি কবিতা বঙ্গসাহিত্যের গৌরব। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে তাঁহার লিখিত "পিতাপুত্র" প্রবন্ধ—একটি অতি উপাদেয় সামগ্রী। আমরা চির-দিনই অক্ষয়বাবুর রচনার পক্ষপাতী এবং তাঁহার লেখার ভক্ত। তাঁহার রচনার অনেক ভাব ও ভঙ্গি, আমাদের লেখার মধ্যে আছে, মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিতেছি। এক সময়ে তাঁহার নবজীবনে আমরা কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতাম। 'ঐ সে পাষাণী' ইতিশীর্ষক আমাদের কবিতাটি ঐ নবজীবনেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর 'সৌন্দর্য্য ও প্রেম' প্রভৃতি প্রবন্ধ। সেই সূত্রে অক্ষয়বাবুর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা জন্মে। অক্ষয়বাবুর পর পরমাত্মীয় হন,—'বঙ্গবাসীর' যোগেন্দ্র বাবু। অক্ষয় বাবুর অনেক মৌলিক রচনা আছে। তাঁহার মত চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান্ ও সহিষ্ণু ব্যক্তি আমরা খুবই কম দেখিয়াছি। কিন্তু নিয়তিই সকলের মূলাধার ;—কার্য্যক্ষেত্রে অক্ষয়বাবু তেমন ফুটিতে পারিলেন না। তা হোক, শতদল (পদ্ম) কিছু বিলম্বে ফুটে। যুঁই যাতি শীঘ্র ফুটিয়া শীঘ্র লীন হয়। এ উপমাটি আমার নহে,—আমার ইষ্টদেবতা জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের। সেই পতিতপাবনের নাম লইয়া, আমরা উদ্দেশে অক্ষয় বাবুকে নমস্কার করি। কাগজে দেখিলাম, 'সনাতনী' নাম্নী তাঁহার একখানি গ্রন্থ নূতন ছাপা হইয়াছে। আমাদের ভাগ্যে সে পুস্তক পাঠ আজিও ঘটে নাই ; কিন্তু এ সংবাদেই আমরা সমধিক সুখী। এক হিসাবে অক্ষয় বাবুর উপদেশে ও দৃষ্টান্তে, আমরা গঠিত হইয়াছি। প্রথম জীবনে তাঁহার প্রভাব আমাদের বড় বেশী আসিয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে তিনি মহাজনের নিম্নের এই অমৃতময়ী উক্তিটি আমাদিগকে স্মরণ করিয়া দেন নাই কেন,—জীবন-সন্ধ্যায়—একটু অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহাই ভাবিতেছি। মহাজনের সে উক্তিটি এই ;—

"অহঙ্কারী এবং আত্মাভিমানী ব্যক্তিদিগের হস্ত হইতে উপকার গ্রহণ করিও না ; কারণ তাহারা প্রতি উপকার প্রাপ্তে কখনই সন্তুষ্ট হয় না, আর সেই উপকৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য সন্দর্শনে মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ করে। এবং আত্ম-

মাহাত্ম্য প্রচারোপলক্ষে পদে পদে তাহাকে লজ্জাস্পদে পাতিত করে।”

আকস্মিক দৈববাণীর ন্যায়, হঠাৎ এই উপদেশটি আমাদের চোখে পড়িল। সত্য সত্যই আমরা কিছু বিস্মিত হইলাম। যেন স্বয়ং ‘ভক্তের ভগবান্’ কাঙ্গাল-ঠাকুর একটি বালকের হাতে দিয়া লেখাটি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চোখে জল আসিল। চোখের জল চোখে মারিলাম। বুঝিলাম, ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

উদ্ধৃত অংশটি, একখানি প্রাচীন জীর্ণ—সেকালের ছাপা গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি; বই খানির নাম খুঁজিয়া পাইলাম না,—টাইটেল পেজটির খানিকটা ছেঁড়া। কেবল এক স্থানে লেখা আছে,— ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা-কালীন ব্যাখ্যা’—এইরূপ ষট্‌ত্রিংশ ব্যাখ্যান আছে। কিন্তু আর আমার দেখিবার আবশুক হইল না, এই এক ব্যাখ্যা পাঠেই আমি বিভোর হইলাম। হায়! যদি পনের বৎসর অগ্রে এ ছবিটি এমনি ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত হইত! অথবা, আমি এ কি ভাবিতেছি? আমার কর্ম্মফল, আমার অখণ্ড নি..ত,—কে খণ্ডন করিবে?

যাই হোক, ‘ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকালীন ঐ ব্যাখ্যাটি’ আমি সকলকে বিশেষ ভাবে পড়িতে অনুরোধ করি। প্রাচীন সাহিত্যের হিসাবেও উহা একটি অমূল্য সম্পদ। কেননা, খুব সম্ভবতঃ, মহাত্মা রামমোহন রায়ের আমলে, উক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা হইলেও ধরুন,—উহা প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা। সে বাঙ্গালাও কেমন মধুর, মনোরম এবং প্রাঞ্জল ছিল, তাহাও ভাবিবার বিষয়। অথবা এ রচনাটি মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরও হইতে পারে,—কেননা, তাঁহারও এরূপ অনেক প্রার্থনা ও উপদেশকালীন ব্যাখ্যা’ আছে; কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিলাম না,—রচনাটুকু কার।

বঙ্কিম বাবুর ভাষা সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু বড় একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। “আলালী ভাষার” ছাঁচ লইয়া বঙ্কিম বাবুর ভাষা গঠিত, কিন্তু অক্ষয় বাবু যে প্রমাণ দেখাইতেছেন, তাহাতে মনে হয়, পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ গ্রন্থের” ভাষার ছাঁচ লইয়া একটু সংস্কার

করিয়া, বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রাণময়ী মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষা গঠিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা ভাষাতত্ত্ববিদ্ মহাশয়গণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। বাঙ্গালাসাহিত্যের এই উন্নতির যুগে, বঙ্কিমবাবুর ভাষার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হয়, ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের' সেই ভাষা এখানে একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—চিন্তাশীল পাঠক বঙ্কিমবাবুর ভাষার মূল তথ্য নির্ণয় করিবেন ঃ—

"আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশ-বর্ষ-বয়স্কা এক ফরাসী যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া। তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়নযুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোল-তল এরূপ স্বচ্ছ যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবা-জন-সুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই।"—প্রকৃতই এই ভাষার ছাঁচ লইয়া বঙ্কিমবাবুর ভাষা গঠিত, এখন যেন ইহাই মনে হয়। 'আলালী ভাষা' এমন উৎকৃষ্ট, মনোজ্ঞ ও প্রসাদ-গুণসম্পন্ন নহে।

অক্ষয় বাবুর পিতৃদেব—স্বর্গবাসী রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুরের নামও বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত এখানে উল্লেখ করিতেছি। রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও যে তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং উদার অকপট ভাবে বন্ধুর মত পিতাপুত্র একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে করিতে সংসারী গৃহীকে শান্তির মধুরতা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করিলে চোখে জল আসে। মনে হয়, অক্ষয় বাবু ভাগ্যবান্ও বটে, ভাগ্যহীনও বটে। কেননা, অমন শত সাধে সজ্জিত সোণার সংসার,—আজ তাঁহার কি হইয়াছে! অথবা সংসারের নিয়মই এই,—সকলই সহিতে হয় ;—সহিষ্ণুতার এই একটা উচ্চ আদর্শ অক্ষয় বাবু আমাদিগকে দেখাইয়া গ্রহইতেছেন।

গঙ্গাচরণ বাবু 'মাতৃভাষা' সম্বন্ধে ঢাকাতে একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি 'বঙ্গভাষাকে' মা বলিয়া প্রথম সম্বোধন করেন। সাহিত্যবান্ধব

কালীপ্রসন্ন বাবু কথাটি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, বোধ হইতেছে যেন তাঁহার কোন গ্রন্থের এক স্থলে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতই উক্ত মাতৃভক্ত মহাত্মার উন্নতির মূলে—এই মাতৃভাষা ও মা। তবে তখন এত ছাপাখানা বা খবরের কাগজ ছিল না, তাই গঙ্গাচরণ বাবু অধিক লিখেনও নাই, আর তাঁর নামের জয়ঢাকও তেমন বাজে নাই। তাঁর 'ঋতুবর্ণন' সাধনসঙ্গীত এবং কতকগুলি খণ্ডকবিতা—প্রকৃতই উপভোগের জিনিস। 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' নামক কবিতাটিতে বস্তুতই তাঁহার মহান্ হৃদয়ের ছবি সুপরিস্ফুট। গঙ্গাচরণ বাবুর দুই একটি গান, এক সময়ে আমাদের সম্পাদিত "কর্ণধার" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটির দুই চরণ মনে আছে;—

"কেরে রমণী, নারী শিরোমণি, সুরী কি অসুরী, নারি চিনিতে।
অপরূপ রূপ, না হেরি স্বরূপ, ভুবন মোহিতে, উদয় মহীতে॥"

৺চন্দ্রনাথ বসু। সুবিখ্যাত 'শকুন্তলাতত্ত্বের' লেখক,—হিন্দুত্ব, ত্রিধারা, সাবিত্রী-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, সুধী ও চিন্তাশীল চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও তিনি মাতৃভাষার সেবায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার দ্বারা বঙ্গভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবুর উৎসাহে বঙ্গদর্শনেই তিনি বাঙ্গালা লেখার প্রথম সুরু করেন। তাঁহার চিন্তাপূর্ণ সমালোচনা ও দার্শনিক প্রবন্ধগুলি বঙ্গভাষার গৌরব।

প্রচার। বঙ্কিম বাবুর জামাতা ৺ রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র। ইহাতে বঙ্কিমবাবুপ্রমুখ বঙ্গের প্রায় যাবতীয় প্রধান প্রধান লেখকের রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। পন্থা-সম্পাদক, চিন্তাশীল কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের রচনা আমরা প্রথমে 'প্রচারেই' দেখিতে পাই। পন্থার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্র-নারায়ণ সিংহের পৌরাণিক কথা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

৺রমেশচন্দ্র দত্ত। মাননীয় রমেশ বাবুও বঙ্কিমবাবুর উপদেশে, বাঙ্গালা ভাষায় লেখনী ধারণ করেন। তদ্বিরচিত বঙ্গবিজেতা, জীবন-সন্ধ্যা, মাধবী-কঙ্কণ, জীবন-প্রভাত এবং সংসার ও সমাজ উপন্যাস গুলি বিশেষ আদরের সহিত বঙ্গের সর্ব্বত্র পঠিত হয়। ইংরেজী ইতিহাসে তাঁহার অসামান্য

অধিকার। পড়াশুনাও তাঁহার অগাধ ছিল। ভারতে এবং বিলাতেও তাঁহার নাম আছে। রাজকীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও যে তিনি নিষ্ঠার সহিত মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মহামহোপাধ্যায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ "বাল্মীকির জয়" বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি দুর্লভ রত্ন। এ রত্নের আদর সকলে করিতে জানে না। কিন্তু এ শ্রেণীর উচ্চভাবপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালায় দুই একখানির অধিক নাই। 'বাল্মীকির জয়' ব্যতীত শাস্ত্রী মহাশয়ের 'ভারতমহিলা' প্রভৃতি গ্রন্থও আছে। তিনি একজন অসাধারণ গ্রন্থতত্ত্ববিদ এবং প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের একনিষ্ঠ উপাসক। তিনি ও রবীন্দ্রবাবুই আমাদের 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম গ্রন্থের' মান বাড়াইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই এই সমালোচন গ্রন্থের পরীক্ষক ছিলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

৺রজনীকান্ত গুপ্ত। সুপ্রসিদ্ধ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা এবং নবভারত, ভারতপ্রসঙ্গ, ভীষ্মচরিত, আর্য্যকীর্ত্তি, প্রতিভা প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের লেখক, ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রজনী বাবু গুরুগম্ভীর ভাষায় সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও আছে। রজনী বাবু শান্তস্বভাব, বিনয়ী ও আড়ম্বরহীন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দ্বারাও বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টি হইয়াছে।

৺গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। 'বঙ্কিমচন্দ্রের' প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক, চিন্তাশীল সমালোচক, স্বর্গীয় গিরিজা বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের একজন পরম ভক্ত ও একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তিনিই প্রথমে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলির বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিয়া পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। চিন্তাশীল পূর্ণচন্দ্র বসু 'কাব্যসুন্দরী' প্রথম লিখিলেও গিরিজাবাবুর মত উদার উন্নত প্রণালীতে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের সমালোচনা করেন নাই। এই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত গিরিজা বাবুর 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি দুই একখানি গ্রন্থ আছে।

৺পূর্ণচন্দ্র বসু। কাব্যসুন্দরী, দেবসুন্দরী, সমাজচিন্তা প্রভৃতি চিন্তা-পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া, স্বর্গীয় পূর্ণ বাবু ভাবুক-সমাজে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও বঙ্কিমবাবুর একজন আদি ভক্ত ;—কাব্যসুন্দরীতেই তাহার সম্যক পরিচয় প্রকাশ।

৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। শক্তিকানন, ফুলজানি, বিশ্বনাথ প্রভৃতি কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস ইনি লিখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর ইনি একজন পরম ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। স্বভাব ধীর ও বিনীত ছিল। লেখায় আড়ম্বর ছিল না। পরিচিত ও সরল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিকাশে, ইহাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। অকালে ইনি ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। ইহাঁর বিয়োগে, বঙ্গসাহিত্যের একটি অঙ্গহানি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

৺চণ্ডীচরণ সেন। ইহাঁর রচিত টমকাকার কুটীর, দেওয়ান গোবিন্দসিংহ, মহারাজ নন্দকুমার, রামের অযোধ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে' তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। মনোরমার গৃহ, মা ও ছেলে প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাসও তাঁর আছে। 'মানব-প্রকৃতি' গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী একজন বিচক্ষণ প্রবীণ লেখক। প্রাচীন পদাবলীতে ইহাঁর বিলক্ষণ অধিকার আছে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহের 'প্রেম' 'আমি' 'নির্ব্বাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ উচ্চ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের ভূপ্রদক্ষিণ একখানি বিশেষ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর 'অনাথবালক' 'সুরবালা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইহাঁর নামের সহিত 'সুশীলার উপাখ্যান' ও 'রায় পরিবার' উপন্যাস লেখকদ্বয়ের নামও উল্লিখিত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ইহাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহা ব্যতীত অহল্যাবাই, তুকারামের জীবনচরিত, পতিব্রতা এবং স্কুলপাঠ্য কবিতা প্রভৃতি কয়খানি গ্রন্থও ইহাঁর আছে। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-প্রণেতা প্রসিদ্ধ বক্তা ও ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ। 'উড়িষ্যার চিত্র' এবং 'ধ্রুবতারা' উপন্যাসে, ইহাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর সহিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। অবিনাশ বাবুর 'সীতা' ও 'পলাসবন উপন্যাস' বঙ্গসাহিত্যে আদৃত হইয়াছে।

মালঞ্চ। মালঞ্চের নিপুণ মালাকার স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের রস-রচনা ও সাহিত্যসমালোচনা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার ‘সাহিত্যমঙ্গল’ একখানি চিন্তাপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের সহিত প্রতিভাবান্ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের সুন্দর আলোচনা আছে। নবজীবন, প্রচার, মালঞ্চ, সাহিত্য ও জন্মভূমি প্রভৃতি মাসিকগুলিতে এবং বঙ্গবাসী, বঙ্গনিবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রে তিনি রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

জন্মভূমি। যোগেন্দ্রবাবুর প্রবর্ত্তিত এবং বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকা খানি এক সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। অনেক সাহিত্য, ধর্ম্ম ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইহাতে নিয়মিত-রূপে প্রকাশিত হয়। সুধী ও শান্তস্বভাব শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনেক সরস রচনা ইহাতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সেই হইতেই বিখ্যাত। পূর্ব্বে তিনি ইংরেজী লিখিতেন। যোগেন্দ্র বাবুর উৎসাহে ও উপদেশে তিনি বাঙ্গালা লিখিতে সুরু করেন। তাঁহার বাঙ্গালা বেশ প্রাঞ্জল ও সরল। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ৺নারায়ণচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ পাইন, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনবিহারী রক্ষিত প্রভৃতি অনেকে জন্মভূমিতে লিখিতেন। ইহা ব্যতীত কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, ‘সেকালের দারোগা-কাহিনী’ প্রণেতা গিরিশচন্দ্র বসু, সুধী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রজনীকান্ত গুপ্ত, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, দীননাথ সান্ন্যাল, বিহারিলাল সরকার প্রভৃতিরও অনেক রসময়ী রচনা জন্মভূমির অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছিল। যোগেন্দ্র বাবুর সুপ্রসিদ্ধ ‘রাজলক্ষ্মী’ উপন্যাস এই জন্মভূমিতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবসাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক, শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়-দ্বয়ের নামও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। অতুলকৃষ্ণের

চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সম্পাদিত গ্রন্থ এবং ভক্তের জয় প্রভৃতি ভক্তকাহিনী এবং বলাইচাঁদের অধ্যাত্ম-রামায়ণ, রাসপঞ্চাধ্যায়, লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছে। স্বর্গগত পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' প্রভৃতি নানা উপাদেয় প্রবন্ধ এবং সুসম্পাদিত 'উপনিষদ' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনায় বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট ইষ্ট হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমান্ বিপিনবিহারী রক্ষিতের একটু স্বতন্ত্র পরিচয় দিব বিপিনবিহারী আমার কনিষ্ঠ সহোদর। তাঁহার লেখার মাধুর্য্য এবং চিন্তাশীলতা অনেকের অনুকরণীয়। তিনি অধিক লিখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অল্প যাহাই লিখিয়াছেন, তাহাই সুন্দর, সুমিষ্ট ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। এই জন্মভূমিতেই বিপিনবিহারীর বাঙ্গালালেখার একরূপ হাতেখড়ি হয়। 'মহাশ্বেতা' তাঁহার প্রথম রচনা। সেই মহাশ্বেতা পড়িয়া আমিও মুগ্ধ হই, সজ্জন ভাবুক-বৃন্দও তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার 'চিত্রদর্শন' 'ছায়া-সীতা' 'উদ্বোধন' প্রভৃতি অনেক সুচিন্তিত সাহিত্যসন্দর্ভও জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়। 'মলিনা' 'প্রেমের পরীক্ষা' 'পূজার গল্প' 'সংসারীর ব্রহ্মজ্ঞান' বিসর্জ্জন' প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট ছোট গল্প বিপিনবিহারীর রচিত। আজকাল ছোট গল্পলেখকের নমের জয়ঢাক সর্ব্বত্র বাজিতেছে দেখিতেছি,—কিন্তু গোড়ায় এ পথ দেখাইল কে, সে কথা বলিতে অনেকে নারাজ। আমার ক্ষুদ্র সাহিত্যজীবনে বিপিনবিহারীর অনেক সাহায্য আমি পাইয়াছি, মুক্তকণ্ঠে তাহা বলিতেছি। আমার অনেক গ্রন্থে তাঁহার হাত আছে। বিশেষ সেক্সপিয়রের বঙ্গানুবাদে, আমার জন্য তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মূলগ্রন্থের অনেকস্থান আমাকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; স্থানবিশেষে বা নিজেই লিখিয়া দিয়াছিলেন। সেক্সপিয়রের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সে কথা আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম; সাহিত্যের এই ইতিবৃত্তে আজ তাঁহা স্থায়ীভাবে উল্লিখিত করিলাম। ভগবৎ-কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা সন্দেহ নাই; কিন্তু বিপিনবিহারীর সাহায্যও যে আমার চিরস্মরণীয়, সে পক্ষেও সংশয় নাই।

বিপিনবিহারীর পড়া শুনা অনেক ;—সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তেমন সহৃদয় সমালোচকের চক্ষুতে নিবিষ্ট মনে পাঠ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আমার মনে হয়,তাই বিপিনবিহারী অধিক লিখিতে পারিলেন না। তারপর অন্নচিন্তাও এক কারণ বটে। সারাদিন আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া আসিয়া, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে নিয়মমত পড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিবারও তাঁর অবসর থাকে না, তা লিখিবেন কখন্? আর লিখিলেই বা সে বই কিনিবে কে? এখনও ত তাঁর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত—মাসিকে সাপ্তাহিকে নানা গল্পগাথা, সাহিত্য-সন্দর্ভ, কবিতা ও সমালোচনা প্রভৃতি ছড়াইয়া আছে,—সেগুলি একত্র করিলে ৩।৪ খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হয়; —কিন্তু উহা ছাপিলে ছাপার খরচা উঠিবে কিনা, তাহাই সন্দেহ। কেন না, এ সংসারে কলাইয়ের ডালের খরিদদারই পনেরো আনা,—পরমান্ন খায় কে? পরমান্নের পরিচয় পাইলে ত লোকে খাইবে? কিন্তু সে পরিচয় দেয় কে? খবরের কাগজ ত আমাদের হাতে নাই?—যাক, ও অপ্রিয় কাহিনী। বিপিনবিহারী অকপট সাহিত্যানুরাগী ও কাব্য-সৌন্দর্য্যের চির-উপাসক। নীরবে তিনি আত্মার উদ্বোধন করিতেছেন, তাই করুন;—এ ঝুটার সংসারে তাঁহাকে আর মিশিয়া কাজ নাই। মিশিয়া—আমরা যে মধুরতা জীবনে পাইয়াছি, বুঝি মরণের পরেও সে স্মৃতি সঙ্গে যাইবে। না, আর যেন কেউ আমার মত অশ্রান্ত জীবনসংগ্রামে ব্রতী না হয়। ভাগ্যে থাকে ত, সে আত্মজীবন-কাহিনী লিখিয়া যাইব। আমার অবর্ত্তমানে পাঠক বুঝিবেন, সাহিত্যিক বন্ধুত্বের কি অমৃত-আস্বাদ আমি পাইয়া গেলাম! বোধ হয়, আমার বিদায় লইবার সময় হইয়াছে,—এখন জগদম্বার ইচ্ছা। এখন বিপিনবিহারীর মধুময়ী রচনার একটু আদর্শ তাঁহার লিখিত একটি কবিতা হইতেই কিঞ্চিৎ দেই;—

"দাবদগ্ধ শুষ্কতরু প্রায়, প'ড়ে আছি কেন বা ধরায়!
হাসে উষা, ফুটে ফুল, বহে নদী কুল কুল, গাহে পাখী নিত্য নব গান;—***
আমি কি এদেরি কেহ, এমনি আমার গেহ, শত সাধে পুলকিত প্রাণ।**
কা'র না ফুরাতে বেলা, সমাপ্ত হ'য়েছে খেলা, কার প্রেমে এত হাহাকার;
উজ্জ্বল আকাশপটে, সহসা বারিদ উঠে, কার পথ করে অন্ধকার!

সুখ আশা শান্তিহীন, কার প্রাণ অতি দীন, কেবা ডাকে মঙ্গল মরণ :
সুন্দর ভুবন মাঝে, কার বুকে ব্যথা বাজে, কেবা চাহে মৃত্যুর স্মরণ ॥"***

কিন্তু কবির এ আক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রাণে ভগবদ্ভক্তি আসিলে প্রাণ শান্তিতে ভরিয়া যাইবে, জীবনে অপার আনন্দ আসিবে, পৃথিবী বড় সুন্দর বোধ হইবে। সেই অমলা নির্ম্মলা ভক্তির অমৃত-আস্বাদে আত্মাকে উদ্বুদ্ধ কর,—ভক্তের ভগবান্ সহায় হইবেন। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব যাঁহাদের আদর্শ, তাঁহারা এরূপ অসুখী হইবেন কেন? সেই কাঙ্গাল-ঠাকুর কল্পতরুর চরণে আরও নির্ভর কর. আরও বিশ্বাস আনো, আরও ডুব দাও,—অমূল্যনিধির অধিকারী হইবে। ভাগ্যে থাকেত, ইহজন্মেই হইবে। তখন আত্মজীবন কেন, তোমার চারিপার্শ্বের শত শত বিড়ম্বিত জীবনকেও তুমি ধন্য করিতে পারিবে। মা যার সহায়, তার ভয় কি? সাহসী হও, অকুতোভয় হও, একনিষ্ঠ হও,—জগদম্বার চরণে কাঁদিতে শিখ',—জীবনে এ উত্তাপ থাকিবে না 'মরণ মঙ্গল' গান আর গাহিতে হইবে না।

সাহিত্য।—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত। সাহিত্যে অনেক প্রবীণ সাহিত্যসেবীর সহিত অনেক নবীন লেখক ও লেখিকাও লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের পরিচয় দেওয়া একরূপ অসম্ভব। সুপণ্ডিত স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মত লোকও সাহিত্যে লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, শ্রীযুক্ত সচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি সাহিত্যে লিখিয়া থাকেন। সাহিত্য একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্র সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল হইতে ইহা নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

উদ্বোধন।—স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত মাসিক পত্র। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম লইয়া, তাঁহার প্রধান শিষ্য ও সহচর,—চিরকুমার স্বামিজী,—জ্বলন্ত বাগ্মিতায় একরূপ দিগ্বিজয়ী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিব্রাজক, বীরবাণী, 'পত্রাবলী' 'বর্ত্তমান ভারত' প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থও আছে। আর ইংরাজীতে তাঁহার রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ,

জ্ঞানযোগ, ভক্তিরহস্য, 'মদীয় আচার্য্য দেব' (My Master) প্রভৃতি বহু বহু বক্তৃতা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যে যেন এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। সুখের বিষয়, ঐ সকল গ্রন্থের সুন্দর বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ হওয়ায় বঙ্গসাহিত্যেরও বিশেষ পুষ্টি হইতেছে।

ঠাকুরের আদি ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত দ্বারাও বঙ্গসাহিত্যের কম পুষ্টি হয় নাই। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে, প্রকাশ্যভাবে, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে—স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। রামবাবুর নিকট রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের ঋণ অপরিশোধনীয়। এই মহাত্মার 'পরমহংসদেবের জীবনচরিত', 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' 'বক্তৃতাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের এক অমূল্য মণি। এ মণির পরিচয় সকলে এখনও লইতেছেন না, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। অথবা ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমেই তাহা হইতেছে,—মানুষ কি করিবে? 'রামকৃষ্ণ-পুঁথি' প্রণেতা ও 'রামকৃষ্ণ-মহিমা' প্রভৃতির শ্রদ্ধেয় লেখক, অটল বিশ্বাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন এবং 'তত্ত্বমঞ্জরীর' বর্ত্তমান সম্পাদক, অহেতুক ভক্তির অধিকারী, আমার সোদরপ্রতিম দীন সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসার' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন পদাবলী'তে নীরবে ঠাকুরের যে মহিমা প্রচার করিতেছেন, মনে হয়, তাহার ফলে একদিন অনেকের চক্ষু ফুটিবে। অক্ষয় বাবুর 'রামকৃষ্ণ-পুঁথি' চৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় একদিন ভক্তসমাজে সমাদৃত হইবে এবং বিজয়বাবুর 'রামকৃষ্ণ প্রভাতী' শীর্ষক—দেবীর বরে লিখিত অমর সঙ্গীতটি—একদিন বঙ্গের গৃহে গৃহে গীত হইবে, আশা রহিল। মাতৃকণ্ঠে গীত সেই দেব-সঙ্গীতটি এখনো যেন প্রাণে ধ্বনিত হয়, আর সেই সঙ্গে কত কথাই মনে জাগে। হায় মা! আবার কি তেমনি ভাবে সে বেদগান শুনিতে পাইব না? শুনিতে পাইব না কি,—"দেব-নর মনোহর, জয় শ্রীদক্ষিণেশ্বর, শ্রীপ্রভুর লীলা-নিকেতন। (এমন হোয়েছে না হ'তে আছে—শ্রীপ্রভুর লীলা-নিকেতন)" ধন্য ভক্ত, ধন্য ভাগ্যবান্ গীত-রচয়িতা!

এই ভক্তির চরম অধিকারী হইয়াছেন,—পরম ভক্ত, পরম জ্ঞানী, পরম পণ্ডিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের" ভাগ্যবান্ লিপিকার—পূজনীয়

শ্রীম। এই 'ম' বা মাষ্টার একই ব্যক্তি। ঠাকুরের সন্তান ও সেবকরূপে ছায়ার ন্যায় কিছুকাল ইনি সেই দেবসঙ্গ করিয়া, দেবকৃপায় দুর্লভ মানবজন্ম সফল করিয়াছেন, কষিত কাঞ্চন হইয়াছেন, আর আমাদের ন্যায় ত্রিতাপ-জ্বালা-প্রপীড়িত পথভ্রষ্ট পথিককে তাঁহার অমৃত ভাণ্ডার হইতে অপূর্ব্ব 'কথামৃত' বিলাইয়া, অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। প্রকৃতই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত দ্বারা—সাহিত্যে, সমাজে, ধর্ম্মে ও অধ্যাত্মজগতে যে শুভফল হইল, হইতেছে এবং অনন্তকাল হইবে, তাহার তুলনায় বক্তৃতা বা ব্যাখ্যা কিছুই নয়। সাহিত্যের ইতিবৃত্তে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের' ভাগ্যবান্ লিপিকার—নীরব সাধক ও আড়ম্বরহীন ভক্তের—প্রকৃত নাম উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ করি। মাননীয় লেখক মহাশয় আমাদের অপরাধ লইবেন না। কেন না, এরূপ একখানি বেদবাক্য তুল্য স্বর্গীয় গ্রন্থের রক্ষাকর্ত্তার ঠিক ঠিক পরিচয় না দিলে অতঃপর গোলযোগ হইতে পারে। ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে সুপণ্ডিত, সুশিক্ষিত, উন্নতমনা, নিরহঙ্কার, আদর্শ-ভক্ত, মহাত্মা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই 'রামকৃষ্ণ কথামৃতের' ভাগ্যবান্ লিপিকার। মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আমাদের ঋণ ইহজীবনে পরিশোধিত হইবে না। কথামৃতের অনেক স্থানে, তাঁহার নিজের লেখাও অতি অপূর্ব্বভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'সেবক-হৃদয়ে' প্রভৃতি উচ্ছ্বাস,—বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতিতে ভক্ত ও ভাবুক-লেখকের হৃদয় ও মন কি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে! ঠাকুরের 'কথামৃতের' ভাষা ও তাঁহার নিজ ভাষা যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইষ্টগুরু—স্বয়ং জগদ্‌গুরুকে যিনি এরূপ একনিষ্ঠার সহিত ভাবিতে ও ভাবাইতে পারেন, তাঁহার শক্তি ও সৌভাগ্য পূজ্যর জিনিস। প্রকৃতই 'কথামৃত' অমৃতের প্রস্রবণ! এ অমৃত-পানে জীব অমর হইবে। কথামৃত পড়িয়া অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিলেই যেন বাঘ বলিয়া মনে হয়; পড়িয়াও দেখিয়াছি, যেন আলুনি-আলুনি ঠেকে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" ধ্যানের বিষয়। আমরা সেই দয়াল ঠাকুরের ধ্যানের সহিত, এই ভাগ্যবান্ লিপিকারকে, সভক্তি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বার বার প্রণাম করি।

নাট্যসাহিত্য—দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি।

ঙ্গালা নাটকের পথদ্রষ্টা ও প্রথম নাটককার ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন; তার পর মাইকেল প্রভৃতি। রামনারায়ণের কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব, নবনাটক, রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি আদি নাটক। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকের সম্পূর্ণ সংস্কার করেন,—নাট্যরথী দীনবন্ধু। নাটকে, মাইকেলও যে সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই, এক 'নীলদর্পণ' দ্বারা দীনবন্ধু তাহাই করিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বলমণি। ঐতিহাসিক ঘটনার ন্যায় এখানি বঙ্গসাহিত্যে চিরগ্রথিত থাকিবে। নীলদর্পণের তুলনায় দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনী বা লীলাবতী অত উচ্চ স্থান পাইতে পারিবে না, বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন। তবুও তাহাতে দীনবন্ধু বাবুর স্বাভাবিক পরিহাসপটুতার হ্রাস হয় নাই। সেক্সপিয়ারের ফলষ্টাফের চিত্র লইয়া জলধর ওরফে হুতোলকুৎকুতের চরিত্রটি দীনবন্ধুবাবু অঙ্কিত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহার তুলিকা সেই ফলষ্টাফকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'সধবার একাদশীর' লিপিকুশলতা ও চরিত্রচিত্রণ উৎকৃষ্ট হইলেও, সত্যের অনুরোধে বলিব, ইহার রুচি ও ভাব প্রশংসনীয় নহে,—বরং নিন্দারই বিষয়। হাস্যরসের উদ্দীপনায় ও লোক-চরিত্রের উন্মেষণায়, দীনবন্ধু বাবুর অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁহার 'যমালয়ে জীবন্ত

মানুষ' প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় স্থল। দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' 'বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো' প্রভৃতি প্রহসনও এই হাস্যরসের খনি। কিন্তু ইহার স্থানে স্থানে মাইকেলের ছায়া আছে। সুরধুনী, দ্বাদশকবিতা প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতাও দীনবন্ধু রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার একটি আজিও আমাদের কণ্ঠস্থ আছে;—"যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে। বারেক নিরাশ হোয়ে কে কোথায় মরে॥ তুফানে প'ড়েছি কিন্তু, ছাড়িব না হাল। আজিকে বিফল কিন্তু, হ'তে পারে কাল।"

বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণবধর্ম্মের একনিষ্ঠ উপাসক, 'অমিয় নিমাই-চরিত', 'কালাচাঁদ-গীতার' ভাগ্যবান্ কবি,—বঙ্গসাহিত্যের একজন অকপট বন্ধু—স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও এক সময় নাট্যসাহিত্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফল তাঁহার "নয়েশারূপেয়া"। প্রধানতঃ কৌলিন্য পণ-প্রথায় কটাক্ষ করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। শিশির বাবুর 'নিমাইসন্ন্যাস'ও একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমূলক নাটক। ইহার পর আর একখানি ভাল নাটক রচিত হয়,—৺হরলাল রায় প্রণীত 'হেমলতা' তার পর আর একজন প্রতিভাবান্ নাটককার বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিলেন,—সুপণ্ডিত ৺ উপেন্দ্রনাথ দাস। ফলতঃ উপেন্দ্র বাবুর 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' এক সময়ে নাট্য-সাহিত্যের মান রাখিয়াছিল। মনোমোহন বাবুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এই সঙ্গে আর একটি নামও উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমি এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর সেই 'নন্দবংশোচ্ছেদ' সে সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। 'শকদুহিতা' প্রভৃতি ইঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' ও 'উভয় সঙ্কট' প্রকৃতির প্রকৃত লেখক কে, আমরা জানি না। এই সব প্রহসন এবং দুই একজন অজ্ঞাত লেখকের আরো দুই এক খানি নাটক, এক সময়ে রঙ্গসাহিত্যের নাম রাখিয়াছিল। সুতরাং সাহিত্যের ইতিবৃত্তে, অন্ততঃ তাহার এক একটু উল্লেখ থাকাও বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর সুকবি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাল। জ্যোতিবাবুর সরোজিনী, পুরুবিক্রম, অশ্রুমতী নাটক এক সময়ে বিশেষ

সমারোহের সহিত দেশীয় রঙ্গমঞ্চগুলিতে অভিনীত হইত। তাঁহার সেই "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা' এবং সত্যেন্দ্র বাবুর "মিলে সবে ভারত-সন্তান" ইতিশীর্ষক গান এক সময়ে লোকের মুখে মুখে ফিরিত। ইদানীং জ্যোতিবাবু প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সহিত একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় সংস্কৃত নাটকাবলীর সুন্দর মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ফলতঃ ইহাঁর অভিজ্ঞান শকুন্তল, রত্নাবলী, উত্তরচরিত, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী, চণ্ডকৌশিক, বেণীসংহার প্রভৃতির বঙ্গানুবাদে ইনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে চিরোজ্জ্বল থাকিবে। জ্যোতিবাবু নিরহঙ্কার, অমায়িক, আড়ম্বরহীন ও মধুর প্রকৃতিক সাহিত্যসেবী। গুণের তুলনায়, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার আরও নাম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি হুযুগে লোক নন, দল পাকাইতে ভালবাসেন না,—তাই নীরবে আপন আরব্ধ কাজ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান অনেক রথীর অনেক উচ্চে।

এইবার নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের কাল আসিল। প্রতিভাবান্ কবি-নাটককার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চ-পরিপুষ্ট নাট্য-সাহিত্যের গুরু। প্রধানতঃ তাঁহারই আদর্শে, উপদেশে, ভাবে ও ভাষায়—বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যের গতি ফিরিয়াছে। তাঁহার ছন্দঃ, উচ্চারণ, ভঙ্গি, গতি, ঢং ঢাং প্রভৃতি —প্রায় সকলেই এখন আয়ত্ত করিতে যায়। কেননা, একাধারে তিনি অদ্বিতীয় অভিনেতা, তার উপর দুর্লভ 'কবিপ্রতিভার'ও অধিকারী। কিন্তু আমরা বলি, তাঁহার তুলনা তিনি। নকলে আসল পাওয়া যায় না;—নকল নকলই থাকে। পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক ধর্ম্মমূলক—সর্ব্ববিধ নাটকই তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রথম উদ্যমের রাবণবধ, সীতার বনবাস, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস হইতে আরম্ভ করিয়া, মধ্য জীবনের চৈতন্যলীলা, রূপসনাতন, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল, পূর্ণচন্দ্র, বিষাদ,—তারপর প্রফুল্ল, হারানিধি এবং বর্ত্তমানের সিরাজউদ্দৌলা, শিবাজী, অশোক, বলিদান, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি—সেই একই সুরে বাঁধা। ঠিক অমনটি আর কেহ পারে নাই, পারিবেও না। তবে সত্যের অনুরোধে

বলিব, সর্ব্ববিষয়ে লেখনী চালনা করিতে গিয়া, স্থলবিশেষে যেন তিনি নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—তাঁহার "সপ্তমীতে বিসর্জ্জন" প্রভৃতি দুই একখানি প্রহসন এবং 'লীলা' প্রভৃতি দুই একখানি উপন্যাসের উল্লেখও এখানে করিতে পারি। ওরূপ প্রহসন বা উপন্যাস, তৃতীয় শ্রেণীর লেখকও লিখিতে পারে। আমাদের মনে হয়, যার যে থাক্, তার সেই থাকে থাকাই সঙ্গত। সর্ব্ববিষয়ে অদ্বিতীয় হইবার চেষ্টা করিতে নাই। কেননা বেশী বড় হইবার জন্য আকুপাকু করিতে গেলেই পড়িয়া যাইতে হয়। যশোলিপ্সা? অর্থার্জ্জন? আর কেন? ঢের হইয়াছে।—স্বয়ং ভক্তের ভগবান্ একহিসাবে তাঁহাকে সকলের বড় করিয়া গিয়াছেন। সে দিন একখানা কাগজে দেখিলাম,—গিরিশবাবু একটি বিবাহের কবিতাও লিখিয়াছেন! হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। হাসি পাইল—কবিতা পড়িয়া; দুঃখ হইল—অতবড় একটা ক্ষণজন্মা শক্তিশালী দৈবকৃপাপ্রাপ্ত পুরুষের দুর্গতি দেখিয়া। কেন না, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ পরমহংসদেবের বিশেষ কৃপা-প্রাপ্ত চিহ্নিত সন্তান। তাঁর এ সব ছেলে-মানুষী খেলার কাল এখন কাটিয়া গিয়াছে। তিনি এখন থিয়েটারাদি ছাড়িয়া, অনন্যকর্ম্মা হইয়া, অবিচলিতা নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের কথা কহিবেন, আমরা কাণ পাতিয়া শুনিব। সেই পুরুষোত্তমের অমৃতময়ী বাণী শুনাইয়া আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিবেন,—আমরা তাঁহার পদতলে গড়াগড়ি দিব,—ইহাই শত শত ভক্তের প্রাণের কামনা। মুখ ফুটিয়া এ কথা তাঁহাকে কেহ বলিতে পারে না, অথচ আড়ালে কাণাঘুসি করে। গিরিশবাবু উদার, মহান্,—একরূপ মুক্তপুরুষ; সুতরাং স্তুতি-নিন্দার পার। আশা করি, এই অপ্রিয়প্রসঙ্গ তুলিলাম বলিয়া, তিনি আমাদের উপর রাগ করিবেন না; কিংবা আমাদের অপরাধও লইবেন না। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়াছি, গোঁজামিল দিয়া কলম চালাইব না, তাই এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে বাধ্য হইলাম। নহিলে, আমরা, গিরিশ বাবুর পরম ভক্ত; কেননা তিনি সেই ভক্তবৎসলের সাক্ষাৎ-কৃপা পাইয়া-ছেন;—সে হিসাবে আমরা তাঁহার পদরেণুরও যোগ্য নই। কিন্তু সেই গুরুকৃপা যদি এই ভাবে ক্ষয় হয়? তখন আমরা কা'র আদর্শ লইয়া সংসারে যুঝিব? গিরিশবাবু আত্মজীবনে পথ দেখাইয়া দিন, আমরা তাঁর

পদাঙ্ক অনুসরণ করি।(নাট্যসাহিত্যে গিরিশবাবু অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। তাঁহাকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যা দিয়াই আমরা সন্তুষ্ট নহি,—নাট্যসাহিত্যের সেক্সপিয়র বলিলেই যেন ঠিক হয়। উত্তরকালে নিরপেক্ষ সাহিত্যবিদ্ তাঁহাকে এ উচ্চসম্মান দিতে হয়ত কুণ্ঠিতও হইবেন না, এ বিশ্বাসও আমাদের রহিল। কালে তাঁহার সকল নাটক লোপ পাইলেও, এক 'বিল্বমঙ্গল' তাঁহাকে এ উচ্চ আসন দিবে। বিল্বমঙ্গলের স্বর্গীয় ও অপূর্ব্বভাব, আকাশের ন্যায় উদার এবং সমুদ্রের ন্যায় গভীর। পরমহংসদেবের অনেক মহান্ ভাব লইয়া এ মহানাটক রচিত,—কাল-নিশ্বাসে ইহার ক্ষয় নাই। জ্ঞানের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময়ী উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমিও বলি,—'আমার জীবনে এমন উচ্চনাটক আমি পাঠ করি নাই।' এইরূপ 'নসীরাম'—চিত্রটিতেও গিরিশবাবু অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ঠাকুরকে ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে হইলে, এই অপূর্ব্ব চিত্রটি, ভক্তগণের বিশেষভাবে দেখার দরকার। আর ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে,—কবির সর্ব্ববিধ সঙ্গীত রচনায়। কি সাধনসঙ্গীত, কি প্রেমসঙ্গীত, কি বিরহসঙ্গীত—গানে গিরিশবাবুর তুল্য নৈপুণ্য,—বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই। সরল সাদা কথায় ভাবের অমৃতলহরী তিনি যেমন ছুটাইয়াছেন, ঠিক তেমনটি, ভিক্টোরিয়া-যুগে, আজ পর্য্যন্ত কেহ পারেন নাই, ইহাই যেন মনে হয়। দৃষ্টান্ত লউন;—

(১) এমন সাধের হরিনাম, হরি বলনা।
সাধের পণে কিনবি হরি, সাধ কেন তোর হ'লো না॥

(২) "নেচে নেচে আয় মা শ্যামা, আমি মা তোর সঙ্গে যাব।
দেখ্‌বো রাঙ্গা চরণ দুটি, বাজবে নূপুর শুন্‌তে পাবো॥"

(৩) "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবিগো তাই॥"

(৪) "সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী।
পাগলে করেছে পাগল তাইতে ঘরে থাকিনি॥"

(৫) "কেজানে মজাবে নয়নে। নাবুঝে অবোধ আমি কি ছবি এঁকেছে প্রাণে।

চুম্বকমাত্র উদ্ধৃত এই গানগুলি পড়িলে প্রকৃত ভাবুক ও ভক্তের চোখে জল আসে। এমন শত শত গান তাঁহার অনুপম নাটকাবলীতে সজ্জিত আছে। গিরিশ বাবুর এ শক্তি বা সৌভাগ্য ঈশ্বরদত্ত,—তুমি আমি তাহা 'নয়' করিতে গেলে উপহাসাস্পদ হইব মাত্র।

গিরিশবাবুর পর নাট্যসাহিত্যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর স্থান। কিন্তু অমৃত বাবু প্রহসনেই সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, নাটকে নহে। ফলতঃ তাঁহার অদ্বিতীয় প্রহসন "বিবাহ বিভ্রাট" সকলের শীর্ষস্থানে। স্বয়ং গিরিশবাবু অথবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নাটককার দীনবন্ধু—এমন কি মাইকেল পর্য্যন্ত, এ বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা আমাদের সরল বিশ্বাস বিবাহ বিভ্রাটের পর অমৃতবাবুর কৌতুক ও বিদ্রূপ-নাট্য—রাজা বাহাদুর, তাজ্জব ব্যাপার, বাবু ও গ্রাম্যবিভ্রাট—রস-রসিকতায় পূর্ণ হইলেও, অত উচ্চাঙ্গের নয়। তেমনি তাঁহার তরুবালা, বিজয়বসন্ত বা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নাটকের স্থানে স্থানে যথেষ্ট লিপিকুশলতা ও চরিত্রচিত্রের দক্ষতা থাকিলেও, গিরিশবাবু, দীনবন্ধু বাবু বা মাইকেলের নাটকাবলীর সহিত তাহা তুলনীয় হইতে পারে না। কিন্তু বিদ্রূপাত্মক Satire-এ তাঁহার যে অদ্ভুত ক্ষমতা পরিদৃষ্ট হয়, এক ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ ছাড়া, তেমন শক্তি—তেমন দক্ষতা আর কাহাতেও দেখি না। ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দও স্থলবিশেষে হয়ত একটু দুর্ব্বোধ, একটু অস্পষ্ট; কিন্তু অমৃতবাবু বড় মিষ্ট করিয়া খোলাখুলি বলিতে পারেন। সমাজ-শরীরে তাঁহার তীব্র-মধুর কষাঘাত এক সময়ে কম কাজ করে নাই। এখন তিনি হাত গুটাইয়াছেন, অথবা ভগবান্ তাঁহার সেই মন্ত্রপূত কুহকদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছেন, ইহাই আমাদের দুঃখ।

কবি ৺রাজকৃষ্ণ রায়, ৺প্রমথনাথ মিত্র, ৺বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়, ৺কুঞ্জবিহারী বসু—ইহাঁরাও অল্পবিস্তর নাট্যসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিব, উপরের ঐ দুই নাট্য-রথীর তুলনায় তাঁহাদের কৃতিত্ব স্থায়ী হইল না;—ইহারই মধ্যে কাহারও কাহারও নাম লোপ পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্রও 'আদর্শ সতী', 'নন্দবিদায়' প্রভৃতি কয়েক খানি গীতিনাট্য লিখিয়াছেন; তাঁহার কয়েকটি গান বঙ্গসাহিত্যে থাকিয়া যাইবে। বাল্যে আমরা তাঁহার সেই 'চারু আঁখি নত করি, কি

ভাব তাপসবর' গান শুনিয়াছি, আর জীবনমধ্যাহ্নে শ্রুত তাঁর সেই ভক্তি-রসাশ্রিত "আর ত ব্রজে যাব না ভাই, যেতে প্রাণ আর নাহি চায়। ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়॥"—এইভাবের গানগুলি যেন এখনো আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হয়। বিশেষ, বঙ্কিম বাবুর অনেক উপন্যাস তিনি নাটকাকারে প্রবর্ত্তিত করিয়া এক সময়ে যথেষ্ট গুণপনার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এ পরিচয়ের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছিল,—স্বর্গীয় কেদার-নাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক নাটকাকারে প্রবর্ত্তিত 'আনন্দ মঠে' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাঠে'। কেদারবাবু নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা এবং প্রথম শ্রেণীর নাটককার ছিলেন। তাঁহার সেই 'পাণ্ডব-নির্ব্বাসন' ও 'ছত্রভঙ্গ' প্রভৃতি নাটক এক সময়ে সমারোহের সহিত বঙ্গের নাট্য-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। যশোভাগ্য কেদার বাবুর তেমন ছিল না, তাই তিনি জীবিতকালে তেমন যশঃ অর্জ্জন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সাহিত্যের এই ইতিবৃত্তে, তাই আমরা কেদার বাবুর সেই 'নাট্য-প্রতিভা' একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম।

ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সুলেখক, আড়ম্বরহীন ও মধুরস্বভাব রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়ও কিছুদিন নাট্যসাহিত্যের আসরে নামিয়া ছিলেন। তাহার ফল,—তাঁহার 'রামপ্রসাদ', 'বসন্তসেনা', 'মান' ও 'নাট্য-বিকার' প্রভৃতি। সঙ্গীতে বৈকুণ্ঠবাবুর বিশেষ অধিকার আছে।

ইহাঁদের পর আর তিনটি লোক নাট্য-সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন। ১ম, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ; ২য়, কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ৩য়, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ক্ষীরোদ বাবু প্রতাপাদিত্য, রঘুবীর প্রভৃতি দুই একখানি নাটকে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; দ্বিজেন্দ্র বাবু রাণা-প্রতাপ, দুর্গাদাস, সাজাহান নাটকে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন; অমরেন্দ্রনাথ সুদক্ষ অভিনেতা হইলেও, নাট্য-সাহিত্যের আসরে সবে মাত্র নামিয়াছেন,—সুতরাং এখনো তাঁর নাটক-নাটিকার ঠিক সমালোচনার দিন আসে নাই। তবে এ বিষয়ে যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে, তাহা তাঁহার উদ্যম দেখিয়া মনে হয়। মধ্যে 'রঙ্গালয়' নামে তিনি একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন; সংপ্রতি 'নাট্যমন্দির' মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'কামিনী ও কাঞ্চন' প্রভৃতি উপন্যাস

নাটকাকারে প্রবর্ত্তনে, ইহাঁর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর যাঁহারা মধ্যে মধ্যে থিয়েটারে দুই একখানি নাটক দিতেছেন এবং যাহার অভিনয়ও হয়ত সময় সময় উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এখন বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এ শ্রেণীর একখানি নাটক 'হরিরাজ', ২য় খানি রিজিয়া, ৩য় ও ৪র্থ পৃথ্বীরাজ ও সংসার, ৫ম কল্যাণী, ৬ষ্ঠ কালপরিণয়, ৭ম আকবরের স্বপ্ন, ৮ম বাজীরাও, ৯ম ও ১০ম বীরপূজা ও বেহুলা।

কিন্তু ক্রমেই যেন বিশুদ্ধ ও উচ্চাঙ্গের নাট্যসাহিত্য কিছু নামিয়া পড়িতেছে, আর তাহার স্থানে কুৎসিত নৃত্যগীতপূর্ণ প্রহসন বা প্যাণ্টোমাইম্ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। সাধারণতঃ সংবাদপত্রেরও যে দুর্দ্দশা, থিয়েটারেরও তাই। অথচ এই দুই প্রবল শক্তি মনে করিলেই অতি অল্প আয়াসেই সাধারণ লোকশিক্ষার পথ অনেক সুগম করিতে পারেন,—লোকের মতি গতি ফিরাইতে সক্ষম হন,—সমাজের যে নৈতিক বায়ু অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠিয়াছে,—সেই দূষিত বায়ুকেও বিশুদ্ধ করিয়া প্রকৃত 'সমাজ-বন্ধু' নাম গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু দেশের ভাগ্যে তাহা হইবে কি? বোধ হয় ত না। কেননা, আমরা আজ দশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, এখনও দেখিতেছি তাই,—অথবা যেন অধঃপতন আরও চরমমাত্রায় আসিতেছে। আমাদের সেই 'নব্যভারতে' প্রকাশিত পরে 'সাহিত্যসাধনায়' পুনর্ম্মুদ্রিত সেই পুরাতন প্রবন্ধটি এখনও প্রকাশের আবশ্যক আছে বুঝিতেছি। যথাস্থানে তাহাই পুনরুদ্ধার করিব। কেননা, এখন পূর্ণমাত্রায় সংবাদপত্র ও থিয়েটারের যুগ। ইহাতে অনেক জিনিসই চাপা পড়িতেছে। উত্তরোত্তর ইহার প্রভাবও যেন বাড়িতেছে। সুতরাং 'সংবাদপত্র ও থিয়েটার' সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বমতই অক্ষুণ্ণ আছে।

কিন্তু এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের অলোচনার পূর্ব্বে আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের স্কুলে পঁহুছিতে হইবে। কেন না, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে, বাণীর প্রিয়পুত্র প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথের আধিপত্যই অধিক।

রবীন্দ্রনাথ।

ক্টোরিয়া-যুগে গীতি-কবিতার রাজা আমাদের রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার পথ সম্পূর্ণ নূতন। ভাষা, ভাব, ভঙ্গি,—সকলই নূতন। তাঁহার রচনা পদ্ধতি, তাঁহার ভাবুকতা, তাঁহার গদ্য পদ্য গান—উপভোগের জিনিস। ছোট গল্পে, বঙ্গ-সাহিত্যে তিনি যেন একটা যুগান্তর করিয়াছেন। সে হিসাবে তাঁহার বড় উপন্যাসও আমাদের ভাল লাগে না। সত্য বলিতে কি, তাঁহার "চোখের বালী" পড়িয়া মনে হয়, যেন তিনি নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সে হিসাবে, একরূপ বালককালের লেখা হইলেও, তাঁহার 'বৌঠাকুরাণীর হাট' পড়িয়া আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। কবি যে একদিন সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, তাহা দূরদর্শী অক্ষয়চন্দ্র ধরিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার 'সাধারণী'তে তিনি রবীন্দ্রনাথকে—তথা তাঁহার 'বৌঠাকুরাণীর হাটকে' অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন। ফলতঃ অমন কোমল করুণ মধুর রচনা, অমন উচ্চ ভাববিন্যাস, আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। 'রাজর্ষির' প্রথম অংশটিও ঐরূপ—কি উহা অপেক্ষাও অধিকরূপ ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু শেষরক্ষা তিনি করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই মানস-পুত্র 'তাতা' ও মানসী কন্যা 'হাসিটি' এখনো আমাদের প্রাণে চিত্রিত হইয়া আছে। তার পর তাঁর ছোট গল্প গুলি,—নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, মধ্যবর্ত্তিনী,

ঠাকুর্দা প্রভৃতি যে অনুপম সৌন্দর্য্যে গঠিত, তাহা একমুখে বলা যায় না। এ অংশে তাঁহার অপ্রতিহত অধিকার ;—স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমের ছোট গল্প রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, 'ইন্দিরা হইতেও রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অধিক মনোরম, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিব, তাঁহার বড় উপন্যাস 'চোখের বালী'তে তিনি তেমনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কলিকাতার লোক-গুলা যেমন কৃত্রিমতাপূর্ণ, এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাও তেমনি কৃত্রিমতায় ভরা। প্রেম করিবে—তাহাতেও দোকানদারী। তার পর 'চোখের বালীর' রুচি মার্জ্জিত কিংবা সন্নীতিরও পরিচায়ক নয়। অন্ততঃ রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত, সুসভ্য কবির যোগ্য নয়। তাঁহার 'নষ্টনীড়ে'ও এই কুৎসিত ছবি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর দেব-উপভোগ্য ছোট ছোট গল্পগুলি ও সুধামাখা সঙ্গীতগুলির বুঝি তুলনা হয় না—এ জিনিস যেন এ মর্ত্ত্যের নহে,—ত্রিদিবের। ইহা আমাদের প্রাণের কথা।

তারপর তাঁর 'রাজা ও রাণী'' নাটক। এই এক নাটকেই রবীন্দ্রনাথ যে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, আজকালের শত নাটককারও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না ;—তা তাঁহারা স্বনামে ও বেনামে সমধর্ম্মা বন্ধু-গণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে যতই গাল পাড়ুন। রবি—রবিই থাকিবে, জোনাকি হইবে না। কেননা, তিনি নিজেই 'রাজা রাণীর' নায়কের মুখ দিয়া এক স্থানে বলাইয়াছেন,—"জগতের মহাদুঃখ যত, মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে ?"—এই অমৃতময়ী উক্তিটি সর্ব্বদাই যেন আমাদের স্মৃতিমূলে বাজিয়া থাকে। বঙ্কিমবাবুও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনায় পাণ্ডবদের মহাদুঃখ উল্লেখ-প্রসঙ্গে এই তত্ত্বটি বড় সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। সুতরাং যাহারা রবীন্দ্রবাবুকে গালি দিয়া বড় হইতে চায়, তাহারা কৃপার পাত্র। তবে যে আমরা 'কবির গান' শীর্ষক প্রস্তাবে 'সাধনার' মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি, তাহা আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে এবং এখনো সে প্রতিবাদ করি। অধিক কি, যতদিন রবীন্দ্রবাবু উক্ত মত প্রত্যাহার না করিবেন, আবশ্যক হইলে, ততদিনই ঐ প্রতিবাদ করিব। কিন্তু তা বলিয়া আমরা গুণের পূজা করিতে ভুলিব না। রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় ক্ষণজন্মা ঈশ্বরজানিত

কবির ন্যায্য সম্মান দিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইব না। তাহাতে অধর্ম্ম ত হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে মানীর মানহরণের মহাপাপের ফলও হাতে হাতেই ফলিয়া যায়। অন্ততঃ আমাদের ত তা ফলে; যাদের ফলে না, তাদের তোলা থাকে,—বিলম্বে ফলিবে।

রবীন্দ্রবাবুর 'মানসী' 'সোণার তরী' 'কড়ি কোমল' প্রভৃতি গীতিকাব্য-গুলি ভাব ও সৌন্দর্য্যের উৎস। একটু মনসংযোগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে মন পবিত্র ও উন্নত হয়। অবশ্য সকল কবিতা সমান নয়; কারই বা তা হইয়া থাকে? সম্পাদনের দোষে, গুছাইয়া মানাইয়া সাজাইবার ত্রুটিতে, দু' চারটা বেখাপ ও ছেলেমানুষী কবিতাও উহাতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ঐ সামান্য খুঁৎ ধরিয়া যাঁহারা ব্যঙ্গ করেন, তাঁহাদের রুচি প্রশংসনীয় নহে।

প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ভাষাও সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার কোন কোন সন্দর্ভ ও কাব্য-সমালোচনা এত উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ যে, অনেক সময় আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রবাবুর কবিতা মিষ্ট, না এরূপ গদ্যকাব্য মিষ্ট? বলা বাহুল্য, গদ্য হইলেও তাহাতে উচ্চাঙ্গের কবিতার সকল ভাব এবং একরূপ প্রচ্ছন্ন ছন্দঃ ও সুর থাকে, যাহা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না; না বুঝিয়া নিতান্ত লঘুপ্রকৃতির লোকের ন্যায় উপহাস করে। তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গদ্যে পদ্যে কবি রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় এখনও করিতেছেন; ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর যেন তাঁর সামান্য জনের ন্যায় যশের কামনা না আসে। যশ এখন তাঁহার দিগন্ত প্রসারিত; রাজার ন্যায় তাঁহার মান; চিন্তাশীল ভাবুক-পাঠকের হৃদয়মঞ্চে তাঁহার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত;—কর্ম্মফলে আর যেন তাঁর তপস্যা ক্ষয় না হয়;—আমাদের আদর্শ হইতে তিনি নামিয়া না পড়েন। কেননা, কাহাকে কাহাকে এমন নামের কাঙ্গাল দেখিয়াছি যে, তাহা দেখিয়া আমাদের বড় দুঃখ হয়। মনে হয়, 'ভগবন্! কি তোমার বিচিত্র লীলা! ইহাদিগকে এত উচ্চে তুলিয়া এমন একটি ক্ষুদ্রত্বের মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ যে, ইহারা একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। নিজের দুর্ব্বলতা—যাহা অতি

সামান্য ব্যক্তিও ধরিতে পারে এবং তাহাদের মধ্যেও যাহা নাই, তাহা উহাদের মধ্যে এমন পর্ব্বতপ্রমাণ আছে যে, কিছুতেই তাহাদের হুঁস হয় না।' প্রকৃতই নামের মোহ এমনি ভয়ানক জিনিস। ইহাতে অতি বড় ধীমান্‌কেও অধমের অধম করে। যাহারা রবীন্দ্রবাবুকে গালি দিয়া বড় হইতেছে, তাহাদিগকে ভগবান্ ঐ ভাবেই বড় হইতে দিন, আমরা দেখি ও হাসি। কেন না আমাদের উপরও সুদীর্ঘকাল হইতে এইরূপ এবং ইহা অপেক্ষাও অধিকরূপ পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইতেছে; আমরা তাহা নীরবে দেখিয়া আসিতেছি। দেখিয়া, শুনিয়া, ঠেকিয়া অনেক শিক্ষা পাইয়াছি; বুঝিয়াছি, এক হিসাবে তাহারাই আমাদের বন্ধুর কাজ করিতেছে; কেননা আমাদের মনের ময়লা সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া যাইতেছে; সঞ্চিত থাকিয়া জন্মান্তরে আর জের টানিতে পারিবে না। এ অংশে রবীন্দ্রবাবুকে আমরা অনেক বড় মনে করি। ভগবান্ তাঁহাকে সহিতে শিখাইয়াছেন;—এখন তিনি একটা মানুষের মত মানুষ হইয়াছেন।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় রবীন্দ্রবাবুর কয়েকটি স্বর্গীয় সঙ্গীতের নমুনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রস্তাব সমাপ্ত করি। রবীন্দ্রবাবু কোন মহাকাব্য লিখেন নাই বলিয়া যাঁহারা অনুযোগ করেন, তাঁহারা এই গান গুলি একটু উদারচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন, কবির প্রাণ কি উচ্চ সুরে বাঁধা। জীবনই তাঁর মহাকাব্যময়; ছন্দোবন্ধে একটা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া সুদীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিলে, তাঁহার হৃদয়-আকর হইতে এ অমূল্য রত্নগুলি উত্থিত হইত না। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রত অন্যরূপ;—ইহা ভগবানের বিধান।—তুমি আমি মিথ্যা অনুযোগ করিলে কি হইবে?

এখন কবি-কণ্ঠে নিম্নের এই কয়টি স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিয়া কবির ন্যায্য সম্মান কবিকে দাও,—ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাইবে:—

(১) "(আমি) যাদের চাহিয়ে, তোমারে ভুলেছি, তারাত চাহেনা আমারে।
তারা আসে তারা চ'লে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু মাঝারে॥"

(২) আর আমারে পাগল ক'রে দিবে কে।
হৃদয় যেন পাষাণ হেন, বিবেকভরা বিবেকে॥

(৩) কে তুমি গো, খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার। ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল, গেল বুক,—যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর॥"

(৪) ও কেন চুরি ক'রে চায়। লুকাতে গিয়ে হাসি, হাসিয়ে পলায়॥

(৫) ঐ বুঝি বাঁশী বাজে—বনমাঝে, কি মনমাঝে।

(৬) আমার যাওয়ার সময় হ'ল, আমায় কেন রাখিস ধ'রে।
চ'খের জলের বাঁধন দিয়ে, বাঁধিসনে আর মায়া-ডোরে॥

(৭) নিমেষের তরে মরমে বাঁধিল, মরমের কথা হ'ল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে, রহিল মরম বেদনা॥"

কবিহৃদয় রত্নের আকর—এমন কত রত্ন কুড়াইবে? যাহা পাইলে, ইহা লইয়াই ভাব,—কবির নিকট কতদূর কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত! 'আরো ভাল হ'তো ভাল হ'লে''—এ ত আর সমালোচনা নয়? এমন হইলে মহামতি গেটের Critic-এর উদ্দেশে লিখিত—সেই গাথাটি মনে পড়ে। কিন্তু সেটি উদ্ধৃত করিলে অনেক বন্ধু বিগ্‌ড়াইবেন,—হয়ত জীববিশেষের ন্যায় কাম্‌ড়াইতেও আসিবেন। অতএব এইখানেই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলাম।

রবীন্দ্র বাবুর এই অসামান্য কাব্যপ্রভাব এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষ ক্রিয়া করিতেছে। তাঁহার আদর্শ লইয়া শত শত নব্যকবি উত্থিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন,—কতকগুলি মহিলা কবিও সাহিত্যে আপনাদের 'কবি-প্রতিভা' দেখাইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে—(১) শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী সকলের অগ্রগামিনী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'অশ্রুকণা' 'আভাষ' প্রভৃতি গীতিকাব্য ইহার পরিচয় স্থল। ২য় 'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় এ বিষয়ে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। (৩) 'কনকাঞ্জলি' প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারীর ভক্তিমূলক কবিতায় ইহাঁদিগের অপেক্ষাও যেন এক অংশে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর 'হাসি ও অশ্রু' এবং শ্রীমতী মৃণালিনীর প্রতিধ্বনি, নির্ঝরিণী প্রভৃতি এবং প্রমীলা নাগ প্রভৃতির কবিতাও উল্লেখযোগ্য। এইরূপ আরো কয়েকটি স্ত্রী-কবি আছেন, সকলের পরিচয় দিতে পারিলাম না। 'স্নেহলতা', 'শান্তিলতা' ও 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী ইহাঁদের অন্যতম।

পক্ষান্তরে অনেক পুরুষ কবিও রবীন্দ্রবাবুর প্রভাব অতিক্রম করিতে

পারেন নাই। ইহাঁদের অগ্রণী—কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। ফলতঃ দেবেন্দ্রবাবুর "অশোকগুচ্ছ" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ উপভোগের জিনিস।

নব্য কবিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থ-সলিল' এবং 'বেণু ও বীণা' উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। শুনিয়া সুখী হইলাম, ইনি আমাদের চির-শ্রদ্ধাস্পদ মৃত-মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র।

কিন্তু এখনও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ চলিতেছে, ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে। রবীন্দ্রবাবুর পথ একটু ভিন্ন হইলেও, সেই একই মহাতীর্থে আমরা সকলেই অগ্রসর হইতেছি। উত্তরজীবনে বঙ্কিম তাঁর ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, গীতা এবং আর এক অংশে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারামের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভ জগদারাধ্য জগদীশ্বরকে দেখিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ না হয় তাঁহার ছন্দোবন্ধময়ী কবিতা দ্বারা, মাধুর্য্যময় সঙ্গীত দ্বারা, সরস ও চিত্তাকর্ষক ছোট গল্প দ্বারা সেই পুণ্যতীর্থে পঁহুছিবার প্রয়াসী। কেনন, তিনিও যেমন আজীবন সার সত্যের সন্ধান জন্য করুণার সুরে কাঁদিতেছেন,—বঙ্কিমও সেইরূপ সেই 'কমলাকান্ত' হইতে, ইহার অধিকও মর্ম্মভেদী বিলাপ করিয়া গিয়াছেন। 'ভিক্টোরিয়া-যুগের বঙ্গসাহিত্যে' বঙ্কিম প্রথম পথ-প্রদর্শক, রবীন্দ্রনাথ সেই পথের অগ্রগামী—তিনি অনেক আগাইয়া গিয়াছেন। গাল দিলে কি স্তব করিলেও তাঁহার কাণে পঁহুছিবে না বলিয়া মনে হয়। সসম্ভ্রমে ও কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আমরা এই দৈবানুগৃহীত কবিকে অভিবাদন করি।

এই প্রসঙ্গে আর এক থাকের সাহিত্যসেবীর কথা আমাদের মনে হয়। তাঁহারাও সাহিত্যের মধ্য দিয়া অধ্যাত্মরাজ্যে অনেক কাজ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের ভাগ্যবান্ লিপিকারের পর সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে উদিত হয়,—পরম শ্রদ্ধাস্পদ ত্যাগী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের 'ভক্তিযোগের' কথা। ফলতঃ, ভক্তিযোগের ন্যায় সরস তত্ত্ব-সংগ্রহ ও অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা,—এক কথামৃত বাদে এ পর্য্যন্ত আমরা দ্বিতীয় পাই

নাই। এই গ্রন্থ খানি বঙ্গের গৃহে গৃহে পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্মবলে প্রাণ কত উন্নত হইতে পারে, চরিত্র কিরূপ সুগঠিত হয়, 'ভক্তিযোগ' না দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে না।

৺শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ইহজীবনের কর্ম্মফল যে ভাবেই ভোগ করিয়া যান, তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি হইয়াছে; কেননা, তিনি 'ভক্তি ও ভক্তের' ন্যায় দুর্লভ রত্ন বঙ্গসাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অসামান্য বাগ্মিতাও ভাবিবার বিষয়।

সুধী ও সুলেখক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তও এ অংশে কম কাজ করিতেছেন না। তাঁহার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' 'উপনিষদ' প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের মধ্যমণি। তিনি ধীর শান্ত অমায়িক; তার উপর পাণ্ডিত্যের সহিত ভগবৎ-কৃপাও পাইয়াছেন।—যেন মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ ব্যতীত সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ 'সেক্সপিয়ার' ও 'কালিদাস' প্রভৃতি অনেক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধও লিখিয়াছেন; সে গুলি একত্র করিলে ২।১ খানি ভাল বই হয়।

৺কালীবর বেদান্তবাগীশ, ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ৺সত্যব্রত সামশ্রমী, বহরমপুর-নিবাসী শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ও অনুবাদক ৺রাম-নারায়ণ বিদ্যারত্ন, সর্ব্বদর্শন গ্রন্থের অনুবাদক ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, বিষ্ণুপুরাণ ও কল্কিপুরাণ প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যাচরণ এবং ন্যায়শাস্ত্রের "ভাষা-পরিচ্ছেদ" গ্রন্থের প্রণেতা, সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি মহাশয়ের কথা এই সঙ্গে মনে হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াও ইহাঁরা মধ্যে মধ্যে বঙ্গভাষা-জননীর সেবা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ আজিও করিতেছেন। ইহাঁদের দ্বারাও বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গসমাজের কম উপকার হইতেছে মনে করিবেন না।

কবি তারাকুমার কবিরত্ন। ইনি যেমন সজ্জন, তেমনি ভগবদ্ভক্ত। ইহাঁর 'তারা মা' 'সতীধর্ম্ম' প্রভৃতি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাঁর হিতোপদেশ, কৃষ্ণভক্তি রসামৃত, হিমালয় দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ,—সাহিত্যের

স্থায়ী সম্পদ। অনেকেই হিমালয় দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তকবি তারাকুমারের ন্যায় হিমালয় দেখিতে জানেন কয় জন? ইহা পাঠে মনে উচ্চভাব জাগরিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও পালি ভাষায় ইনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁ দ্বারাও বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি হইতেছে। ইহাঁর রচিত বুদ্ধদেব, ভবভূতি, আত্মতত্ত্ব-দর্শন প্রভৃতি চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের গৌরব। প্রত্নতত্ত্বেও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অগাধ অধিকার। সংপ্রতি তিনি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া অনেক তত্ত্বসংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং ধীরে ধীরে সাময়িক পত্রাদিতে তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

এইরূপ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ৺লালমোহন বিদ্যানিধি, ৺ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, ৺ রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (সি-আই-ই), ৺ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, ৺রমণীমোহন মল্লিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, কবি ৺ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৺ মুক্তরাম বিদ্যাবাগীশ, ৺প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, ৺ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, ৺জগদীশ্বর গুপ্ত, ৺ জয়গোপাল গোস্বামী প্রভৃতি মহাশয়ের কথাও মনে পড়ে। রাজেন্দ্র-নাথের 'কালিদাস' ও ভবভূতি-সমালোচনা, প্রমথনাথের শাক্যসিংহ ও মণিভদ্র, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর শঙ্করাচার্য্য ও দক্ষিণাপথ ভ্রমণ, সত্যচরণের মহারাজ প্রতাপাদিত্য, শিবাজী ও নন্দকুমার, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের জন্মান্তর রহস্য, দেবতা ও আরাধনা প্রভৃতি এবং উপরোক্ত লেখকগণের কাব্যনির্ণয়, সম্বন্ধনির্ণয়, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, স্বাস্থ্যরক্ষা, ভূবিদ্যা, সাধু হরিদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস, নেপালের পুরাবৃত্ত পদ্যপাঠ (তিন ভাগ), সেক্সপিয়ারের কয়েকটি গল্প, বঙ্গাধিপ পরাজয়, কৃষ্ণা ও চন্দ্রনাথ, ৺ জগদীশ্বর গুপ্তের চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যলীলামৃত, ৺ জয়গোপাল গোস্বামীর কাব্যদর্পণ গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। শেষোক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র—কবি বেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবাবী আমলের বাঙ্গালা ইতিহাস, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর স্বাধীনতার ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ-কাহিনী ও প্রতাপাদিত্য, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহের সেনরাজগণ, ত্রিপুরার ইতিহাস, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের 'মোগলবংশ', শ্রীনাথ সেনের ভাষাতত্ত্ব, সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোম্বাই চিত্র, মেঘদূত ও বৌদ্ধধর্ম্ম', শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অভিব্যক্তি বাদ', শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মঞ্জুষা, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদের ইলিয়াডের বঙ্গানুবাদ, ৺ প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্নের শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী ও শ্রীগৌরাঙ্গচরিত, ৺ কেদারনাথ দত্তের শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদারের হিন্দুপত্রিকা, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেনের গীতশিক্ষা, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দের কৃষিক্ষেত্র, সব্‌জীবাগ, ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের চীনভ্রমণ, তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্তের তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলী, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্রের অবলাবালা, সহমরণ প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি 'মহাপ্রস্থান' রচয়িতা ৺দীনেশচন্দ্র বসু, মিত্র-কাব্য ও হেলেনা কাব্য প্রণেতা ৺ আনন্দচন্দ্র মিত্র, মিত্রবিলাপ ও নির্ব্বাসিতা সীতার কবি ৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র আর 'যমুনা লহরীর' অমর কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয়ের নাম এখনও বঙ্গের সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত উচ্চারিত। গোবিন্দ রায়ের সেই "নির্ম্মলসলিলে, বহিছ সদা, তট-শালিনা, যমুনে—ও" জাতীয়-সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। আর সেই নবোদিত ভাস্কর রজনীকান্ত সেন—'আনন্দময়ী' প্রভৃতির ভক্তকবি—বঙ্গের সাহিত্যাকাশে, আলোক দিতে না দিতে নিবিয়া গেল। বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য! নিম্নের এই গানটি যদি স্বর্গীয় কবির রচিত হয়,—তবে আমরা তাঁহার অমর আত্মাকে পূজা করি। গানটি এই:—"কেন বঞ্চিত হব চরণে। আমি বড় আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে কিবা মরণে॥"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা ওরফে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার 'গীত-রত্নাবলী', 'অমৃতে গরল' 'ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা' প্রভৃতি

গ্রন্থে, বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে যে কত অমূল্য ভাব-সম্পদ দিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। বিশেষ ভক্তিমূলক সাধনসঙ্গীতে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। তাঁর সেই—"কি দেখলাম্ রে, কেশব-ভারতীর কুটীরে, অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ-মূরতি, দু'নয়নে প্রেমধারা বহে রে॥" আর সেই 'দে মা আমায় পাগল ক'রে। আর কাজনি গো মা জ্ঞান-বিচারে" ইত্যাদি গান ভক্তিভরে শুনিলে চৈতন্য হয়। দয়ালঠাকুর ৺শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, ভক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয়ের মুখে এই সব মধুর গান শুনিয়া মুহুর্ম্মুহু ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতেন, কখন বা সেই ভক্তের ভগবানের নির্ব্বিকল্প সমাধি আসিত। সে এক অদ্ভুত যোগ। যে তাহা দেখিয়াছে, বা না দেখিয়াও একমনে অনেক দিন ধরিয়া এ বিষয় ভাবিয়াছে, সেই মজিয়াছে। ভাগ্যবান্ কবি জন্মান্তরীণ সুকৃতিগুণে পতিতপাবনকে ঐ সব গান শুনাইয়া ধন্য হইয়াছেন। আমরা তাঁহার চরণে প্রণাম করি।

৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় অসময়ে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি অল্পদিনে তিনি বঙ্গসাহিত্যে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, অনেকে অনেক দিন ধরিয়াও তাহা রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। ভাষায় তিনি বড় একটি নূতন রকমের সুর আনিয়াছিলেন। তাঁহার সেই 'চিত্রা ও কাব্য' 'মাধবিকা', 'শ্রাবণী' ইহার পরিচয় স্থল। রবীন্দ্র বাবুর মত লোক এই মৃতকবি সম্বন্ধে স্থায়ী রকমের কিছু একটা লিখিলে ভাল হয় না?

'পদ্মার' কবি,—দীপালী, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অমৃত পুলিন, বসন্তের রাণী প্রভৃতি উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও নাম আছে। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নবকথা, রমাসুন্দরী, ষোড়শী প্রভৃতি ছোট গল্পের বই পাঠক-সমাজে বিলক্ষণ আদৃত হইয়াছে। প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর 'নারী নীতি' ও নীতি-প্রভা, প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরেজী বাঙ্গালা, বিবিধ প্রবন্ধ, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের রাজস্থানের পুরাবৃত্ত ও কবিচরিত, ধর্ম্মপ্রাণ সুলেখক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রবন্ধ এবং 'মাধবীবল্লরী' প্রভৃতির আলোচনা, সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ

অভিধানের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ৺প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর 'জীবনপরীক্ষা', ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রঙ্গমহাল, ৺ অচ্যুতচরণ চৌধুরীর হরিদাস ঠাকুরের জীবন-চরিত, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হরিদাস ঠাকুর, ৺রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সামুদ্রিক শিক্ষা' শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষের 'বাণী' মাসিক পত্রিকা, সুকবি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্রের 'অবসর' 'মেঘদূত' শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর প্রণীত নূতন ছন্দে লিখিত 'রাবণ বধ', পণ্ডিত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত উপনিষৎ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান লেখকও কয়েকখানি সুন্দর বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং মাসিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন। মহম্মদের জীবন-চরিত, বিষাদসিন্ধু, মিহির ও সুধাকর এবং কোহিনুর প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। যখন হিন্দু মুসলমান একযোগে বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিতেছেন, তখন আর ইহার মার্ নাই। সাহিত্যের ইতিবৃত্তে এ শুভ-সংযোগ বিষয় গৌরবকর বলিয়া মনে করি।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও এ সময় বাদ যাইতেছে না। বঙ্গভাষার এমন সৌভাগ্যযোগ আর হয় কি? এই বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা গ্রন্থের অগ্রণী যিনি, অগ্রে তাঁহারই নাম গ্রহণ করিলাম। মনস্বী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে আমি এখানে উদ্দেশ করিতেছি। ফলতঃ রামেন্দ্র বাবুর লিখন-ভঙ্গিমা, ভাষা ও ভাবপ্রকাশের সুন্দর কৌশল অনেকের অনুকরণীয়। তাঁহার 'প্রকৃতি' নামে গ্রন্থখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের আদর্শ স্থানীয়। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য-নাথ মুখোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিও সুন্দর এবং সুলিখিত। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ও এ পথে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। শুনি-লাম, তাঁহার 'প্রকৃতি পরিচয়' গ্রন্থও রামেন্দ্র বাবুর 'প্রকৃতির' কাছাকাছি। বড় আহ্লাদের সংবাদ। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত শশধর রায় প্রভৃতিও এই পথ ধরিয়াছেন। ডাক্তার চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর-লিখিত 'জল' ও 'খাদ্য' প্রভৃতি এ বিভাগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

আবার বুঝি গানের যুগ আসিয়াছে। চারিদিকেই উচ্চশ্রেণীর ভক্ত-কবি আবির্ভূত হইতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে সুকবি ও শক্তি-সাধক মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মাতৃনামামৃত সাধন-সঙ্গীতগুলি সমাজে ও সাহিত্যে

প্রভূত কল্যাণসাধন করিতেছে। রামবাবুর সেই—"বারে বারে যত দুঃখ, দিয়েছ দিতেছ তারা! দুঃখ নয় সে দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখহরা॥" (২) শ্মশান ভালবাসিস ব'লে শ্মশান ক'রেছি হৃদি। শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি॥"—ইত্যাদি অমৃতময় সঙ্গীতলহরী. বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে শ্রদ্ধান্তরে গীত হয়। এইরূপ কোন অজ্ঞাত কবির রচিত "হরি! তোমায় ভালবাসি কৈ? আমার প্রেম কৈ? 'ভাল যদি বাস্‌তেম তোমায়, জান্‌তেম্ না আর তোমা বই॥—আমি সংসার পীড়নে কেঁদে, লোকের কাছে প্রেমিক হই"—এ গানটিও ভক্ত-সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গীত হয়। এইরূপ "তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন। মহামায়া নিদ্রা-বেশে দেখিছ স্বপন॥" এবং "দিবা অবসান হ'লো কি কর বসিয়া মন। উত্তরিতে ভবনদী ক'রেছ কি আয়োজন॥" এই উৎকৃষ্ট গান দুটিও বিশেষ ভাবুকতার পরিচায়ক। ইহার প্রকৃত রচয়িতা কে, ঠিক্ জানা যায় নাই। ফল কথা, এ শ্রেণীর গানে, সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন হইতেছে। রাম বাবুর শ্যামা-সঙ্গীতই এখন অধিক গীত হয়। প্রকৃতই ইহা বড় শুভলক্ষণ। যুগ-অবতারের মাহাত্ম্য—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব-ফল কি ব্যর্থ হইবে? তাই চারিদিকে এই সাধন-সঙ্গীতরূপ ভক্তির তরঙ্গ বহিতেছে।

এইবার 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের' সুপ্রসিদ্ধ লেখক, পণ্ডিত-সমালোচক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে বিশেষভাবে অভিবাদন করি। কেননা, নিতান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহার মত বন্ধু-ব্যক্তিকেও স্থানে স্থানে কটাক্ষ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে ভাবে তিনি কয়েকটি মৃতকবির স্মৃতিসম্মান নষ্ট করিয়াছেন, ধর্ম্মসম্মত উত্তরস্বরূপ সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বলিলে আমাদের এ কার্য্যে হাত দেওয়াই উচিত ছিল না। যাই হোক, ইহাতেও যদি অপরাধ হইয়া থাকে, দীনেশ বাবু আমাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিবেন। পরন্তু মতবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুক্তকণ্ঠে বলিব, দীনেশ বাবুর মত দীর্ঘকাল-ব্যাপী অসাধারণ পরিশ্রম ও তন্ময়তা সহকারে ওরূপ অমূল্য রত্ন আহরণ করা,—এ পর্য্যন্ত 'বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের' ইতিবৃত্তে কাহারও গ্রন্থে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কেননা, নজীর ও প্রমাণ দীনেশ বাবুর গ্রন্থেই সর্ম্মাধিক। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে এ পথ দেখাইয়া গিয়াছেন,—পণ্ডিত রামগতি

ন্যায়রত্ন মহাশয়। সেই স্বর্গগত মহাত্মার নিকট আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। দ্বিতীয়,—দীনেশ বাবুর 'রামায়ণী কথার' মত সারগর্ভ, সুচিন্তিত কবিত্বময় সমালোচন-গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে দুই চারি খানির অধিক আর নাই। গ্রন্থকার যেন ধ্যানে এ রামায়ণের ছবি আঁকিয়াছেন। কথা নয় ত, ও ছবি! রামচরিত্রের মনোহর ছবি,—ভক্ত দীনেশচন্দ্র কবিত্বের ভাষায় বড় সুন্দর ও অপূর্ব্বভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি,—অন্তরে বার বার শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছি। বিশেষ ভরত-চরিত্রটি, এ অংশে অতুল্য। ভক্তির কষ্টি-পাথর ভিন্ন এ রত্ন পরীক্ষিত হইবে না। ইহা ব্যতীত বেহুলা, ফুল্লরা, সতী, জড়ভরত প্রভৃতি কয়খানি পাঠ্যগ্রন্থও দীনেশ বাবু রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। এখনও তাঁহার লেখনীর ক্রিয়া চলিতেছে। দীনেশ বাবুই এখন বাঙ্গালার নবোদিত সূর্য্য!

এইবার আমরা সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনায় বাধ্য হইলাম। থিয়েটার ও সংবাদপত্রের অবনতির সহিত দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, চিন্তাশীল পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন।

সংবাদপত্র ও থিয়েটার।

সাধারণ লোকশিক্ষার প্রধান অবলম্বন—সংবাদপত্র ও থিয়েটার। জিনিস দুইটি খাস বিলাতী। আগে যাহা ছিল, তাহার কথা তুলিয়া ভারতের প্রাচীন-তত্ত্ব আবিষ্কার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু বর্ত্তমানে ঐ দুইটি বস্তু যে ভাবে আছে এবং যেরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার গতি, ক্রিয়াপদ্ধতি এবং ফলাফল কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য লক্ষ্য।

বিলাতী সভ্যতার আলোকে যেমন আমরা অসংখ্য বস্তু লাভ করিয়াছি, তেমনই সংবাদপত্র ও থিয়েটার জিনিস দুটিও পাইয়াছি। সাধারণ লোক-শিক্ষার হিসাবে, এ দুইটি জিনিসই অমোঘ বলশালী। যাহার প্রভাবে, এক দিনেই সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিতে পারে, তাহার শক্তি ও প্রভাব, বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সাধারণতঃ, অল্প-শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় ও মন লইয়া জিনিস দুইটি গঠিত। এ কথায় কেহ এমন না মনে করেন যে, তবে বুঝি আমরা সংবাদপত্র ও থিয়েটারের পরি-চালকগণকে প্রকারান্তরে 'অশিক্ষিত সমাজের নেতা' প্রতিপন্ন করিতেছি, এবং ঐ দুই বস্তুর রসাস্বাদনকারীদিগকেও নিম্নস্তরে ফেলিয়া দিতেছি। বস্তুতঃ সেরূপ প্রতিপন্ন করাও দূরে থাক্,—আমরা নিজেই এ দুই জিনিসের অনুরক্ত এবং ভক্ত। অশিক্ষিতের উপভোগ্য বলিয়া যে, সেই জিনিস

সুশিক্ষিতেরও আদরণীয় হইবে না, এমন কোন অর্থ নাই। এই দেশে এবং প্রায় সকল দেশে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা পণ্ডিত ও মুর্খে সমান আগ্রহে উপভোগ করিতে পারে। এই সংবাদপত্র ও থিয়েটার হইতেও তাহা পারে। কারণ সংবাদপত্রেও ডিলানি ও ষ্টেড সাহেবের ন্যায় কৃতবিদ্য উদ্যমশীল শক্তিধর পুরুষ ছিলেন এবং আছেন, এবং থিয়েটারেও গ্যারিক ও আরভিংএর ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন এবং আছেন। এমত অবস্থায় ঐ দুই বিষয় বা বিষয়ের পরিচালক যে, সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে আসল কথাটা হইতেছে এই যে, সংবাদপত্র ও থিয়েটার জিনিসটা প্রধানতঃ Mass বা "দল" লইয়া পরিচালিত। দলের রুচি অনুযায়ী সাময়িক আন্দোলন, হুজুগ, সংস্কার ও নূতন প্রবর্ত্তন,—প্রধানতঃ এই লইয়াই ঐ দুইটি জিনিস চলিয়া থাকে। সুতরাং অনেকটা আড়ম্বর ও দোকানদারী ঐ জিনিস দুটায় করিতে হয়। না করিলে আসর জমে না, খরিদদার জুটে না। এ দেশের কথা দূরে যাউক, এই শিক্ষা-সভ্যতার পূর্ণ-আধিপত্যকালে, খাস ইংলণ্ড এবং আমেরিকায়ও ঐ অবস্থা। তবে, সেখানে ঐ ব্যবসাদারীর সঙ্গে সঙ্গে, লোকহিতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে, এখানে অনেক স্থলেই আদৌ তাহা নাই। নাই বলিয়াই আমাদের দুঃখ, এবং নাই বলিয়াই ঐ দুই বিষয়ের পরিচালকগণের নিকট আমাদের কিঞ্চিৎ অনুযোগ।

যাঁহারা দেশের ও দশের এবং তৎসহিত আপনার কথা দিনান্তেও একবার ভাবেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব, যে ভাবে আমাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত। তাহার সহিত আবার সংবাদপত্র ও থিয়েটাররূপ প্রবলশক্তি,—এ শক্তিও ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম রূপ,—মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ-শরীর (যে টুকু এখনও আছে) আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ, তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। তবে, কালের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা ফলিতেছে এবং ফলিবেও। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে একেবারে স্রোতে গা-ভাসান্ দেওয়া কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে। সমাজের অধস্তন সম্প্রদায় সর্ব্বকালে—সর্ব্ব সময়েই গড্ডালিকা-প্রবাহবৎ চলিয়া থাকে

বটে, কিন্তু যাঁহাদিগের একটুখানি মাত্রও পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্টভাবে থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণা এবং কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই, আমাদের দেশের আধুনিক সংবাদপত্র ও থিয়েটারের এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাধারণের হৃদয় ও মন লইয়া সাধারণতঃ সংবাদ-পত্র ও থিয়েটার পরিচালিত। সুতরাং সাধারণ যাহার প্রাণস্বরূপ, তাহার শক্তি ও প্রভাব অসীম কারণ সাধারণ লইয়াই দেশ, সাধারণ লইয়াই সমাজ, সাধারণ লইয়াই ধর্ম্ম, সাধারণ লইয়াই সাহিত্য—এক কথায় সাধারণ লইয়াই যা কিছু। সেই সাধারণের সহিত যাহার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই জিনিসের উচ্চ আদর্শ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে চাই; পরন্তু তাহার ব্যভিচার দেখিলে মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করি।

দুঃখের বিষয় এই, সাধারণের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ও থিয়েটার ক্রমেই বড় অবনতির পথে যাইতেছে। কথাটা উল্টাইয়া বলিলে ইহাই বলা হয় যে, সাধারণ লোকের মতি-গতি ক্রমশই বড় নিম্নগামী হইতেছে। সংবাদপত্র ও থিয়েটার সমাজের দর্পণ-স্বরূপ; সাধারণের প্রতিবিম্ব অনেক সময় সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। একজন বিদেশী পর্য্যটক কোন দেশে উপনীত হইয়া যদি সর্ব্বাগ্রে সেই দেশের সংবাদপত্র পাঠ করেন এবং থিয়েটার দেখেন, তবে তিনি স্বল্পায়াসে সেই দেশের রীতি-নীতি, আচার পদ্ধতি, শিক্ষা ও মনের গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ দেখিয়া যেমন সেই দেশের অভাব অনুযোগ উপলব্ধি হয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়াও তেমনই সেই দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি প্রবৃত্তি এবং মানসিক গঠনও জানা গিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, থিয়েটার দেখিতে গিয়াও দেশের অবস্থা খানিকটা বুঝা যায়। সাধারণ লোক কি চায়, কি ভালবাসে, কোন্ রসের বেশী ভক্ত, তাহা সেই দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মুখের তৎকালীন ভাব দেখিয়া জানা যায়। আর জানা যায়,—রঙ্গভূমির পরিচালক বা অধ্যক্ষের বিষয় নির্ব্বাচন দেখিয়া, এবং অভিনীত অংশে নট নটীর অঙ্গ-ভঙ্গী ও নেত্রবক্ত্র বিকারাদি দর্শন

করিয়া। বলা বাহুল্য, শ্রোতা ও দর্শকের মনের ভাব বুঝিয়া অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ 'বাহবা'ই তাহাদের সম্বল; সমবেত দর্শক ও শ্রোতার তুষ্টি-সাধনই তাহাদের লক্ষ্য; আর রঙ্গমঞ্চের অধিকারী বা অধ্যক্ষের ইঙ্গিত-উপদেশ পালন করাই তাহাদের কার্য্য। তাহার বেশী তাহারা বড় একটা যায় না,—যাইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, দেশের অবস্থা এবং সাধারণের মতি-গতি ও রুচি-প্রবৃত্তি বুঝিতে হইলে, সংবাদপত্র ও থিয়েটার দ্বারা তাহা স্বল্পায়াসে বুঝা যায়। এই জন্য সংবাদপত্র ও থিয়েটারকে আমরা সমাজের দর্পণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা সমাজের দর্পণ এবং যাহার শক্তি ও প্রভাব অতি প্রবল, সে জিনিসের অধোগতি দেখিলে স্বভাবতঃই মনে বড় কষ্ট হয়। আমাদের দেশের আধুনিক সংবাদপত্র ও থিয়েটারের অবস্থা দেখিয়া আমরা কষ্ট অনুভব করিয়াছি, এবং তৎপক্ষে দেশের সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি। বস্তুতঃ যিনি দিনান্তেও একবার আত্মসমাজ এবং সমাজরূপী আত্মপরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহার পক্ষে অন্যান্য চিন্তার সহিত এই দুই বিষয়ের চিন্তা করাও এক্ষণে নানা কারণে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সংবাদপত্র ও থিয়েটার, দেখিতে দেখিতে সদরে অন্দরে প্রবেশলাভ করিতেছে। সংবাদপত্রের ভাব ও চিন্তা, এখন অনেকের নিত্য অলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আপিসের স্বল্প বেতনভোগী কেরাণী হইতে মুদিপাকাঙ্গী পর্য্যন্ত এখন সংবাদপত্র পাঠ করে; সম্পাদকীয় আলোচ্য বিষয়ে বাদানুবাদ করে; কোন কোন 'পাবলিক্' বিষয়েও স্বাধীনভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আর মোটা মাহিনাওয়ালা মুৎসুদ্দি, সদরালা, ডেপুটী, মুন্সেফ,—ইহাঁদের ত কথাই নাই;—সকলেই এখন চা ও পান-তামাকের সহিত সংবাদপত্র-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। শুধু সহরে নহে, সুদূর মফস্বলেও এখন সংবাদপত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আদালতেও দেখিবে, বিশ্রামমণ্ডপে বসিয়া, উকীল মোক্তার সংবাদপত্রের কথা কহিতে-ছেন;—আবার অন্দরেও, নিতান্ত সেকাল-ঘেঁসা স্ত্রীলোক ছাড়া, আধুনিক

অনেক মহিলাও নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন,—দেশের সকল খবরই রাখেন। সুতরাং সংবাদপত্রের প্রভাব, কেবলই যে পুরুষ পাঠকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা নহে—অনেক পুরমহিলা পাঠিকাও সংবাদ-পত্রের প্রভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন।

পক্ষান্তরে, থিয়েটারের প্রভাব ও আকর্ষণ,—সংবাদপত্র হইতেও অনেকাংশে অধিক। সংবাদপত্রের কোন কোন বিষয় পাঠে একটু ভাবিতে হয়; তাহা আয়ত্ত করিতে একটু বেগও পাইতে হয়; পরন্তু থিয়েটারে একেবারে সমস্তই খোলাখুলি। সেখানে হাবভাব বিলাসিতা ভরপুর; নৃত্য গীত সুপ্রচুর; সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট নয়নরঞ্জন; এবং আমোদ-উল্লাস চরম মাত্রায় বিদ্যমান। বিশেষ কোনরূপ প্যাণ্টমাইম্ বা কমিক্ অপেরা অথবা রঙ্গরসপূর্ণ প্রহসন হইলে ত আর কথাই নাই;—সে সময় আর আদৌ আব্রু থাকে না। নট নটীর মধ্যেও নয়,—বুঝি দর্শক-শ্রোতার মধ্যেও নয়! সকলেই তখন ভাবে ভোর;—হো হো হাসি, ঘন ঘন করতালি, আর রসাল বোল-চালে রঙ্গমঞ্চ প্রকম্পিত হইতে থাকে।—সে সব দেখিয়া শুনিয়া নীরবে নিশ্বাস ফেলিতে হয়; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়; অন্তরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতে হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে সুপণ্ডিত লালবিহারী দে, তাঁহার "Friday Review"তে দীনবন্ধু বাবুর 'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, থিয়েটারে অভিনীত কোন কোন প্যাণ্টোমাইম্ বা প্রহসন সম্বন্ধেও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হয়। রেভারেণ্ড দে বলিয়াছিলেন,—"If this trash ever be put on the stage, we cannot recommend a better place for its performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons."

অথচ, এই থিয়েটারই এখন সমাজের একটা দিক রাখিয়াছে। ইস্তক স্কুলের ছাত্র হইতে, নাগাইদ অন্তঃপুরচারিণী কুলবধূ পর্য্যন্ত, এখন সমান আগ্রহে থিয়েটার দেখিয়া থাকেন। থিয়েটারগৃহ লোকে লোকারণ্য হয়। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র,—শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত,—সকল শ্রেণীর লোকের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। এই কলিকাতা সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত

পুর-মহিলা, থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক। থিয়েটার-দেখা তাঁহাদের প্রায় ফাঁক যায় না। তাঁহাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখিয়া মনে হয়, থিয়েটারের প্রভাব তাঁহাদের হৃদয়ের উপর বড় বেশী পরিমাণে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

কথাটা যখন পাড়িলাম, তখন একটু খুলিয়াই বলি। থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট একটি ভদ্রলোক একদিন আমায় বলিলেন, "মহাশয়, আর দেখেন কি? এখন ঘরে ঘরে সজীব থিয়েটার হইতে চলিল!—সে দিন বেলা দুইটার সময় আমি একস্থানে যাইতেছি, একটা গলির মধ্যে একটা বাড়ীর সাম্‌নে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ভদ্র পল্লী, গৃহস্থ বাড়ী।—দিব্য পরিষ্কার অভিনয়-স্বর, আমার কাণে গেল। অনুভবে বুঝিলাম, বামা-কণ্ঠস্বর।—দুইটি স্ত্রীলোক নায়ক নায়িকা হইয়া, যথারীতি আমাদের থিয়েটারী-সুরে, আমাদেরই অভিনীত একখানি নাটকের কথোপকথন আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর একজন মৃদুস্বরে যথানিয়মে গানও ধরিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। বোধ হয়, বাড়ীর পুরুষেরা তখন আপিস-আদালত গিয়া থাকিবে; মেয়েরা সুযোগ বুঝিয়া গান জুড়িয়া দিয়াছেন।—এর চেয়ে জেনানা-মিশনদের যীশুভজানোও যে ছিল ভাল, মহাশয়!"—কথাটা সত্য বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল। কারণ, এইরূপ এবং অন্যরূপ প্রমাণ আমি আরও পাইয়াছি, এবং স্থলবিশেষে তাহার কিছু কিছু প্রত্যক্ষও করিয়াছি। তরুণবয়স্ক যুবক যুবতীর, কাব্য ও উপন্যাস পড়িয়াই যখন Hero ও Heroine সাজিতে সাধ যায়, তখন যে থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া, তাঁহাদের মনে ঐ ভাবের আবির্ভাব হইবে এবং সুবিধা পাইলেই যে তাঁহারা ঐ অভিনয়ের একটু আধটু মহলা দিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূর্ব্বেকার মত ধর্ম্মশিক্ষা ত আর এখন নাই? কাজেই ধর্ম্ম-নীতি-বিবর্জ্জিত জীবনের যে ফল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার কুদৃষ্টান্তে, আদর্শের অভাবে, তাহা ফলা অনিবার্য্য। ফল কথা, থিয়েটারে, প্রলোভন ও আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সুতরাং থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্ব এক হিসাবে সংবাদপত্র পরিচালকের দায়িত্ব অপেক্ষাও অধিক। সংবাদপত্র-পরিচালক একটা 'ছক'—ভাষায় আঁকিয়া দেন; আর থিয়েটারের কর্ত্তা, সেই 'ছক' সজীবভাবে, দর্শক ও শ্রোতার হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন।

অথচ, এই থিয়েটার একেবারে হেলাফেলার সামগ্রীও নহে। আমোদের সহিত লোকশিক্ষা দিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষ সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র-শিল্প—একাধারে এই তিনটি শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যাই থিয়েটারে বিদ্যমান। সুতরাং এ জিনিস যে উপেক্ষার জিনিস নয়, বুদ্ধিমান্‌কে সে কথা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা পুঁথিগতবিদ্যায় তেমন অভ্যস্ত নহে; কিন্তু যাত্রা, থিয়েটার ও কথকতার উপদেশে অতি শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এখন, সময় শিক্ষা ও রুচিভেদে—যাত্রা ও কথকতা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া যাইতেছে,—থিয়েটার তাহার স্থানে স্থায়ী আসন লইতেছে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে থিয়েটারের সংস্কার ও উন্নতি, বিশেষ আবশ্যক।

থিয়েটারের সংস্কার ও উন্নতি করিতে হইলে, থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটু উদার ও উন্নত প্রণালীতে থিয়েটার চালাইতে হইবে। তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে এমন সব উচ্চ আদর্শ—লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে হইবে, যাহাতে লোকের নৈতিক বল বৃদ্ধি পায়; চরিত্র সুগঠিত হয়; এবং ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব ও জাতীয়তা অর্জ্জিত হইতে পারে। এজন্য প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে একটু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; একটু পয়সার মায়া কাটাইতে হইবে;—একবার দেশের ও দশের পানে তাকাইয়া, সমাজের মঙ্গল স্মরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে এক সোপান উচ্চে উঠিতে হইবে। কারণ তাঁহারা যখন আনন্দ প্রদানের সঙ্গে লোক-শিক্ষকের আসন লইয়াছেন, তখন লোককে একটু উন্নত করিতে না পারিলে, আর হইল কি? বিশেষতঃ কাব্য-সাহিত্যের ন্যায়, রঙ্গ-সাহিত্যও সমাজের কল্যাণ সাধন করে। দশটা সভাসমিতিতে যা না হয়, একখানি সুচিত্রিত সামাজিক নক্‌সায় তাহা হইতে পারে। এইরূপ সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের অভিনয়-ফল যে আরও উত্তম, সে কথা কে অস্বীকার করিবে? ফল কথা, সৎকাব্যের প্রভাব কোন কালে নিষ্ফল হয় না। মহাকবি সেক্সপিয়রের রঙ্গ-সাহিত্য,—তাঁহার অদ্ভুত নাটকাবলী,—ইংরেজী সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছে, এবং সাহিত্যের পুষ্টির সহিত, ইংরেজ-সমাজেরও অনেক উন্নতি করিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের রঙ্গালয়ের এখন শিশুকাল; এখানে অবশ্যই এখন সেক্সপিয়-

রের মহানাটকের ন্যায় রঙ্গ-সাহিত্যের আশা করিতে পারি না বটে ; কিন্তু তা বলিয়া ছাই-ভস্ম যাহা ইচ্ছা তাহাই যে রচিত ও অভিনীত হইবে এবং তাহার ফলে দেশ উৎসন্ন যাইবে, এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে পারি না। তদপেক্ষা যদি দেশ হইতে থিয়েটার একেবারে উঠিয়া যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ।

পরন্তু আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে অভিনয়ের উপযোগী বহু বিষয় ত রহিয়াছে ? রামায়ণ ও মহাভারত যে দেশের আদর্শ কাব্যগ্রন্থ ; রাম সীতা যে জাতির উপাস্য দেবতা ; শ্রীকৃষ্ণ যে দেশে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ বলিয়া পূজিত ; সে দেশের এবং সে জাতির অভিনয়োপযোগী আদর্শ-কাব্য বা নাটক, বড় বেশী খুঁজিতে হয় না। রামায়ণ মহাভারতের পুঁজি ফুরায়, বিশাল রাজস্থান রহিয়াছে ;—তাহাই ভাঙ্গিয়া অভিনয় কর। তাহাও নিঃশেষিত হয়, উচ্চ ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ কর, এবং তাহাই সুকৌশলে ও নিপুণতা সহকারে জাতীয় চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া নাট্য-কাব্য রচনা করিতে থাকো। এই জীবন-সংগ্রামের দিনে,—এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগে,—পাশ্চাত্য শিক্ষার এই পূর্ণ-আধিপত্য কালে—বাঙ্গালী-জীবনে বিলক্ষণ ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে,—এখন বঙ্গীয় সংসার বা সমাজ অবলম্বনে,—জাতীয় এবং বিজাতীয় ভাব অবলম্বনে, সুন্দর নাটক রচিত হইতে পারে।

তা নয়, যদি কেবলই কুৎসিত নাচগানের প্রলোভন দেখাইয়া এবং অশ্লীল প্যাণ্টমাইম্‌-প্রহসনের বুক্‌নি দিয়া, দেশকে রসাতলে দিতে চাও, ত আর কথা কি,—সাহিত্য, সমাজ, জাতীয়তা এবং ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব,—এখন কিছু কালের জন্য চাপা পড়িল ;—আর দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতি স্বভাবসুলভ পঙ্কিল কুৎসিত রসে আরও অর্দ্ধ শতাব্দী কাল হাবুডুবু খাইতে রহিল।

অথচ এই থিয়েটারের শক্তি এত অধিক যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।—এক দিনেই দেশ মাতিয়া উঠিতে পারে। মনে পড়ে, "চৈতন্যলীলা" "প্রহ্লাদ চরিত্র" 'বুদ্ধদেব' "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়া একদিন সমগ্র বঙ্গ কিরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল। দেশে ধর্ম্মেরও বেশ একটু সুবাতাস বহিয়াছিল। সহস্র উপদেশ এবং ধর্ম্ম-বক্তৃতায়ও যাহা হয় নাই, এক থিয়েটার হইতেই তাহা হইয়াছিল। এখন বোধ হয় ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। তাই প্রায়ই আর ভাল নাটক হইতেছে না,—ভাল অভি-

নয়ও হইতেছে না। অভিনয়ের সে মর্ম্মস্পর্শী গভীর ভাব গিয়াছে; এখন কেবল কথার গাঁথুনি ও পট-পোষাকের বাহার আছে। বলা বাহুল্য, থিয়েটারের এই সংক্রামতা কেবল সহরের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত নহে,—সুদূর পল্লী-গ্রামেও ইহার বীজ গিয়াছে।—অজ্ পাড়াগাঁয়েও এখন থিয়েটার হয়। সুতরাং সেখানেও এই থিয়েটারী ঢং, অল্পে অল্পে সদরে অন্দরে প্রবেশ করিতেছে। স্ত্রীপুরুষ ধীরে ধীরে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে।

থিয়েটারের অবস্থা ত এই; আর সংবাদপত্রের? এদিকে চাহিলেও অন্ধকার দেখিতে হয়;—বাঙ্গালী-জীবনে ধিক্কার জন্মে। যে সংবাদপত্র বিলাতে প্রবল রাজশক্তির পশ্চাদ্ধাবিত হয়; যে শক্তি সভ্যদেশের "চতুর্থ শক্তির" মধ্যে গণ্য; যে দেশের সংবাদপত্র-সম্পাদক সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া রাজার ন্যায় সম্মান পান,—তুলনা করাও দূরে থাক্,—সে দেশের ও সে জাতির 'আদর্শের' ধারণাও যেন আমাদের স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। অথচ, আমরা সেই জাতির গৌরবস্পর্দ্ধী হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করি! মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর যা ধর্ম্ম, বাঙ্গালার সংবাদপত্রেও ত তার ছায়া পড়িবে? স্বার্থত্যাগী ও সত্যসন্ধ হইতে না পারিলে সম্পাদকের আসন লওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। একদিন এ মহাভাবের আভাস একটু পাওয়া গিয়াছিল। এখন ব্যক্তিগত কুৎসা ও গালাগালি, বৈরিতা ও দলাদলি,—কোন কোন কাগজের একমাত্র অঙ্গ। সাধারণ শিক্ষা ও লোকহিত কিরূপে হইবে; সমাজ ও দেশ কিরূপে উন্নত হইবে; দেশের অভাব ও অভিযোগ কোন্ উপায়ে প্রশমিত হইবে; প্রজার প্রতি রাজার সহানুভূতি কিসে বর্দ্ধিত হইবে,—সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। লক্ষ্যের মধ্যে আছে, কিসে পাঠকের মনোরঞ্জন হইবে,—কিসে নিজের দুই পয়সা লাভ হইবে,—আর কিসে গ্রাহক জুটিবে। অথচ ইহাঁরাই এখন লোক-শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত;—ইহাঁরাই এখন দেশের "বড়লোক"!

যে বিলাতের আদর্শে আমাদের দেশের বর্ত্তমান সংবাদপত্র ও থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কি এই দুই প্রবল শক্তির এইরূপ অপব্যবহার হয়? বিলাতের লোকও ব্যবসাদার বটে; কিন্তু তাহারা জাতীয়তা ভুলে না,—দেশ ভুলে না,—সমাজ ভুলে না,—মনুষ্যত্ব ভুলে না;—দেশের ও দশের উন্নতির জন্য

তাঁহারা জীবনপণ করিয়া থাকেন।—তাহার সাহত আবার ব্যবসায়ও রক্ষা করেন। এই ব্যবসা-বুদ্ধি কি ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত জড়িত হয় না? স্বার্থ কি পরার্থের পূর্ব্ব-সূচনা নয়?

এমন দিনে সেই চিরস্মরণীয় "সোমপ্রকাশ" সুলভ সমাচার, নব-বিভাকর, সাধারণী এবং হরিশ্চন্দ্রের সেই "হিন্দু-পেট্রিয়ট" প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, সেই কি দিন ছিল, আর এখন কি দিন আসিয়াছে! সেই সময়েই যেন দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে একটা "মাহেন্দ্র ক্ষণ" আসিয়াছিল। সে "ক্ষণ" এখন গিয়াছে,—যেন একটা যুগ বহিয়া গিয়াছে! এখন এটা বিজ্ঞাপনের যুগ!

সত্যই বিজ্ঞাপনের যুগ! যার যত বিজ্ঞাপন, তার তত জয় জয়কার! ধর্ম্ম মানিবে না, মনুষ্যত্ব দেখিবে না, সমাজের পানে চাহিবে না, যেন তেন প্রকারেণ টাকা আসিলেই হইল! সর্ব্বত্রই কেবল "টাকা, টাকা টাকা"—রব। এই টাকার মোহেই সাধারণ লোকশিক্ষার প্রধান দুটি অঙ্গ,—এখন একেবারে ধ্বংসমুখে পতিত।

সংবাদপত্র ও থিয়েটার,—এই দুই প্রবল শক্তি ক্রমেই সাধারণের মন হইতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতেছে। সংবাদপত্রের সকল কথা এখন আর লোকে সহজে বিশ্বাস করে না। কাহারও সম্বন্ধে প্রশংসা বা নিন্দা প্রকাশ হইলে, পাঠক স্পষ্টই বলিয়া থাকেন,—ঐ লোকটার সঙ্গে এই কাগজওয়ালার কোনরূপ স্বার্থের সম্বন্ধ বা মনোবিবাদ আছে। এইরূপে বিশ্বাস হারাইতে হারাইতে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব,—শেষে বিজ্ঞাপনেই পর্য্যবসিত হইবে। দু' একখানার ঠিক তাহাই হইয়াছে। আর ব্যক্তিগত কুৎসা, গালাগালি ও বেলেল্লাপনার আধিক্য দেখিয়া, লোকের সেই "রসরাজ" গুড়্‌গুড়ে ভট্‌চাজ্জির কথা মনে পড়িবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংবাদপত্র ও থিয়েটার সমাজের দর্পণস্বরূপ। যে দর্পণে বাঙ্গালী-জীবনের এমন কুৎসিত প্রতিবিম্ব উঠে, সে দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। সে দর্পণকে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিতে না পারিলে, তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া, অন্ধকারে চক্ষু মুদিয়া থাকাই বিধেয়।

উপসংহার।

কিন্তু দুঃখিত হইবার কারণ নাই, ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই এ দুর্দ্দিনের অবসান হইবে। সমাজের এ নৈতিক অবনতি চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, অলক্ষ্যে যুগ-অবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। তাঁহার অপূর্ব্ব 'কথামৃত', তাঁহার অহেতুকী কৃপা, সমাজের এ গতি ফিরাইয়া দিবে। আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে সে শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

গুরু-কৃপায় ভিক্টোরিয়া-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা একরূপ সমাপ্ত হইল। জননীর অবসানের পর মহামান্য সপ্তম এডওয়ার্ড ভারতসম্রাট্-রূপে ভারতবাসীর পূজা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আকস্মিক অন্তর্ধানে, সকলেই মর্ম্মপীড়িত। যাই হোক, তাঁহারই সুযোগ্যপুত্র—আমাদের বর্ত্তমান রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ—ভারতবাসীর ভাগ্যবিধাতার রূপ ধারণ করিয়া পিতৃ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রার্থনা করি, তাঁহার দীর্ঘজীবন-ব্যাপী শান্তিময় রাজত্বকালে, 'ভিক্টোরিয়া-যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্য' আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হউক, সেই সঙ্গে দেশের দূষিত বায়ু চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাক্। যুগ-অবতারের আবির্ভাবে, ভিক্টোরিয়ার পুণ্যে,—তাহাই হইবে বলিয়া ত মনে হয়।

আমাদের আরব্ধকার্য্য এতদিনে সমাপ্ত হইল। আজ কত কাল ধরিয়া যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, হৃদয়স্বামীর একমাত্র কৃপাবলেই আজ তাহা লোকলোচনের সমীপবর্ত্তী হইল। ফলাফল এখন সেই হৃদয়স্বামীর চরণে,—আমরা তাঁর আজ্ঞাধারী সেবক মাত্র।

ভিক্টোরিয়া-যুগের পূর্ব্বের এবং ভিক্টোরিয়ার আবির্ভাবের সময়ের বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করুন,—দেখিবেন, কি অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে! এরূপ অঘটন ঘটন কি মানুষের সাধ্য? মনে ত তা হয় না,—মূলে মূলাশক্তির কৃপা, মহামায়ার ইচ্ছা, ও রামপ্রসাদ আদি মাতৃভক্ত মহাত্মাদের মাতৃনামযজ্ঞের ফল নিহিত। সেই অব্যর্থ ফলেই, বঙ্গ-সাহিত্যের এই অভূতপূর্ব্ব উত্থান। একশত বৎসরের পূর্ব্বের সেই বাঙ্গালা

গদ্য, আর বর্ত্তমান কালের গদ্য-সাহিত্য—এ দুই এখন আপনারাই তুলনা করুন ;—দুই সময়ের দুই চিত্রই আপনাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছি।

ভিক্টোরিয়া-যুগের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই সময়েই এই সোণার বাঙ্গালায়—সোণার মানুষ—দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্য—কাঙ্গালঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নরদেহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূলে, ভিক্টোরিয়ার সেই অভয়বাণী বড় মধুর ভাবে মিশিয়াছে। ধর্ম্মের অবতার-রূপিণী মাতা বলিয়াছিলেন,—'ভারতবাসীর ধর্ম্মে বা ধর্ম্মবিশ্বাসে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।'—যুগ-অবতার দয়াময় জগদ্‌গুরুও উদার-উন্মুক্তভাবে বার বার জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন,—'যার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস, সে সেই ধর্ম্মে থাক্,—কাহারো বিশ্বাস ভাঙ্গিতে নাই ;—মত পথ মাত্র।' এই উদার অভিনব ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়াই না—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম—ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেই দলে দলে গিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছিল? সকলেই না তাঁহাকে অতি আপনার জন ভাবিয়া সুখী হইত? ভিক্টোরিয়ার অভয়বাণীর মূলমন্ত্রও যা, ভক্ত-বৎসল ভগবানের লোকশিক্ষাদানও তাহাই,—মূলে পূর্ণভাবে মিল আছে। তাই স্বর্গীয়া জননী বৃটন-লক্ষ্মীর চরণে বার বার প্রণাম করি। লক্ষ্মীর অংশে ভিক্টোরিয়ার জন্ম, লক্ষ্মীপতি স্বয়ং নারায়ণ—তাই নরদেহে তাঁহার সময়েই লীলা করিতে আসিয়াছিলেন। সেই গূঢ় দেবলীলার ফলেই ভারতবাসীর এই সৌভাগ্য-সূচনা। প্রথম ভাষা হইতেই সে সৌভাগ্য পরিদৃষ্ট হয় ;—তাই ভারতের সকল জাতির সকল ভাষাই অল্পাধিক উন্নত। বঙ্গদেশে পতিতপাবন সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাই বঙ্গভাষার সমধিক উত্থান।

ঠাকুরের অদ্ভুত জীবনাদর্শে ও স্বর্গীয় কথামৃতে—দেশ পবিত্র, সমাজ উন্নত, সকল জাতির সকল ধর্ম্মই উদার উন্মুক্ত হইয়া ধীরভাবে কার্য্য করিতেছে। শত শত বৎসরের অন্ধকার-গৃহে আলোক আসিয়াছে,—মোহ-ঘোরাচ্ছন্ন নিদ্রালস জীব মনে করিতেছে,—এখনো প্রভাত হয় নাই ; তাই দেববাণী স্বপ্নবাণী ভাবিয়া, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া, তাহারা আবার ঘুমাইতেছে। কিন্তু জগদ্‌গুরুর কৃপায় শীঘ্রই তাহাদের এ মোহনিদ্রার অবসান হইবে। কেননা, প্রসাদের মা-নামের সেই অক্ষয় বীজ, রামকৃষ্ণ-

নামামৃতে মিশিয়া লোকচক্ষুর অগোচরে, একযোগে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, —এ ফল ব্যর্থ হইবার নয়। তাই প্রসাদপ্রসঙ্গে বলিয়াছি, বঙ্গসাহিত্যের এক প্রান্তে মহাত্মা শ্রীরামপ্রসাদ, আর এক প্রান্তে—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ,—মধ্যে বৈতরণী। মাতৃনামাঙ্কিত বঙ্গসাহিত্য সেই বৈতরণীর বিরাট্ সেতু। এ সেতু দিয়া যিনি পারে যাইবার আশা রাখেন, তিনি দৃঢ়রূপে সেই পুরুষোত্তমের অভয় পাদপদ্ম আঁকড়িয়া ধরুন, —সহস্র ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতেও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না;—যথাদিনে তিনি পারে পঁহুছিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার এই মাতৃভাষা সেবার আদিগুরু মহাত্মা শ্রীরাম-প্রসাদ। উত্তরজীবনে সেই রাম-নাম লইয়াই জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিলাম। 'ভক্তের ভগবান্' আমার সম্মুখে।—বর দাও প্রভো! যেন তোমারই বরে, তোমার স্বর্গীয় ভাব, মহান্ আদর্শ, ও অপূর্ব্ব 'কথামৃত' আমার মাতৃভাষার বর্ণে বর্ণে মিশিয়া যায়।

জয় রামকৃষ্ণ।